লিঙ্গপুরাণ

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরোহী প্রকাশন
কলকাতা-৭০০১৩০

LINGAPURAN
(Collection of Articles by Anirban Bandyopadhyay)

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ১৪২১ (ইং ২০১৫)

কপিরাইট
লেখক কর্তৃক সর্বসংরক্ষিত

প্রচ্ছদশিল্পী
জান্নাতুল মির্জা
(এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সব চিত্রই ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

প্রকাশক
তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
কোঁড়া চণ্ডীগড়
কলকাতা-৭০০১৩০

বর্ণ সংস্থাপক ও মুদ্রক
থার্ডআই (৯৩৩৯১১৫৬১০)
সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম
কলকাতা - ৭০০ ১২৯

মূল্য ঃ আশি টাকা

কৈফিয়ত

গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়, গতানুগতিকতার প্রথাবদ্ধ পথে হেঁটমুণ্ড হয়ে নয়, পূর্বপুরুষের পাখি-পরার মতো তোতাপাখির বুলি আওড়ানোও নয় — ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন পথে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথানির্মাণে আমার এই বর্ণগুচ্ছের চরৈবেতি। সবই আমি আমার মতো করেই বলেছি, যেমনটা বিশ্বাস করি তেমনভাবেই বর্ণনায় থেকেছি, পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছি আন্তরিকভাবেই। কোনো চাপাচাপির প্রশ্ন নেই। আমি প্রবন্ধকার। সমাজ-বদলের স্বপ্ন দেখি আমি, আমার মতো করেই। উচিত-অনৌচিতের জ্ঞানবর্ষণ করে নয়, নিজের জীবনে এবং যাপনেও এই বদলের রূপরেখা অনুসরণের চেষ্টা করি আপ্রাণ। সমাজ বদলায়, সমাজ বদলাচ্ছে, সমাজ বদলাবেই। ছদ্মবেশে নয়, স্বনামে-স্বরূপে প্রকটিত হয়েই লিখি। আমি তাঁদের জন্য লিখি যাঁরা খাসির মাংসের দোকানে "পাঁঠার মাংস কত করে?" জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁদের জন্য লিখি যাঁরা মুসলমানদের মুসলমান বলেন, হিন্দুদের বলেন বাঙালি। আমি তাঁদের জন্য লিখি যাঁরা মহিলাদের 'মেয়েছেলে' বলে, মুসলমানদের বলেন 'মোল্লা'। এবং অবশ্যই অনুসন্ধিৎসু এবং জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের জন্য আমার কলম সমর্পিত হয়। পণ্ডিতদের জন্য লেখার ক্ষমতা আমার নেই। তাই সেই চেষ্টাও আমি করিনি।

বৌদ্ধিকগণ বিতর্ক করতেই পারেন। তাতে আরও ঋদ্ধ, আরও সমৃদ্ধ হবে পাঠককুল। আমি কেবল চেষ্টা করেছি আমার বক্তব্য আমার মতো করে বলার। আমি যেমন ভেবেছি তেমন লিখেছি আমার যুক্তি, আমার বিচারে। সমাজের সংখ্যাগুরুকে খুশি করার উপাদান এই গ্রন্থে হয়তো-বা নেই, আমি খুশি করতে চাইওনি। যেমন মনেপ্রাণে চাইনি কাউকে আহত করতে। তবু যদি কেউ স্বেচ্ছায় অখুশি হন বা অকারণে আহত হন — তবে তা আমার অজ্ঞানতা এবং অসহায়তা।

সংকলিত এই গ্রন্থের সমস্ত রচনা 'বর্ণপরিচয়', 'ইতিকথা এখন', 'ঢাকা ডাইজেস্ট', 'চরৈবেতি', 'বুকপকেট', 'অসময়', 'পদক্ষেপ', 'কশেরু' এইরকম আরও অসংখ্য ওয়েবজিন ও পত্রপত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ফেসবুকের 'প্ররোহ' নামক প্রবন্ধের গ্রুপে লেখাগুলি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। সরাসরি পাঠকরা সর্বদা আমায় প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদেরই প্রেরণায় আমি একের পর এক প্রবন্ধ লিখে গেছি।

আমার প্রবন্ধগুলির বক্তব্য সকলেরই মনপসন্দ হবে এমনটা কখনোই দাবি করছি না। কারোর কারোর অপছন্দ হতেই পারে। অপছন্দ হলে পরামর্শ রইল — আমার মতো অর্বাচীনের কথায় কান দেবেন না। কারণ আপনার কোনোরূপ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় বৃহত্তর মানুষের কাছে এই গ্রন্থ ও তার বিষয়বস্তু পৌঁছে যেতে পারে, যা নিশ্চয় আপনার কাম্য নয়!

যাঁদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আমি

সেইসব উৎসাহদাতা, প্রেরণাদাতাদের নাম
উল্লেখ না-করলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে।

অপূর্ব পাল, অলোকময় তলাপাত্র, চন্দনা গুপ্ত,
জয়া রায়, রীনা রায়, দেবব্রত নাহা,
সৌমেন চক্রবর্তী, মহাদেব নাথ, সৈকত শী,
অভিজিৎ দাস, শাহ কুতুবুজ্জামান,
ইন্দ্রজিৎ মাজি, দিব্যেন্দু দ্বীপ, কৌস্তভ সমাদ্দার,
রত্না ঘোষ, গোপা পাল, রাহুল রায়চৌধুরী,
অভিষেক নন্দী, মকসুদুল ইসলাম,
কেদার চৌধুরী, অরুণ সেনগুপ্ত,
গৌতম কামিলা, সঞ্চয় পাল,
অসীম মজুমদার, প্রবীর মজুমদার,
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুপ্রতীক বর্মন,
গৌতম চক্রবর্তীঝর্ণা চ্যাটার্জি, অমিতাভ দাস,
সন্দীপ সরকার, সুমন ভট্টাচার্য, তন্ময় বসু,
পিন্টু দত্ত, সিদ্ধার্থ শীল, যুগান্তর মিত্র,
নির্মলেন্দু কুণ্ডু প্রমুখ।

আরোহী প্রকাশনের অন্যান্য গ্রন্থ

- ❐ অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিপন্ন সত্তার চিতাভস্ম" (কাব্যগ্রন্থ)
- ❐ সঞ্চয় কুমার পালের "শুধু তোমারই জন্য" (কাব্যগ্রন্থ)
- ❐ সৌমেন্দ্র লাহিড়ীর "ভাঙা চাঁদ ও মেঘমালা" (কাব্যগ্রন্থ)

সূচিপত্র

- লিঙ্গপুরাণ ঃ আদি ও অকৃত্রিম মহানায়কের উত্থান-পতন ৭
- নিছক গোরুর রচনা এবং গোমাতা ৩৩
- সরস্বতী ঃ বাস্তবে এবং অবাস্তবে ৪১
- মনু, মনুসংহিতা এবং হিন্দুবাদের ভারতবর্ষ ৪৯
- পদবিনামার চালচলন ৬১
- একটি শাস্ত্রীয় ভাষা এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ৭৩
- ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং আমাদের ভারতীয় সমাজ ৯১

লিঙ্গপুরাণ ঃ আদি ও অকৃত্রিম মহানায়কের উত্থান-পতন

"ক্রুদ্ধ মহর্ষিদের অভিশাপে শিবের লিঙ্গ খসে পড়ে এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ এসে শিবকে তার লিঙ্গ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এ লিঙ্গের পুজো করতে হবে — এই শর্তে রাজি হলেই শিব তা আবার ধারণ করেন।"

লিঙ্গ (সংস্কৃতে লিঙ্গ্ + অ, অথবা শিশ্ন = শশ্ + ন) বলতে প্রথমেই যে ছবিটা মানুষের মনে ভেসে ওঠে সেটা হল পুরুষের যৌনাঙ্গ, ইংরেজিতে যেটি PENIS বোঝায়। অপরদিকে লিঙ্গ বলতে GENDER-ও বোঝায়। মানুষ যে শব্দের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চেয়েছে তার প্রমাণ ভাষায় এই 'লিঙ্গ'-কল্পনা। পুরুষবাচক শব্দ (কিশোর, পুত্র, দেব ইত্যাদি) পুংলিঙ্গ বলে চিহ্নিত হল। আর স্ত্রীবাচক শব্দ (কিশোরী, পুত্রী, দেবী ইত্যাদি) চিহ্নিত হল স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে। 'চিহ্নিত' শব্দটি ব্যবহার করার কারণ 'লিঙ্গ' আর 'চিহ্ন' সমার্থক। কিন্তু যেসব জিনিস অচেতন, তারা সব যদি ক্লীবলিঙ্গ বলে চিহ্নিত হত, তাহলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু এই অচেতন জিনিসগুলোর কিছু চিহ্নিত হল পুংলিঙ্গ হিসাবে, কিছু চিহ্নিত হল স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে।

গর্ভের শিশুর লিঙ্গ-নির্ধারণ বে-আইনি হলেও জন্মের পর নবজাতকের লিঙ্গ-নির্ধারণ করতে শিশুর যৌনাঙ্গের দিকেই তাকাতে হয় সকলকে এবং যৌনাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করেই বুঝে নিতে হবে সে নারী, না পুরুষ। শুধু নবজাতকের ক্ষেত্রেই নয়, কোনো প্রাণী পুরুষ না মহিলা সেটা বুঝতেও আমরা সংশ্লিষ্ট প্রাণীটির যৌনাঙ্গটিই পর্যবেক্ষণ করতে থাকি।

লিঙ্গ-নির্ধারণ বোঝাতে শিশ্ন (পুরুষ) অথবা যোনি (মহিলা) দুই-ই বোঝালেও লিঙ্গ আসলে পুরুষের যৌনাঙ্গকেই বোঝায়। পুরুষের যৌনতার জন্য প্রধান অঙ্গ হল তার লিঙ্গ। এটি

পুরুষের প্রধান যৌনাঙ্গ। এই লিঙ্গের দ্বারা পুরুষ যৌনমিলনে অংশ নেয় এবং মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি লাভ করে। লিঙ্গের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে পুরুষের যৌনমিলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারটি। এই লিঙ্গের একই ছিদ্র দিয়ে বীর্য এবং মূত্র নির্গত হয়। লিঙ্গ হল পুরুষের বহিঃযৌনাঙ্গের মধ্যে অন্যতম। লিঙ্গের সামনে একটি আবরণ বা ত্বক থাকে (মুসলিম এবং অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের খতনার মাধ্যমে একে কেটে ফেলা হয়। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত লিখব)। ইংরেজিতে এই ত্বককে বলে ফোর স্কিন। লিঙ্গে অসংখ্য কোশকলা আছে। এগুলোর প্রভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুরুষের লিঙ্গের ভিতর সবচেয়ে পুরু কৌশিক ঝিল্লির নাম হল করপরা কে ভারনোসা। **অণ্ডথলি ঃ** অণ্ডকোশ হল দুটো বলের মতো থলি, যেখানে শুক্র তৈরি হয়। এগুলোর স্বাভাবিক পরিমাপ হল দেড় ইঞ্চি। এগুলো লিঙ্গের নীচে ঝুলে থাকে। পুরুষের যৌন হরমোন এবং বীর্য উৎপাদনই হল অণ্ডকোশ দুটির কাজ। **এপিডিডাইমিস ঃ** প্রতিটি অণ্ডকোশের উপরের অংশকে এপিডিডাইমিস বলে। এপিডিডাইমিস হল বীর্যের সংরক্ষণের স্থান। টিউব এবং অন্যান্য নালি বেয়ে বীর্য এপিডিডাইমিস থেকে অণ্ডকোশে চলে আসে। **ভাস ডিফারেন্স ঃ** প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে দুটো সেমিনাল কোশ সেমিনাল তরলের মিশ্রণ নিয়ে এপিডিডাইমিসে এসে পৌঁছোয়। এই চলাচলের নালি হল ভাস ডিফারেন্স। এটি পুরুষের অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গ। **প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড ঃ** মূত্রথলির উপরে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের অবস্থান। এই গ্ল্যান্ডের প্রোস্টেট তরল উৎপাদিত হয় শতকরা ৩৮ ভাগ এবং সেমিনাল তরল উৎপাদিত হয় ৬০ ভাগ, বাকি দুই ভাগ বীর্য উৎপাদিত হয়। লিঙ্গের বেশ কিছু সমার্থক শব্দও আছে, যা পুরুষের যৌনাঙ্গই বোঝায়। যেমন - শিশ্ন, পুংস্ত্ব, উপস্থ, ধোন, বাড়া, বংশদণ্ড ইত্যাদি।

লিঙ্গের স্বাভাবিক আকার কত? লিঙ্গের আকার নিয়ে পুরুষজাতির হীনমন্যতার শেষ নেই! কেন এই হীনমন্যতা? **প্রথম কারণ** অজ্ঞানতা বা যৌনশিক্ষায় উদাসীনতা, **দ্বিতীয় কারণ** ভুল শিক্ষা, **তৃতীয় কারণ** নীলছবির বর্ধিত লিঙ্গদর্শন (অনের পুরুষ কিংবা নারী পর্নোফিল্ম দেখে লিঙ্গের আকার এবং মিলনের সময় নিয়ে নিজের মধ্যে একপ্রকার নেগেটিভ ধারণা করে রাখে। সত্যিকার অর্থে ছবিতে নায়ক তারাই হয় যারা অন্যদের তুলনায় হ্যান্ডসাম হয়। পর্নোস্টারও তার ব্যকিক্রম নয়। পর্নোগ্রাফিতে ক্যামেরা এমন অ্যাঙ্গেলে ধরা হয় যাতে ভিজ্যুয়ালি লিঙ্গকে বড়ো দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি কোনো একটি উঁচু স্থান থেকে নীচে দাঁড়ানো আপনার কোনো বন্ধু ছবি তোলেন তাহলে তাকে খাটো দেখাবে। তেমনই যদি আপনি মাটিতে বসে কিছুটা উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনার বন্ধুর ছবি তোলেন তাহলে একই ব্যক্তিকে অনেক লম্বা দেখাবে। আর সে জন্যই আমরা যখন মাথা নীচু করে আমাদের নিজের লিঙ্গ দেখতে যাই তখন ভিজ্যুয়াল ইল্যুশানের কারণে আমাদের লিঙ্গের আকার প্রকৃত আকারের চেয়ে ছোটো দেখা যায়। তা ছাড়া এখানে আরও একটি বিষয়টি বলে রাখতে চাই, তা হল — পর্নোফিল্মে দেখা যায় একই যুগল ২০/২৫ মিনিট মিলন করছে। সত্যিকার অর্থে তাদের এই ২০ মিনিটের মিলন দৃশ্যের শুটিং হয়েছে ২/৩

দিন ধরে। তাদের অনেকবারের মিলনের দৃষ্টিনন্দন অংশগুলো ভিডিও এডিটে কাট-ছাঁট করে একটি ক্লিপ বাজারে আসে। তাই পর্নোফিল্ম দেখে লিঙ্গের আকার এবং মিলনের সময় নিয়ে আমাদের হা-হতাশের অবকাশ নেই। কারণ সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওইসব দেশের বেশির ভাগ পুরুষরই ২-৩ মিনিটের বেশি যৌনমিলন করতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক ও বাস্তব চিত্র।) **চতুর্থ কারণ** ভুঁইফোড় হাতুড়ে ডাক্তার (আপনি লিঙ্গ বড়ো করা সংক্রান্ত যত প্রকার বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন এইগুলির অধিকাংশেরই কোনোরকম বৈধতা নেই — এককথায় এসব ভুয়ো চিকিৎসক এবং ভুয়ো চিকিৎসা-বাণিজ্য। লক্ষ করে দেখবেন তাঁদের বিজ্ঞাপনগুলোতে কোমলমতি তরুণদের আকৃষ্ঠ করার জন্য নানা প্রকার অশ্লীল ছবি জুড়ে দেয়। তাদের কোনো ঠিকানা দেওয়া থাকে না, আর থাকলেও সেটা নকল। তাঁরা শুধুমাত্র ফোন নম্বর দিয়ে রাখে। এসব দেখেও যদি আপনার চোখ না খোলে আর লোভে পড়ে ফাঁদে পা বাড়ান তাহলে আপনার ক্ষতির জন্য আপনিই দায়ী।) এবং **পঞ্চম কারণ** অবশ্যই রক্ষণশীলতা। প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মনে করেন তাঁর পুরুষাঙ্গটি ছোটো। বিশ্বজুড়ে সাধারণত উত্তেজিত অবস্থায় পুরুষ লিঙ্গের গড় দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে ৪.৭ থেকে ৬.৩ ইঞ্চি। অনেকের মতে লিঙ্গের গড় দৈর্ঘ্য ৫.১ থেকে ৫.৯ ইঞ্চি। তবে লিঙ্গের আকার ব্যক্তি, প্রজাতি, গোষ্ঠী এবং অঞ্চলভেদে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বিরল ক্ষেত্রে পারিবারিক (জেনেটিক) এবং হরমোন-জনিত সমস্যার কারণে ৩ ইঞ্চির চেয়েও অনেক ছোটো লিঙ্গ দেখা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এটি মাইক্রোপেনিস নামে পরিচিত। তবে পেনিস ৪ (চার) ইঞ্চি হলেই স্ত্রীকে অর্গাজম দিতে কোনোপ্রকার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অনেকের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সার অপারেশন সহ নানা রোগের কারণে লিঙ্গের আকার ছোটো হয়ে যেতে পারে। যৌন তৃপ্তির জন্য লিঙ্গের আকার মূল বিষয় নয়। প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে মিলনে এবং শৃঙ্গারে আপনার কারুময়তা, নান্দনিকতা। আপনি যত বেশি সৃষ্টিশীল পদ্ধতিতে স্ত্রীকে 'On' করবেন সে তত বেশি আপনার পার্সোনালিটির প্রতি আবেগপ্রবণ হবে।

যৌনজীবনে লিঙ্গ-বিষয়ক কিছু জরুরি তথ্য ঃ (১) উত্তেজিত অবস্থায় পুরুষ লিঙ্গের গড় দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে ৪.৭ থেকে ৬.৩ ইঞ্চি। অনেকের মতে লিঙ্গের গড় দৈর্ঘ্য ৫.১ থেকে ৫.৯ ইঞ্চি। (২) তবে আপনার লিঙ্গ যদি লম্বার সর্বনিম্ন ৪ (চার) ইঞ্চিও হয়ে থাকে তাহলেও আপনার স্ত্রীকে তৃপ্তি দিতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। অনেকে আবার এও বলে থাকেন স্ত্রীকে অর্গাজম দিতে মাত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা লিঙ্গ হলেই যথেষ্ট। (৩) বড়ো লিঙ্গ মানেই বেশি মজা, এই কথাটা ডাহা ভুল। আপনার ডিউরেশন কত এবং শেষ পর্যন্ত যৌনসঙ্গীটিতে মননশীলতার সঙ্গে যৌনতৃপ্তি দিতে পারলেন কি না সেটাই আসল। স্বাভাবিক সময় বা ডিওরেশান ৭ থেকে ১০ মিনিট। (৪) লিঙ্গ কখনোই একেবারে সোজা হয় না। সামান্য বাঁকা থাকেই, সেটা স্বাভাবিক বক্রতা। (৫) লিঙ্গের গোঁড়া সরু অগ্রভাগ মোটা এটা কোনো সমস্যা নয়। অপপ্রচারের ফলে সবারই এটা একটা ভুল ধারণা হয়ে গেছে। (৬) কোনো জাদুকরী তেল বা মালিশ লিঙ্গকে তেমন বড়ো করতে সক্ষম নয়। (৭) বেশি বড়ো লিঙ্গ

হলে মেয়েরা মজা পাওয়ার বদলে ব্যথা অনুভব করেন। এমনকি সেটা যৌনাতঙ্কেরও রূপ নিতে পারে। (৮) ক্ষুদ্র লিঙ্গ বলতে ২.৭৬ ইঞ্চির চেয়ে ছোটো লিঙ্গ বোঝায়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। (৯) গোঁড়া সরু আগা মোটা বা বাঁকা লিঙ্গ যৌনমিলনে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। (১০) লিঙ্গটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কোথাও ব্যবহার করবেন না। (১১) স্ত্রী ছাড়াই যৌন-উত্তেজনা হয় এমন কোনো কাজ যেমন রসাতলে যাওয়া নারীর দিকে তাকানো, অশ্লীল সাহিত্য পড়া, কম্পিউটার বা মোবাইলে খারাপ কিছু দেখা থেকে বিরত থাকুন। (১২) নিয়মিত Pubic Hair কাটুন। (১৩) আপনার যৌনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। এটাও আপনার শরীরেরই অংশ। (১৪) যৌন সমস্যার ব্যাপারে ভুল করেও কখনও অবহেলা করবেন না। যে-কোনো যৌন সমস্যায় কোনো প্রকার সংকোচ না-করে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অপরদিকে যোনি হল নারীর যৌনাঙ্গকে বলে। **স্ত্রীযোনি গঠন ঃ** স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাইমেট বর্গের প্রাণীকূলের, স্ত্রীপ্রজনন তন্ত্রের একটি অন্যতম অঙ্গ। জরায়ুর নীচের দিকে ভালভা পর্যন্ত বিস্তৃত নালি। স্বাভাবিক অবস্থায় সামনের দিকে ৬ থেকে ৬.৫ সেন্টিমিটার এবং ভিতরে দিকে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার। তবে যৌন উত্তেজনা, সন্তান প্রসবের সময় এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি পায়। অসম্ভব একটি নমনীয় গুণের কারণে যৌনমিলনের সময় এবং সন্তান প্রসবের সময় প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারিত হতে পারে। দাঁড়ানো অবস্থায় যোনির শেষপ্রান্ত সামনে-পেছনে জরায়ুর সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রির বেশি কোণ উৎপন্ন করে। যোনির ব্যাপ্তির বিচারে একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ দুটি হল — **(১) অন্তঃস্থিত যোনি ঃ** এই অংশ বাইরে থেকে দেখা যায় না। এমনকি সজোরে প্রসারিত করলেও বাইরে থেকে এই রন্ধ্রটি স্পষ্ট হয় না বলে। এর নমনীয় মাংশপেশি গায়ে গায়ে লেগে থাকে বাইরে থেকে অবরুদ্ধ পথ বলে মনে হয়। এর উপরে অংশ জরায়ু-মুখের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অবস্থানের বিচারে যোনি মূত্রনালির পিছনে এবং মলদ্বারে সামনে অবস্থিত। যোনির উপরের এক-চতুর্থাংশ রেকটোউটেরিন পাউচ দ্বারা মলাধার থেকে পৃথক থাকে। যোনিদ্বারের ভিতরের অংশের রং হালকা গোলাপি। এর ভিতরের পুরোটাই মিউকাস ঝিল্লি দ্বারা গঠিত। যোনির অভ্যন্তরের তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চল উঁচুনীচু ভাঁজে পরিপূর্ণ, এই ভাঁজকে রুগি (rugae) বলে। যোনির পিচ্ছিলতা বার্থোলিনের গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই গ্রন্থি যোনির প্রবেশ মুখে এবং জরায়ু-মুখের কাছে অবস্থিত। যৌনমিলনের সময় প্রয়োজনীয় পিচ্ছিলকারক তরল ক্ষরিত করার মাধ্যমে এটি লিঙ্গপ্রবেশ জনিত ঘর্ষণ হ্রাসে ভূমিকা রাখে এবং একই যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। প্রতি মাসে ডিম্বক্ষরণের সময় জরায়ু-মুখের মিউকাস গ্রন্থিগুলো বিভিন্ন রকম মিউকাস ক্ষরণ করে। এর ফলে যোনির নালিতে ক্ষারধর্মী অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয় এবং এটি যৌনমিলনের মাধ্যমে প্রবিষ্ট পুরুষের শুক্রাণুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। যোনিমুখ জন্মগতভাবে যোজক কলার একটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই পর্দাকে বলা হয়

যোনিচ্ছদ বা সতীচ্ছদ। একসময় ধারণা ছিল পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া বা কোনো অপদ্রব্য প্রবেশ ছাড়া এই পর্দা ছেঁড়ে না। এই পর্দা অক্ষুণ্ণ থাকাটা সতীনারীর প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হত (আজও কোনো কোনো দেশে সতীচ্ছদ পরীক্ষা করার পর অক্ষত হলে অক্ষতযোনির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।) কিন্তু বাস্তবে নানা কারণে এই পর্দা ছিন্ন হতে পারে। ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালনা, ব্যায়াম চর্চা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির কারণে এই পর্দা ছিড়ে যেতে পারে। **(২) বহিঃস্থ যোনি ঃ** যোনিদ্বার থেকে শুরু হয়ে যোনিনালির বাইরে বিস্তৃত অংশকে বহিঃস্থ যোনির ভিতরে ধরা হয়। এই অংশটিকে বলা হয় ভালভা (valva) বলে। ভালভা অনেকগুলো ছোটো অংশ নিয়ে তৈরি। এই অংশগুলো হল — **যোনিমণ্ডপ ঃ** মন্স পিউবিস বা যোনিমণ্ডপ নারীদেহের নিম্নাঙ্গের একটি নির্দিষ্ট এলাকা মানব অঙ্গসংস্থানবিদ্যায় এবং সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পিউবিক অস্থি, পিউবিক সিমফাইসিস সংযোগের উপর মেদ কলা জমে থাকা উঁচু ঢিপির (mound) মতো অংশটিকে "মন্স পিউবিস" বা "যোনিমণ্ডপ" বলে। এটি লাতিন শব্দ 'pubic mound' থেকে এসেছে, এছাড়া এটি মন্স ভেনেরিস (mound of venus) নামেও পরিচিত। মন্স পিউবিস ভালভার উপরের অংশ গঠন করে। মন্স পিউবিসে আকার সাধারণত শরীরে হরমোন ক্ষরণ ও মেদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বয়ঃসন্ধির পর এটি প্রসারিত হয়, এর উপরভাগে অংশ চুলে ঢেকে যায়, যা যৌনকেশ নামে পরিচিত। নারীর দেহে এই উঁচু অংশটি মেদ কলা দিয়ে গঠিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে বড়ো। যৌনমিলনের সময় এটি পিউবিক অস্থিকে রক্ষা করে।

নারীর মন্স পিউবিস যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত তার নিম্নভাগে আছে বৃহদ্দোষ্ঠ, এবং অন্য পাশে হলরেখার (লাঙ্গল ফলার দাগ) মতো অংশ, যা যোনিচিরল নামে পরিচিত। ক্লেফট অফ ভেনাস যে সকল অংশ পরিবেষ্টন করে রেখেছে সেগুলো হল — নিম্নোষ্ঠ, ভগাঙ্কুর, যোনির প্রবেশদ্বার এবং ভালভাল ভেস্টিবিউলের অন্যান্য অংশ। মন্স ভেনেরিসের মেদ কলা ইস্ট্রোজেন ক্ষরণে প্রতিক্রিয়াশীল, যা বয়ঃসন্ধি শুরুর সময় একটি স্বতন্ত্র উঁচু অংশের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এটি লেবিয়া মেজরার সামনের অংশে, পিউবিক অস্থি থেকে সরে যায়। যোনিওষ্ঠ (Labia) দুইটি মাংসল ভাঁজ যোনিপথকে আবৃত করে রাখে। এর বড়ো ভাঁজটিকে বলা হয় বৃহদ্দোষ্ঠ (Labia majora)। বৃহদ্দোষ্ঠের ভিতরের দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মাংসল ভাঁজকে বলা হয় ক্ষুদ্রোষ্ঠ (Labia minora)। বৃহদ্দোষ্ঠ বহিঃস্থ অংশ, রঙিন এবং চুলবিশিষ্ট; এবং অন্যটি ভিতরের অংশ, যা কোমল ও সেবাসিওয়াস ফলিকল সমৃদ্ধ। এটি বৃহদ্দোষ্ঠের ভিতরের দিকে থাকে। **ভগাঙ্কুর (Clitoris) ঃ** যোনিওষ্ঠের উপরের দিকে ছোটো বোতামের মতো একটি অংশ থাকে। একে বলা হয় ভগাঙ্কুর। এই অংশটি যোনিমুখ ও মূত্রনালির প্রবেশমুখের উপরাংশে অবস্থিত। এটি যৌন মিলনকালে তৃপ্তি প্রদান করে। যেহেতু এটি একটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ তাই এর বর্ণ চামড়া মতো না-হয়ে ঝিল্লির মতো হয়। এটির উচ্চতা সিকি ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। তবে যৌন উত্তেজনা বাড়তে থাকলে এটি শক্ত ও দীর্ঘ হতে থাকে। **যোনিচ্ছদ বা সতীচ্ছদ (Hymen) ঃ** এটি মিউকাস মেমব্রেন

দ্বারা সৃষ্ট একটি পর্দা। এই পর্দা যা যোনির প্রবেশমুখ আংশিক বা সম্পূর্ণ আবরিত করে রাখে। এটি লেবিয়া মাইনরার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ভালভার একটি অংশ, যেখানে ইউরেথ্রাল ও যোনির প্রবেশমুখ উন্মুক্ত। এর প্রান্ত হার্টের লাইন দ্বারা চিহ্নিত। যোনির সম্মুখে, গ্ল্যান্স ক্লিটোরিসের ২.৫ সেন্টিমিটার ভিতরে বহিঃস্থ ইউরেথ্রাল অরফিস অবস্থিত। সাধারণত এটিকে স্কিনির ডাক্টের প্রবেশমুখের নিকটে ছোটো, হালকা স্পষ্ট দাগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর ভ্যাজাইনাল অরফিস হচ্ছে মূত্রনালির নীচে ও পিছনে অবস্থিত একপ্রকার মধ্যম আকৃতিবিশিষ্ট চির; এর আকার সতীচ্ছদের আকৃতির সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। **বার্থোলিনের গ্রন্থি (Bartholin's glands) ঃ** একে অনেক সময় বৃহৎ ভেসটিবিউলার গ্রন্থি (greater vestibular glands) বলা হয়। দুটি গ্রন্থি নারীর যোনির প্রবেশদ্বারের কাছে একটু নীচে ডানে ও বামে থাকে। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে এই গ্রন্থি দুটি সম্পর্কে প্রথম ড্যানিশ শরীরবিদ ক্যাসপার বার্থোলিন দ্য ইয়াঙ্গার (১৬৫৫-১৭৩৮) এদের বর্ণনা দেন। এই বিজ্ঞানীর নামে এই গ্রন্থিদ্বয়ের নামকরণ করা হয়। **গ্রাফেনবার্গ স্পট বা জি-স্পট ঃ** এটি হচ্ছে যোনিপথের একটি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। এই অংশটি মূত্রথলির নীচে অবস্থিত। এর নামকরণ করা হয়েছে জার্মান স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আর্নেস্ট গ্রাফেনবার্গের নামানুসারে। যোনিপথের শুরু হতে ১-৩ ইঞ্চির মাঝেই এর অবস্থান। সঙ্গমকালে যোনিমুখের ১-৩ ইঞ্চির ভিতরে নারী সবচেয়ে বেশি পুলক অনুভব করে। এই অধিক সংবেদনশীল অংশকেই জি-স্পট বলা হয়।

অনেকটাই বলা গেল নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের বিবরণ। কিন্তু যাঁরা নারী-পুরুষ কোনোটাই নয়, তাঁদের যৌনাঙ্গের পরিচয় কী? হিজড়ে বা হিজড়া? যৌনাঙ্গের গঠন-বিচারে কারা হিজড়ে? হিজড়ে সাধারণত তিনরকম — (১) প্রকৃত হিজড়ে (True Hermaphrodite), (২) অপ্রকৃত পুরুষ হিজড়ে (Male Pseudo Hermaphrodite) এবং (৩) অপ্রকৃত নারী হিজড়ে (Female Pseudo Hermaphrodite)।

(১) অপ্রকৃত হিজড়ে (Pseudo Hermaphrodite) ঃ গর্ভে থাকাকালীন সময়ে অন্যান্য শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই শিশুর যৌনাঙ্গ গঠিত হয়। যৌনাঙ্গ গঠনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ক্রোমোজোমের ত্রুটিবিচ্যুতির ফলেই জন্ম নেয় যৌন-প্রতিবন্ধী শিশু। ক্রোমোজোমের ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যবস্থায় এই যৌন-বিকলাঙ্গরা তাই হয়ে উঠে অপ্রকৃত। সাধারণত পাঁচ ধরনের অপ্রকৃত হিজড়ে দেখা যায় — **(ক) ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম (Klinefelter syndrome) ঃ** ১৯৪২ সালে এইচ.এফ. ক্লাইনেফেলটার (H.F Klinefelter) নামে একজন আমেরিকান চিকিৎসক এই রোগ আবিষ্কার করেন। এই শারীরিক ত্রুটি শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। প্রতি ১০০০ জন পুরুষের ভিতর ১ জনের এই ত্রুটি দেখা দিতে পারে। টেস্টোস্টেরন (Testosterone) হরমোনের অভাবে এদের শারীরিক গঠনে পুরুষালি পেশির ঘাটতি দেখা দেয়। মুখে

দাড়ি-গোঁফ (Facial Hair), যৌনাঙ্গে চুল (Pubic Hair) কম দেখা দেয়। বক্ষ কিছুটা উন্নত হয় ও স্ফীত স্তন দেখা দেয়। ডাক্তারি পরিভাষায় একে গাইনিকোমাস্টিয়া (Gynecomastia) বলে। তবে মাত্র ১০% পুরুষের গাইনিকোমাস্টিয়া লক্ষণযোগ্য হয়। বাকিদের গঠন স্বাভাবিক পুরুষের মতোই। এদের শুক্রাশয় স্বাভাবিকের তুলনায় ছোটো থাকে। সেখানে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় না। এরা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলেও স্বাভাবিক যৌনজীবন পালন করতে পারে। এরা মানসিক জড়তায় ভোগে। **(খ) XXY পুরুষ (XXY Male) ঃ** আপাত গঠন পুরুষের মতো। এদের যৌনাঙ্গের অস্বাভাবিকতা বয়ঃসন্ধিকালের ভিতর প্রকাশ পায়। শিশ্ন আছে। তবে মূত্রছিদ্রটি (Urethral Orifice) শিশ্নের স্বাভাবিক স্থানে থাকে না। ডাক্তারি ভাষায় একে হাইপোস্পেডিয়াস (Hypospadias) বলে। এদের অণ্ডকোশ শরীরে অভ্যন্তরে থাকে। একে বলে গুপ্ত শুক্রাশয় (Cryptorchidism)। **(গ) XX পুরুষ (XX male) ঃ** XX পুরুষের সঙ্গে ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোমের অনেক মিল আছে। প্রতি ১০,০০০০ জনের ভিতর ৪ অথবা ৫ জনের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এদের স্তন থাকে। তবে সুডৌল, স্ফীত স্তন নয়। এদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ২ সেন্টিমিটারেরও ছোটো শুক্রাশয় থাকে। সেখানে শুক্রাণু (Spermatozoa) উৎপন্ন হয় না। এদের হাইপোস্পেডিয়াসের সমস্যা থাকে। এরা বেঁটে হয়। **(ঘ) টার্নার সিনড্রোম (Turner Syndrome) ঃ** ১৯৩৮ সালে হেনরি টার্নার ডাক্তারি অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এই ধরনের রোগের কারণ নির্ণয় করেন। প্রতি ২৫০০ মহিলাদের ভিতর একজনের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত একটি X ক্রোমোজোমের অনুপস্থিতি এই রোগের কারণ। আপাতদৃষ্ট মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সিনড্রোম দেখা দেয়। জন্মের প্রথম তিন বছর এদের উচ্চতা স্বাভাবিক দেখা দিলেও এরপর থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির হার কমে যায়। যোনিকেশ (Pubic Hair) খুব কম দেখা দেয়। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে সেক্স-হরমোন ইস্ট্রোজেন (Estrogen) ও প্রোজেস্টেরন (Progesterone) নির্গত হওয়া শুরু করে। কিন্তু টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সেক্স-হরমোনের প্রকাশ ঘটে না। ফলে রজঃচক্র বা মাসিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রশস্ত বুকে স্তন গ্রন্থির উদ্ভব হয়। গলার দু-দিকের পুরু মাংসল কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এদের বধির হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এরা অস্থি সংক্রান্ত বিভিন্ন অসুবিধা ও অস্বাভাবিকতায় ভোগে। অনুন্নত ডিম্বাশয় ও গর্ভধারণে অক্ষম হলেও টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্ত কারও কারও স্বাভাবিক যোনিপথ ও জরায়ু থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে গণিত শিক্ষা অথবা স্মৃতিধারণ ক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। **(ঙ) মিশ্র যৌনগ্রন্থির বিকৃতি (Mixed Gonadal Dysgebesis) ঃ** গোনাড হল দেহের সেক্স অর্গান। পুরুষের থাকে শুক্রাশয় আর নারীর থাকে ডিম্বাশয়। MGD সিনড্রোম-নারীদের আপাতদৃষ্টিতে পুরুষ বলে মনে হয়। শুক্রাশয় থাকে, তবে একটি। এর গঠন জটিল আকারের। প্রতিটা শুক্রাশয়ে ৪০০-৬০০টির মতো শুক্রোৎপাদক নালিকা (Seminiferous Tube) থাকে। এর ৫টি স্তর — স্পার্টাগোনিয়া (Spermatogonia), প্রাথমিক

স্পার্টোসাইট (Primary Spermatocyte), গৌণ স্পার্মাটোসাইট (Secondary Spermatocyte), স্পার্মাটিড (Spernatid), স্পার্মাটোজোয়া (Sprematozoa)। এই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্য দিয়েই শুক্রাণু তৈরি হয়। কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উল্লিখিত ৫টি পর্যায়ে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে শুক্রাণু গঠন হয় না। শিশ্ন থাকা সত্ত্বেও এদের শরীরে যোনি (Vagina), জরায়ু (Uterus) ও দুটি ফেলোপিয়ান নালির (Fallopian Tube) অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বিকৃত যৌনগ্রন্থির উপস্থিতির ফলে এদের জননকোশের উৎপত্তি স্থানে গোনাডাল টিউমার (Gonadoblastoma) দেখা দিতে পারে। ২৫% MGD আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(২) প্রকৃত হিজড়ে (True Hermaphrodite) ঃ এদের শরীরে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় উভয়ই অবস্থান করে। এরা অধিকাংশই পেশিবহুল শরীরের অধিকারী হয়ে থাকে। শিশ্ন থাকে, অল্প হলেও কারও কারও শিশ্নের বদলে যোনি থাকে। এবং ভগাঙ্কুর (Clitoris) স্বাভাবিকের তুলনায় বড়ো থাকে অনেক সময় তা পুরুষ শিশ্নের মতো হয়ে থাকে। এদের মূত্রনালি ও যোনিপথ একসঙ্গে থাকে। একে বলে ইউরোজেনিটাল সাইনাস (Urogenital Sinus)। ফেলোপিয়ান নালি (Fallopian Tube) ও জরায়ু (Uterus) থাকে। জরায়ু অত্যন্ত ছোটো হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় একে বলে হাইপোপ্লাস্টিক বা ইউনিকরনেট (Hypoplastic or Unicornuate)। কৈশোরে স্তনগ্রন্থির প্রকাশ ঘটে এবং রজঃচক্র (Menstruation Cycle) শুরু হয়। যাদের বাহ্যিক জননাঙ্গ পুরুষের মতো অর্থাৎ শিশ্ন আছে, তাদেরও রজঃচক্র হয়ে থাকে। একে বলে সাইক্লিক হেমাচুরিয়া (Cyckic Hematuria)। এ ধরনের রজঃচক্রের সময় শুক্রাশয়ে ব্যথা হয়।

কৃত্রিম হিজড়ে বা খোঁজাকরণ হিজড়ে ঃ খোঁজাকরণ বা লিঙ্গ কর্তনের মতো ভয়ংকর আইন-বিরুদ্ধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড হিজড়ে সম্প্রদায়ের সঙ্গী। অনেকেই হিজড়ে কমিউনিটিতে যোগদানকালে নিজের শিশ্ন স্বেচ্ছায় কর্তন করে। কেউ করতে না-চাইলে তাকে জোর করা হয়। এছাড়া সুশ্রী দেখতে বালকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে এনে এদের শিশ্ন ও অণ্ডকোশ কেটে এদের খোঁজা করে দেওয়া হয়। এরপর হিজড়ে বানিয়ে যৌন-ব্যাবসায় নামানো হয়। লিঙ্গ অপসারণ ব্যয়বহুল ও অনৈতিক হওয়ার কারণে হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে এই কর্তনকর্ম সম্পন্ন করে লিঙ্গ-কবন্ধ হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর রক্তপাতও ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে মারা যায় সবার অলক্ষ্যেই।

বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন খতনা হল ইসলাম ধর্মসম্প্রদায়ের মুসলমানি একটি অনুষ্ঠান। কিন্তু এই অনুষ্ঠান শুধু মুসলিম ধর্মেই নয়, অন্য বেশকিছু প্রধান ধর্মেও করা হয়। যেসব সম্প্রদায়ের মানুষরা মনে করেন শুধুমাত্র মুসলমানদেরই লিঙ্গ কাটা বা লিঙ্গের অগ্রত্বক কাটা, তাদের বলি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর সামনে দাঁড়ান। শুধু মুসলমান নয়, সমগ্র খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে

গুলিয়ে ফেলবেন না, এই লিঙ্গকর্তন কিন্তু খোঁজাকরণ নয় — লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন। লিঙ্গের অগ্রত্বক কর্তন করে বা সার্জারির মাধ্যমে অপসারণ করাকে খতনা বলা হয়। নানা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই খতনা করা হয়ে থাকে। আর-একটু গুছিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা হল, পুরুষদের খতনা বলতে পুরুষাঙ্গের বাড়তি ত্বক কেটে ফেলাকে বোঝায়। মনে করা হয়, বিশ্বাসীদের আদি পিতা হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আমলে খতনা প্রথার শুরু। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস মতে, আল্লাহ ইব্রাহিম (আ.)-কে খতনা করার নির্দেশ দেন। ওই সময় তার বয়স ছিল ৯৯ বছর। এ বয়সে তিনি ঐশী নির্দেশে নিজের খতনা দেন। প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে খতনা দেওয়া হয় ১৩ বছর বয়সে। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উত্তরপুরুষ হজরত মুসা (আ.)-এর অনুসারী ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যেও খতনা প্রথার প্রচলন ছিল। হজরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন ইহুদি পরিবারে। জন্মের আট দিন পর তারও খতনা করা হয়।

এটি একটি ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে স্বীকৃত বিষয়। অনেক পুরুষের ধারণা খতনা করা হলে লিঙ্গের স্পর্শকাতরতা বেড়ে যায়। এতে করে যৌনমিলনে অধিক আনন্দ লাভ সম্ভব হতে পারে। তবে মাস্টার এবং জনসন মনে করেন খতনা পুরুষের জন্য অধিক যৌন আনন্দ নিশ্চিত করে এই ধারণাটি ভুল। খতনা করা না-হলেও যৌনমিলনে পুরুষ যথেষ্টই অংশ নিতে পারে এবং যৌন আনন্দ লাভ করে। তবে খতনার প্রধান সুবিধাটা হচ্ছে এর ফলে লিঙ্গের অগ্রত্বকে যে অবাঞ্ছিত দুর্গন্ধযুক্ত তরল জমে নোংরা অবস্থার সৃষ্টি করে তা থেকে লিঙ্গ রেহাই পেতে পারে। এই অবাঞ্ছিত দুর্গন্ধযুক্ত তরল জমাট বেঁধে লেগমার তৈরি করে। ফলে নানা রকম ইনফেকশন হতে পারে এবং যৌনজীবন বিব্রতকর হতে পারে। ডাক্তারি মতে খতনার ফলে পুরুষের লিঙ্গ পরিচ্ছন্ন থাকে বেশি। যাঁরা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন তাঁদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, খতনারও প্রয়োজন হয় না। তবে বর্তমান যুগে যেহেতু ওরাল সেক্স বা শকিং করার প্রবণতা বেড়েছে, সেই কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌনাঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন রাখার প্রবণতা বেড়েছে।

সেকালে খতনা করা হত হাতুড়ে দিয়ে। এখন সময় বদলেছে। হাইজেনিকের প্রশ্নে আর কোনো আপস নয়। শিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং পেশাদার শল্য চিকিৎসকদের দিয়ে খতনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রয়োজন হলেই হবে না, খরচ অনেক। খরচ ১০-১৫ হাজারের নীচে নয়। গরিবদের পক্ষে এই খরচ করে মুসলমানি অনুষ্ঠান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বহু জায়গায় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেউ হাজার হাজার টাকা খরচ করে মুসলমানির অনুষ্ঠান করে, আর কেউ বয়স পেরিয়ে গেলেও টাকার জন্যে খতনা করাতে পারে না। অতএব এইসব ফাউন্ডেশনগুলি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খতনা করিয়ে থাকে। খতনার পর প্রত্যেককে ১টি করে লুঙ্গি, গামছা এবং ক্ষত শুকানোর জন্যে ফুল কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক, পেইনকিলার ও ভিটামিন-সি ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

মূলত খতনা প্রথার উদ্ভব হয় ইহুদি সমাজে। ইহুদিরা এটিকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবেই মনে করে। খ্রিস্টীয় বিধানে বাধ্যবাধকতা তেমন না থাকলেও এ ধর্মের সূতিকাগার প্যালেস্টাইন ও আরব খ্রিস্টানদের মধ্যে খতনা প্রথার প্রচলন আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে খতনাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ধরা হয়। সাধারণের ভাষায় যা 'মুসলমানি' হিসাবে পরিচিত। অনেকেরই ধারণা খতনা না-দিলে মুসলমানিত্ব প্রাপ্ত হয় না। খতনার সঙ্গে মুসলমানিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলোকে 'ফরজ' বলে অভিহিত করা হয়। সে অর্থে খতনা 'ফরজ' নয়। অর্থাৎ এটি পালন না-করলে ধর্মচ্যুতি বা গুণাহর কোনো আশঙ্কা নেই। খতনা মুসলমানদের জন্য একটি অনুসরণীয় স্বাস্থ্যবিধি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মহানবি হজরত মোহাম্মদ (স.) নিজে খতনা করেছেন। অন্যদেরও খতনা করতে উৎসাহিত করেছেন। যে কারণে মুসলিম সমাজে পুরুষদের ত্বকচ্ছেদকে সুন্নতে খতনা হিসাবে অভিহিত করা হয়। মহানবি (সা.) যেসব অনুশাসন বা নিয়ম পালন করতেন সেগুলোকেই বলা হয় সুন্নত। ইসলামের দৃষ্টিতে সুন্নত পালন করা উত্তম। এর মাধ্যমে মহানবির (সা.) জীবনাদর্শকে অনুসরণ করা হয়। সে হিসাবে এটি একটি পুণ্যের কাজ।

শুধু পুরষদেরই খতনা করা হয়, তা কিন্তু নয়। কোথাও কোথাও মেয়েদেরও খতনা করা হয়। মেয়েরা যেন সহবাস উপভোগ করতে না পারে বা সতীত্ব রক্ষার নামে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নারীদের যৌনাঙ্গচ্ছেদ বা এফজিএম করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসেব অনুযায়ী, ওই দুই মহাদেশের ২৯টি দেশের প্রায় ১২০ থেকে ১৪০ মিলিয়ন নারী অমানবিক এই ঘটনার শিকার হয়েছেন। ইউনিসেফের মতে, মেয়েদের যৌনাঙ্গচ্ছেদের কারণে তাদের শরীরে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি নানান সমস্যা দেখা দেয়। বিশ্বে কমপক্ষে ১৫ কোটি নারী খতনা প্রথার মতো বর্বরতার শিকার। সুপার মডেল ওয়ারিস দিরির মতে, আফ্রিকায় এখনও কুমারী মেয়েদের খতনা দেওয়া হয়। নারীর জৈবিক চাহিদা কমাতে এ প্রথা চালু হয়েছিল। এ ধারাটি শুধু আফ্রিকাতে নয়, ইউরোপ ও আমেরিকার মতো সভ্য সমাজেও প্রচলিত। সুদানের বিতর্কিত লেখিকা কোলা বুফ তার আত্মজীবনীমূলক বই 'ডায়েরি অব এ লস্ট গার্ল'-এ খতনা প্রথার বীভৎসতার চিত্র তুলে ধরেছেন। নারীবাদী এই লেখিকার বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যে কারও দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু খতনা প্রথার বিরুদ্ধে তার ক্ষোভের প্রতি মনুষ্য চেতনাসম্পন্ন যে কেউ সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য। সুদানের এই জনপ্রিয় লেখিকাকেও তার কিশোরী বয়সে খতনা প্রথার শিকার হতে হয়েছিল। আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোর নারীরাই খতনা প্রথা শিকার।

ধর্মীয় প্রথা শুধু নয়, আধুনিক বিজ্ঞানও পুরুষদের খতনার পক্ষে। কারণ কারোর মতে এটি স্বাস্থ্যসম্মত। যে কারণে ধর্মীয় দিক থেকে যাঁরা খতনা প্রথায় অভ্যস্ত নন, তারাও অনেক সময় স্বাস্থ্যগত কারণে খতনা করান। পুরুষদের খতনা চালুর পিছনে ঐশী নির্দেশের কথা বলা হলেও মেয়েদের খতনা কীভাবে চালু হল তার কোনো প্রামাণিক দলিল নেই। তওরাত,

জবুর, ইঞ্জিল, কোরান অর্থাৎ সেমেটিক জাতির কাছে নাজিলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কিত কোনো নির্দেশনা নেই। পুরুষের খতনাকে আধুনিক বিজ্ঞানও স্বাস্থ্যসম্মত মনে করে। নারীর খতনা ঠিক এর বিপরীত। ইসলামে মেয়েদের খতনার নির্দেশনা না থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব সমাজে এ কুপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। সেন্ট জন ফিলবির লেখা 'এম্পটি কোয়ার্টার' বইয়ে আরব মেয়েদের খতনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারে এ কুপ্রথা সম্পর্কে। সেন্ট জন ফিলবি ১৯৩০ সালে দীর্ঘদিন অবস্থান করার ফলে তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে মেশার সুযোগ পান। সৌদি আরবে সউদ পরিবার ক্ষমতায় আসার পর মেয়েদের খতনা নিষিদ্ধ করে। তারপরও বিভিন্ন আরব গোত্রে এ প্রথা দীর্ঘদিন চালু ছিল। এমনকি বেদুইনদের কোনো কোনো গোত্রের মধ্যে এখনও মেয়েদের খতনা চালু রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। "এম্পটি কোয়ার্টার" বইয়ে সেন্ট জল ফিলবি সৌদি আরবের মুনাসির বেদুইন গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গোত্রের মেয়েরা বিয়ের উপযুক্ত হলে তাদের খতনা করানো হয়। বিয়ের এক বা দুই মাস আগে আয়োজন করা হত তাদের খতনার অনুষ্ঠান। কাহতান, মুররা, বনি হাজির, আজমান ইত্যাদি গোত্রের মেয়েদের খতনা করানো হত জন্মের পরপরই। তাঁবুর মধ্যে খতনা সম্পন্ন করা হত। বিশেষজ্ঞ মহিলা হাজামরা ক্ষুর, কাঁচি এবং সুচ-সুতোর সাহায্যে খতনা করত।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সহ উপমহাদেশের কোথাও মেয়েদের খতনা প্রথা চালু নেই। এসব দেশে অপরিচিত হলেও দুনিয়ার বহু দেশ বিশেষত আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোতে মেয়েদের খতনা প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ প্রথাটি ইতিমধ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও নারী অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য একটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেমন মেয়েদের সেই খতনা? জানা থাকলে ভালো, না-জানলে জেনে নিন। আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল এবং কোনো কোনো আরব দেশে মেয়েদের যে খতনা প্রথা চালু আছে তাতে ভগাঙ্কুরের বর্ধিত অংশটুকু কেটে ফেলা হয়। পুরুষ ও নারীর খতনার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পুরুষদের পুরুষাঙ্গের ত্বকের যে অংশটি কেটে ফেলা হয় তা তেমন স্পর্শকাতর নয়। বরং এটি অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়েও দেখা দেয়। মেয়েদের ভগাঙ্কুর শরীরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থান। নারী তাঁর চরম যৌনানন্দ লাভ করে এই অঙ্গের মধ্য দিয়েই। এটি কেটে ফেললে নারীর যৌনানন্দ চিরকালের মতো শেষ, শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়ে যাবে। ভগাঙ্কুর কেটে ফেললে রক্ত বন্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তীব্র যন্ত্রণাদায়ক তো বটেই। বিশ্বে প্রতি বছর কোটি কোটি পুরুষের খতনা হলেও জীবনহানির ঘটনা প্রায় শূন্য। ভোগান্তির পরিমাণও একেবারে কম। পক্ষান্তরে মেয়েদের খতনার জন্য জীবনহানির ঘটনা অহরহ ঘটছে। ভগাঙ্কুরে সৃষ্ট ক্ষতের কারণে দীর্ঘস্থায়ী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকারও হয় হাজার হাজার নারী, নারীশিশু। স্পষ্টভাবে বলা যায়, মেয়েদের খতনা একটি বর্বর প্রথা। ধান্ধাবাজ নারীবাদিরা কি ঘুমিয়ে আছেন? বন্ধ করুন নারীখতনা!

কুসংস্কারের বশে খতনা দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন সব পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় তা একদিকে যেমন যন্ত্রণাদায়ক, অন্যদিকে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিও বটে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে এমন ধরনের এক গণখতনার ঘটনা ঘটে। ঘটা করে একটা গোত্রের সব কুমারী মেয়ের ভগাঙ্কুরের অংশবিশেষ কেটে ফেলা হয়। যার সংখ্যা ছিল ৬০০। খতনায় যৌনাঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় তাদের অন্তত ১০ জনের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এ প্রথার বিরুদ্ধে শত নিন্দা জানালেও অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। ভাবুন, সিয়েরা লিয়নে মেয়েদের খতনা রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ! আবার কুসংস্কার টিকে থাকার বিষয়টি হয়তো ক্ষমা করা যায়। কিন্তু যে দেশটি বিশ্ব সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত আফ্রিকার সেই মিশরেও মেয়েদের খতনা বর্বরতার যুগকে এখনও লালন করে আসছে। যদিও মিশরে আইনগতভাবে এ প্রথা নিষিদ্ধ। এমনকি এ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করতে প্রচার-প্রচারণারও অভাব নেই। তা সত্ত্বেও মিশরীয় সমাজে প্রতিবছর হাজার হাজার মেয়েকে খতনা দেওয়া হয়। মেয়েদের খতনার জন্য পুরুষশাসিত সমাজের কুৎসিত ধারণাই সম্ভবত বেশি দায়ী। মনে করা হয়, খতনা দেওয়া হলে মেয়েদের স্পর্শকাতরতা হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে পুরুষদের আধিপত্য বজায় থাকবে। অন্ততপক্ষে এ নারীরা যৌনতার কারণে কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন ঘটাবে না। ফলে একটা যৌনবিশুদ্ধ নারী কোনো এক পুরুষের মালিকানাধীন থাকবে। এই মানসিকতার জন্যই যুগ যুগ ধরে কুপ্রথাটি টিকে আছে। যদিও ফ্রান্সে মেয়েদের খতনা মারাত্মক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এ জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু তারপরও সে দেশের সরকার আফ্রিকীয় প্রবাসীদের খতনা প্রথা নিরৎসাহিত করতে পারেনি।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে ফাইমোসিসের কারণেও লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন করতে হয় কখনো-কখনো। **ফাইমোসিস (Phimosis) ঃ** পুরুষাঙ্গের সম্মুখে ঝুলতে থাকা বাড়তি চামড়াটুকু (Prepuceal skin) অনেক সময় লিঙ্গের শীর্ষদেশের (Glans penis) সঙ্গে আটকে গিয়ে যে সমস্যা করে তার নামই ফাইমোসিস। বিশেষ করে ছোট্ট ছেলেদের বাবা-মা অনেক সময়ই এই নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় ভোগেন। প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয় লিঙ্গ না ফোটা। মনে রাখতে হবে শিশুর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষাঙ্গ প্রাপ্তবয়স্কদের মতো না-ও ফুটে উঠতে পারে। তাই এ নিয়ে বাড়তি দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, তবে প্রস্রাব করার সময় যদি ওই বাড়তি চামড়া সহ লিঙ্গের শীর্ষ ফুলে উঠে বা চামড়া ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় কিংবা শিশুর মূত্রত্যাগে কষ্ট হয় (এ অবস্থা নজর এড়িয়ে গেলে একটি পুরুষের দাম্পত্যজীবন অন্ধকারময় হয়ে উঠতে পারে)। তবে ধরে নিতে হবে সেটা স্বাভাবিক নয়। বড়োদেরও ফাইমোসিস হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ব্যালানাইটিস (Balanitis) রোগের কারণে হয়ে থাকে। বড়োদের এমনটি হলে লিঙ্গ নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না এবং তা থেকে অনেক সময় পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের যৌনজীবনও বরবাদ হয়ে যেতে পারে। ছোটো অথবা বড়ো যারই ফাইমোসিস হোক-না-কেন, এর একমাত্র চিকিৎসা হল পুরুষাঙ্গের বাড়তি চামড়াটুকু ফেলে দেওয়া। আন্তর্জাতিক এইডস

সম্মেলনে ফরাসি গবেষক কেভিন জাঁ বলেন, "(খতনা করার ফলে এইডসের) ঝুঁকি হ্রাসের মাত্রা বেশ কম মনে হলেও শুরু হিসাবে এটা কিন্তু কম নয়।" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বা (এইচআইভি)-র সংক্রমণ কমানোর লক্ষ্যে পুরুষদের খতনাকে উৎসাহিত করে আসছে। ইসলাম এবং ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এমনিতেই খতনার চল রয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও পুরুষদের খতনার হার বাড়ছে। এইডস সম্মেলনে প্রকাশ করা নিবন্ধ অনুযায়ী খতনা করলে পুরুষের এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কমে। অন্যদিকে নারীর কমে শতকরা ১৫ ভাগ।

জার্মানে একটি চার বছরের ছেলের খতনা করানো নিয়ে এই বিতর্কের শুরু। খতনার সময় চিকিৎসকের ভুলে ওই বাচ্চার পুরুষাঙ্গ থেকে অতিরিক্ত রক্তপাত হলে, তা কোলন শহরের আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আর আদালত রায় দেন, বাচ্চার ধর্মীয় অধিকার রয়েছে, কিন্তু সেটা তার নিজের শরীরের অধিকারের চেয়ে বেশি নয়। অর্থাৎ বাবা-মার ইচ্ছায় এখন থেকে খতনা করা বন্ধ। আর যদি করাতেই হয়, তাহলে ছেলে বড়ো হলে তার মতামত নিয়ে সেটা করতে হবে। তারপর থেকে এই নিয়ে বিতর্ক চলছে, থামছে না। কারণ আগেই বলেছি কেবল মুসলমান নয়, ইহুদিদের ধর্মীয় আচারের একটি অংশ হচ্ছে এই খতনা। এই রায় নিয়ে পরবর্তীতে শুরু হয় বিতর্ক। কেন-না জার্মানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মুসলমানের বাস। এ ছাড়া রয়েছে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার নিবন্ধনকৃত ইহুদি। মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদিদের মধ্যেও খতনা বিষয়টি প্রচলিত। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিক এমনকি গবেষকরা পর্যন্ত। কেউ আদালতের রায়কে বাচ্চার অধিকারের সংরক্ষণ হিসাবে দেখছেন, অনেকে আবার এটিকে ধর্মে আদালতের অহেতুক হস্তক্ষেপ হিসাবে মূল্যায়ন করছেন। এই যেমন ইহুদি নেতা পিনশাস গোল্ডস্মিথ। ইউরোপের রাব্বিদের এই নেতা কোলনের আদালতের রায়ের তীব্র সমালোচনা করে বললেন, "যদি এই রায়কে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে এবং এটিকে আইন হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে জার্মান সমাজের একটি বড়ো অংশের কোনো ভবিষ্যত এই দেশে নেই।" জার্মানির ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে রাষ্ট্রীয় কোনো কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় প্রভাব গ্রাহ্য করা হয় না। অন্যদিকে ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। তাই খতনার মতো ধর্মীয় আচারকে কেবল ধর্মীয় বিষয় নয়, বাচ্চার শারীরিক অধিকার হিসাবেও অনেকে দেখতে চান। যেমন জার্মান সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্ডেসটাগে সবুজ দলের নেত্রী রেনাটে ক্যুনাস্ট বললেন, "আমি চাই জার্মানিতে ইহুদি ও মুসলমানরা যাতে তাদের ধর্মকানুন মেনে চলতে পারে। আবার অন্যদিকে নিজের শরীরের উপর শিশুর যে অধিকার আছে, সেটার প্রতিও আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। এটা কোনো সহজ বিষয় নয় এবং এই নিয়ে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও যাবে না।"

তবে আর-এক রাজনীতিক ফোল্কা বেক কিন্তু ভিন্নমত জানালেন। ধর্মীয় সব বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, "এমনকি উদার সমাজে রাষ্ট্র

কখনো ধর্মীয় সংস্কারের দায়িত্ব তুলে নিতে পারে না, বরং ধর্মীয় সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একটি উপায় খুঁজে বের করতে পারে।”

কোলনের আদালতের এই রায় নিয়ে জার্মানের সংসদ সদস্যরা একটি খসড়া প্রস্তাব সংসদে তোলেন। এতে খতনার ধর্মীয় অধিকার বহাল রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তবে অনেকেই আছেন যারা আদালতের রায়কে শ্রদ্ধা করছেন এবং তা মেনে নিয়েছেন। তাদের একজন মেহমেত কিলিশ। জার্মান সংসদের এই মুসলিম সদস্য আদালতের রায় অনুসারে ছেলের খতনা করানো থেকে বিরত থাকছেন। তাঁর কথায়, “এই রায় না এলে হয়তো এই গ্রীষ্মেই আমি আমার ১ এবং ৮ বছরের দুই ছেলের খতনা করিয়ে ফেলতাম। এই রায়ের পর আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। এবং এরপর আমরা খতনা না-করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা আমরা আমাদের সন্তানের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমরা মনে করি, এটা বাচ্চাদের মতামত নিয়ে করাই ভালো হবে।” এরপরও কিন্তু বিতর্ক থামছে না। আদালতের এই রায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ কি না, আর সেটা হয়ে থাকলে তা কতটুকু নৈতিক, সেই বিতর্ক এখন আবার শুরু হয়েছে। সমস্যাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন জার্মানির নৈতিকতা পরামর্শ কেন্দ্র। এখানকার একমাত্র মুসলিম সদস্য ইলহান ইলিচ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “নৈতিক দিক থেকে আমি মনে করি যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছুই আইনগতভাবে পরিচালিত হওয়ার দরকার নেই। তবে এখন বিতর্ক যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে আমার সন্দেহ যে আইন না-করে বিষয়টির সুরাহা করা আদৌ সম্ভব কি না।”

ভাবা যায়? শুধুমাত্র লিঙ্গকে কেন্দ্র করেই বাঙালি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। বাংলা ভাষা দুটি ভিন্ন রূপ পেল — ইসলামাশ্রয়ী মুসলমানি বাংলা আর সংস্কৃতাশ্রয়ী হিন্দু বাংলা। এক গল্প চালু আছে — খিলজিরা বাঙালিদের একটি পুরুষাঙ্গের খানিকটা চামড়া কেটে দিয়ে বলল যে তোমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছ। তাদের বিশেষ কাজে তেমন কোনো সমস্যা না-হওয়ায় বাঙালিরা এটাকে কিছু মনে করল না। কার লিঙ্গ ‘কাটা’ আর কারটা ‘আকাটা’ তা তাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। ‘সুন্নতে খতনা’ নামক এ কাজটির মাধ্যমে বাঙালিদের আর-একটি পরিচয় হল বটে, কিন্তু বাঙালি বুঝতে পারল না যে তারা দু-ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এরপর ইংরেজ শাসকরা বুঝতে পারল এই ‘কাটা’ আর ‘আকাটা’-দের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে পারলেই তাদের ঔপনিবেশিক শাসন অনেক সহজ হয়। জনশ্রুতি আছে, ইংরেজরা একদিন দু-দলকে ডেকে ন্যাংটো করে সামনাসামনি দাঁড় করাল। তারপর দেখাল যে “তোমাদের দু-দলের লিঙ্গ একরকম নয়, তোমাদের একদলেরটা ‘কাটা’ এবং অন্য দলেরটা ‘আকাটা’। সুতরাং, তোমরা কখনোই এক নও”। তারপর ‘আকাটা’ দলের লিঙ্গে কিছু বিছুটি পাতার গুড়ো দেওয়া হল এবং ‘কাটা’-দের লিঙ্গে মেখে দেওয়া হল কিছু মরিচের গুড়ো। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করা হল, “তোমাদের কেমন অনুভূত হচ্ছে?” একদল বলল চুলকানির কথা, অন্য দল বলল জ্বালা-পোড়ার কথা। তারপর

তাদের বোঝানো হল, "দেখো, তোমাদের চুলকায় আর ওদের জ্বলে-পুড়ে যায়। তার মানে এখানেও তোমরা ভিন্ন"। এবার ইংরেজরা 'কাটা'-দেরকে বোঝাল যে তোমাদের দেশটারও 'সুন্নতে খতনা' করা দরকার। ১৯০৫ সালে 'বাঙালিত্ব'-এর সুন্নতে খতনা করা হল। একেবারে মাঝখান থেকে কেটে। গোড়ার অংশটা পশ্চিমবঙ্গ, আগার অংশটা পূর্ববঙ্গ। তবে ১৯১১ সালেই কিছু বিশেষজ্ঞ সার্জন (কার্জন?) দ্বিখণ্ডিত বাঙালিত্বকে আবার সেলাই করে জুড়ে দিলেন। তবে বাঙালি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান। ১৯৪৭ সালে এসে বাঙালিত্বকে দ্বিখণ্ডিত করে পুনরায় সুন্নতে খতনা করা হল। চেষ্টা করা হল বাঙালির সঙ্গে একেবারেই জাত-গোষ্ঠী-সমাজ-সংস্কৃতিতে ভিন্ন আর-একজন 'কাটা'-র সঙ্গে জুড়ে দিতে। যেহেতু ভিন্ন জাত-গোষ্ঠীর অঙ্গটি বাঙালিদের মতো অর্ধেক কাটা ছিল না, তাই ওটাকে সেলাই করে সংযুক্ত করে দেয়া গেল না; কোনোরকমে সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হল। বাঙালির প্রাণের ধর্ম 'বাঙালিত্ব' এবার আর-একজনের কাটা অঙ্গের সঙ্গে ঝুলে রইল। পাকিস্তানিরা এবার ঝুলে থাকা অর্ধেক বাঙালিত্বর পুনরায় সুন্নতে খতনা করার প্রস্তুতি নিল। বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান বানানোর পায়তারা কষল। সে তো আর-এক গল্প!

রক্তমাংসের লিঙ্গের তো অনেকটা আলোচনা করা গেল, কিন্তু কৃত্রিম লিঙ্গের আলোচনা না-করলে এ প্রবন্ধ অম্পূর্ণ থেকে যাবে। কৃত্রিম লিঙ্গ বা ডিলডো পুংজননেন্দ্রিয় সদৃশ এক ধরনের যৌনখেলনা। বিশেষ করে হস্তমৈথুনের বা এধরনের বিকল্প রতিক্রিড়ার সময় অথবা সঙ্গীর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়ার সময় শারীরিক অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৃত্রিম লিঙ্গ আকৃতি-আকার এবং সামগ্রিক চেহারার দিক দিয়ে দেখতে উলম্ব বা উত্থিত পুরুষ-শিশ্নের মতো। এর প্রসারিত বর্ণনা সংযুক্ত রয়েছে ভাইব্রেটর সামগ্রীতে। এই ধরনের লিঙ্গাকৃতির সরঞ্জাম যোনিপথে অনুপ্রবেশের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা মানসিকভাবে পুরুষ-লিঙ্গের মতো ব্যবহার করা যায়। যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলারা অ্যানাল সেক্স পছন্দ করেন তাঁরা অনেকে পায়ুপথে অনুপ্রবেশের জন্যেও এটা ব্যবহার করে থাকে। কৃত্রিম লিঙ্গ সব লিঙ্গের মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা মূলত হস্তমৈথুন এবং অন্যান্য যৌন কার্যকলাপের নিরাপদ বিকল্প উপায়মাত্র। কৃত্রিম লিঙ্গের বস্তুকাম মূল্য আছে। তবে কিছু ব্যবহারকারী অন্য উপায়েও এটি ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ পূর্বরাগের সময় চামড়ার উপর চালনা করা। উপযুক্ত আকারের হলে, কৃত্রিম মুখমেহনের জন্য মৌখিক অনুপ্রবেশ কাজেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কোনো-কোনো ব্যক্তি কৃত্রিম লিঙ্গ বিশেষভাবে জি-স্পট উদ্দীপিত করার কাজে ব্যবহার করে।

কৃত্রিম লিঙ্গ বস্তুত ফাঁপা ধরনের। পুরুষ তার লিঙ্গ এই কৃত্রিম লিঙ্গের ভিতর পুরে নিয়ে নারীর সঙ্গে সঙ্গমে রত হতে পারে। যে সকল পুরুষের লিঙ্গোত্থান সমস্যা আছে তারা এই খেলনা ব্যবহার করে থাকে। এই ডিলডো নামক যন্ত্রটি কোমরে শক্ত করে বাঁধার জন্য চামড়ার স্ট্যাপ থাকে যার কারণে এর নাম স্ট্র্যাপ অন ডিলডো। অন্যদিকে নারী সমকামীরা

যোনিভেদের আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে "স্ট্র্যাপ-অন ডিলডো" ধারণ করে একজন আরেকজনকে তৃপ্ত করতে পারে। পায়ুপথে ঢোকানো এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃত্রিম শিশ্নের অবস্থান করাকে বাট প্লাগ বলা হয়। কৃত্রিম শিশ্ন পায়ুপথে অনুপ্রবেশের পুনরাবৃত্তি অথবা দ্রুতলয়ে খোঁচানোর জন্য ব্যবহৃত।

ভারতে কিছু বিচার ব্যবস্থায় কৃত্রিম লিঙ্গের বাজারজাতকরণ এবং বিক্রয় অবৈধ। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানে এবং গ্রেট প্লেইন্সের কিছু স্থানে "অশ্লীল সরঞ্জাম" আইনে কৃত্রিম লিঙ্গ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ২০০৭ সালে ফেডারেল আপিল কোর্ট যৌনখেলনা বিক্রি নিষিদ্ধে আলাবামার আইন সমর্থন করে। ১৯৩৮ সালের অশ্লীলতা-বিরোধী আইনে প্রয়োগ (Anti-obscenity Enforcement Act) বহাল রাখে ২০০৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।

কৃত্রিম লিঙ্গ গ্রিক দানিশিল্পে দেখা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এধরনের দানিশিল্পে একটি দৃশ্য রচিত আছে যেখানে মৌখিক যৌনকর্মে লিপ্ত একজন মহিলা একজন পুরুষের উপর ঝুঁকে আছে এবং অন্য একজন পুরুষ তার পায়ুপথে কৃত্রিম লিঙ্গ প্রবেশের চেষ্টা করছে। ৪১১ খ্রিস্টপূর্বের 'অ্যারিস্টোফেনিস' কমেডিতে বহুবার উল্লেখিত লাইসিসট্রাটা (LYSISTRATA)। সাধারণত কৃত্রিম লিঙ্গ বিভিন্ন আকার-আকৃতির পুরুষ লিঙ্গের বা পুংজনেন্দ্রীয় আকৃতিরও হয়ে থাকে। বর্তমানে নিখুঁতভাবে পুরুষ শারীরস্থান পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঢঙের এবং আকারের কৃত্রিম শিশ্ন তৈরি হয়ে থাকে। জাপানে প্রাণী অনুরূপ এবং কার্টুন অনুরূপ কৃত্রিম শিশ্ন তৈরি হয়ে থাকে। যেমন হ্যালো কিটি। এটা মূলত খেলনা হিসাবেই বিক্রি হয়ে থাকে। ফলে অশ্লীলতা আইন থেকে বিরত থাকা যায়। জাপানের কাওয়াসাকি অঞ্চলের শিন্ট ধর্মাবলম্বী লোকেরা প্রতি বছর এপ্রিলের প্রথম রবিবার সাড়ম্বরে পালন করে একটি ধর্মানুষ্ঠান, যার নাম কানামারা মাৎসুরি (Kanamara Matsuri)। জাপানের কাওয়াসাকির একটি মন্দিরে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি প্রধানত ধর্ম বিশ্বাসের অনুষ্ঠান, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে পুরুষের বংশদণ্ডের মতো উত্থিত লিঙ্গ। পৃথিবী ব্যাপী এটি লিঙ্গ উৎসব (Penis Festival) নামে পরিচিত। পেনিস ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয় জাপানের কাওয়াসাকির কানাইয়ামা মন্দিরে, যা ইতিমধ্যেই পেনিস মন্দির হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে। এই মন্দিরের বয়স ৭০০ বছরেরও বেশি। মন্দিরে একসময় যৌনকাজ করা মেয়েরা আসত প্রার্থনার জন্য, যাতে এসটিডি (Sexually Transmitted Diseases) থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এরপর উৎপাদনে (বাচ্চা), এমনকি শস্য উৎপাদনের জন্য এই মন্দিরে ভক্তরা প্রার্থনার জন্য আসেন। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে প্রথম প্রচলন হয় এই বিচিত্র উৎসবের। স্থানীয় বারবনিতারা বসন্তের শেষে বিশাল অগ্রত্বকহীন পুরুষাঙ্গের রেপ্লিকা নিয়ে মিছিল করে যায় কাওয়াসাকি কানামারা মঠে প্রার্থনা করতে। যেন তারা সারাবছর যে-কোনো ধরনের যৌন সংক্রমণ বা রোগ থেকে বাঁচতে পারে।

মূলত এটি একটি শিন্ট ধর্মীয় উৎসব, যার মাধ্যমে প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির জন্য বন্দনা করা হয়। জানা যায়, ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যৌনব্যাধি বিশেষ করে সিফিলিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘটা করে এই মেলা উদযাপন করত বারবনিতারা। বর্তমানে এটি পালিত হয় নিরাপদ যৌনতা, এইডস সংক্রমণ রোধ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার অংশ হিসাবে উৎসবে হাজার হাজার লোক জড়ো হন। সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে লিঙ্গ রেলি। মন্দিরের কাঠের লিঙ্গটি নিয়ে রেলিতে বের হন ভক্তরা। সঙ্গে থাকে আরো বড়ো বড়ো লিঙ্গ এবং সবার হাতে হাতে পুরুষদের অবিকল লিঙ্গ সদৃশ খেলনা বা বস্তু। ফেস্টিভালের সময়ে প্রায় নগ্ন মেয়েরা সেখানে লিঙ্গ আকৃতির বিভিন্ন আইসক্রিম, ফাস্টফুড, খেলনা বিক্রি হয়। কেউ ইচ্ছে করলে সেগুলো কিনে খেতে পারে, লিঙ্গের উপর বসতে পারে, লিঙ্গের সঙ্গে ছবি উঠতে পারে, লিঙ্গের মাথায় চুমুও খেতে পারে। সাধারণত মেয়েরা আবার এসব ব্যাপার খুবই আগ্রহী হয়ে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় ছোটো থেকে বড়ো সবাইকে দেখা যায় পুরুষাঙ্গের আদলে তৈরি চকলেট আর আইসক্রিম চুষতে। অনেককেই ছবির জন্য পোজ দিতে দেখা যায় বিশালাকৃতির পুরুষাঙ্গের পাশে। মাথায় পেনিস টুপি পরিধান করে নাচগান করেন অনেকেই। ৬ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলে টানা ৭ এপ্রিল রাত পর্যন্ত। বর্তমানে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে মেলাটি। শুধু জাপান নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও আলোচিত হচ্ছে কানামারা মাৎসুরি। এ ফেস্টিভালে আয় হওয়া টাকা এইডস গবেষণার কাজে দান করা হয়, যেহেতু এককালে এখানে যৌনকর্মীরা আসতেন এসটিডি যাতে না হয় সেই প্রার্থনার জন্য। জাপানের সংস্কৃতি চর্চ্চায় রক্ষণশীলতা প্রচণ্ড। পাশাপাশি আছে অবারিত উন্মোচন। পেনিস ফেস্টিভাল বা লিঙ্গ উৎসব এই রকম অবারিত উন্মোচনেরই একটি অন্যতম উদাহরণ।

লিঙ্গ নামক বিষয়টা নিয়ে যখন এত কথাই হল, তখন বিখ্যাত লিঙ্গটা বাদ গেলে হবে কেন! হ্যাঁ, শিবলিঙ্গের কথাই বলছি। "লীনং বা গচ্ছতি, লয়ং বা গচ্ছতি ইতি লিঙ্গম্", যা লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গ। আবার কারও মতে সর্ববস্তু যে আধারে লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গম। কিন্তু বৈয়াকরণিকগণের মতে "লিঙ্গতে চিহ্নতে মনেনেতি লিঙ্গম"। লিঙ্গ শব্দের অর্থ 'প্রতীক' বা 'চিহ্ন'। যার দ্বারা বস্তু চিহ্নিত হয়, সত্য পরিচয় ঘটে তাই-ই লিঙ্গ। অর্থাৎ যার দ্বারা সত্যবিজ্ঞান লাভ হয়, যার সাহায্যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তাকেই বস্তু পরিচয়ের চিহ্ন বা লিঙ্গ বলে। আর এজন্যই দেহ-প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থান করে বলেই চিদ্ জ্যোতিকে বলা হয় লিঙ্গ। ভূমা ব্রহ্মের গুহ্য নাম "শিব" এবং ভূমা ব্রহ্মের পরিচায়ক বলে আত্মজ্যোতির উদ্ভাসনের নাম শিবলিঙ্গ।

প্রলয়ের কারণ বলে লোকে মহাদেবকে লিঙ্গ বলে। এই লিঙ্গ ব্রহ্মের পরম শরীর। আর এ জন্যই ত্রেতাযুগে রাবণ বধে যাত্রার সময় সেতুবন্ধে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরে শিবের পুজো করেন। আবার পরশুরামও পশুপতি শিবের তপস্যা করেই পশুপাত অস্ত্র লাভ করেন। দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী জাম্ববতীসহ উপমন্যু মুনির আশ্রমে গমন করেন এবং

তথায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পনান্তে অমিত মহাদেবের লিঙ্গমূর্তিতে পুজো করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে গিয়ে ভুতিভূষণ শিবের পুজো করেছিলেন। শিবলিঙ্গ হল হিন্দুদেবতা শিবের একটি প্রতীকচিহ্ন। হিন্দু মন্দিরগুলিতে সাধারণত শিবলিঙ্গের পুজো হয়। শিবলিঙ্গকে অনেক সময় যোনিচিহ্ন (এটাকে অনেকে গৌরীপট্টও বলে) সহ তৈরি করা হয়। সব মিলিয়ে একটি মৈথুনরত প্রতীকই দৃশ্যমান হয়। যোনি হল মহাশক্তির প্রতীক। শিবলিঙ্গ ও যোনির সম্মিলিত রূপটিকে নারী ও পুরুষের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যসত্ত্বা এবং জীবনসৃষ্টির উৎস পরোক্ষ স্থান ও প্রত্যক্ষ কালের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য গবেষকরা লিঙ্গ ও যোনিকে নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে হিন্দুরা শিবলিঙ্গকে সৃষ্টির নারী ও পুরুষ উভয়ের অবদানের কথা স্মরণ করে শিবলিঙ্গের পুজো করেন। একটি সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী, শিবলিঙ্গ শিবের আদি-অন্তহীন সত্ত্বার প্রতীক এক আদি ও অন্তহীন স্তম্ভের রূপবিশেষ। শিব এক অনাদি অনন্ত লিঙ্গস্তম্ভের রূপে আবির্ভূত, বিষ্ণু বরাহ বেশে স্তম্ভের নিম্নতল ও ব্রহ্মা ঊর্ধ্বতল সন্ধানে রত। এই অনাদি অনন্ত স্তম্ভটি শিবের অনাদি অনন্ত সত্ত্বার প্রতীক মনে করা হয়। নৃতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার জন ফুলারের মতে, হিন্দু দেবতাদের মূর্তি সাধারণত মানুষ বা পশুর অনুষঙ্গে নির্মিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রতীকরূপী শিবলিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম। কেউ কেউ মনে করেন, লিঙ্গপুজো ভারতীয় আদিবাসী ধর্মগুলি থেকে হিন্দুধর্মে গৃহীত হয়েছে।

অথর্ববেদে একটি স্তম্ভের স্তব করা হয়েছে। এটিই সম্ভবত লিঙ্গপুজোর উৎস। কারোর কারোর মতে যূপস্তম্ভ বা হাঁড়িকাঠের সঙ্গে শিবলিঙ্গের যোগ রয়েছে। উক্ত স্তবটিকে আদি-অন্তহীন এক স্তম্ভ বা স্কম্ভের কথা বলা হয়েছে; এই স্কম্ভ চিরন্তণ ব্রহ্মের স্থলে স্থাপিত। যজ্ঞের আগুন, ধোঁয়া, ছাই, মাদক সোমরস ও যজ্ঞের কাঠ বহন করার ষাঁড় ইত্যাদির সঙ্গে শিবের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির যোগ লক্ষিত হয়। মনে করা হয়, কালক্রমে যূপস্তম্ভ শিবলিঙ্গের রূপ নিয়েছিল। লিঙ্গপুরাণ এই স্তোত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়। এই কাহিনিতে উক্ত স্তম্ভটিকে শুধু মহানই বলা হয়নি, বরং মহাদেব শিবের সর্বোচ্চ সত্ত্বা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারত ও কম্বোডিয়ায় প্রচলিত প্রধান শৈব সম্প্রদায় ও অনুশাসন গ্রন্থ শৈবসিদ্ধান্ত মতে, উক্ত শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা পঞ্চানন (পাঁচ মাথাবিশিষ্ট) ও দশভুজ (দশ হাতবিশিষ্ট) সদাশিব প্রতিষ্ঠা ও পুজোর আদর্শ উপাদান হল শিবলিঙ্গ। নেপালে দশম শতাব্দীর চার মাথাবিশিষ্ট পাথরের শিবলিঙ্গ সবচেয়ে প্রাচীন। এখনও পূজিত হয় এমন প্রাচীনতম লিঙ্গটি রয়েছে গুডিমাল্লামে। ক্লস ক্লোস্টারমায়ারের মতে, এটি স্পষ্টতই শিশ্নের অনুষঙ্গে নির্মিত। লিঙ্গটির নির্মাণকাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। শিবের একটি অবয়ব লিঙ্গটির সম্মুখভাগে খোদিত রয়েছে।

১৮১৫ সালে "আ ভিউ অফ দ্য হিস্ট্রি, লিটারেচার, অ্যান্ড মিথোলজি অফ দ্য হিন্দুজ" গ্রন্থে লেখক ব্রিটিশ মিশনারি উইলিয়াম ওয়ার্ড হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে

লিঙ্গপুজোরও নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে, লিঙ্গপুজো ছিল, "মানুষের চারিত্রিক অবনতির সর্বনিম্ন পর্যায়।" শিবলিঙ্গের প্রতীকবাদটি তাঁর কাছে ছিল "অত্যন্ত অশালীন; সে সাধারণের রুচির সঙ্গে মেলানোর জন্য এর যতই পরিমার্জনা করা হোক-না কেন"। ব্রায়ান পেনিংটনের মতে, ওয়ার্ডের বইখানা "ব্রিটিশদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা ও উপমহাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল।" ব্রিটিশরা মনে করত, শিবলিঙ্গ পুরুষ যৌনাঙ্গের আদলে নির্মিত এবং শিবলিঙ্গের পুজো ভক্তদের মধ্যে কামুকতা বৃদ্ধি করে। অবশ্য ১৮২৫ সালে হোরাস হেম্যান উইলসন দক্ষিণ ভারতের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি বই লিখে এই ধারণা খণ্ডানোর চেষ্টা করেছিলেন।

মনিয়ার উইলিয়ামস তাঁর "ব্রাহ্মণইজম্ অ্যান্ড হিন্দুইজম্" বইয়ে লিখেছেন, "লিঙ্গ" প্রতীকটি "শৈবদের মনে কোনো অশালীন ধারণা বা যৌন প্রণয়াকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় না।" জেনেন ফলারের মতে, লিঙ্গ "পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গে নির্মিত এবং এটি মহাবিশ্বরূপী এক প্রবল শক্তির প্রতীক"। ডেভিড জেমস স্মিথ প্রমুখ গবেষকরা মনে করেন, শিবলিঙ্গ চিরকালই পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গটি বহন করছে। অন্যদিকে এন. রামচন্দ্র ভট্ট প্রমুখ গবেষকরা মনে করেন, পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা। এম. কে . ভি. নারায়ণ শিবলিঙ্গকে শিবের মানবসদৃশ মূর্তিগুলি থেকে পৃথক করেছেন। তিনি বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপুজোর অনুপস্থিতির কথা বলেছেন এবং এর যৌনাঙ্গের অনুষঙ্গটিকে তান্ত্রিক সূত্র থেকে আগত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস "জীবন্ত লিঙ্গপুজো" করতেন বলে কথিত আছে। ১৯০০ সালে প্যারিস ধর্মীয় ইতিহাসে কংগ্রেসে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'শিবলিঙ্গ' ধারণাটি এসেছে বৈদিক যূপস্তম্ভ বা স্তম্ভ ধারণা থেকে। যূপস্তম্ভ হল বলিদানের হাঁড়িকাঠ। এটিকে অনন্ত ব্রহ্মের একটি প্রতীক মনে করা হত। জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ গুস্তাভ ওপার্ট শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রে এগুলিকে পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গে সৃষ্ট প্রতীক বলে উল্লেখ করে তা পাঠ করলে, তারই প্রতিক্রিয়ায় বিবেকানন্দ এই কথা বলেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শালগ্রাম শিলাকে পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গ বলাটা এক কাল্পনিক আবিষ্কার মাত্র। তিনি আরও বলেছিলেন, শিবলিঙ্গের সঙ্গে পুরুষাঙ্গের যোগ বৌদ্ধধর্মের পতনের পর আগত ভারতের অন্ধকার যুগে কিছু অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মস্তিস্কপ্রসূত গল্প। স্বামী শিবানন্দও শিবলিঙ্গকে যৌনাঙ্গের প্রতীক বলে স্বীকার করেননি। ১৮৪০ সালে এইচ. এইচ. উইলসন একই কথা বলেছিলেন। ঔপন্যাসিক ক্রিস্টোফার ইসারউড লিঙ্গকে যৌন প্রতীক বলে মানতে চাননি। ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়ায় "Lingam" ভুক্তিতেও শিবলিঙ্গকে যৌন প্রতীক বলা হয়নি।

মার্কিন ধর্মীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ওয়েনডি ডনিগারের মতে, For Hindus, the phallus in the background, the archetype (if I may use the word in its Eliadean,

indeed Bastianian, and non-Jungian sense) of which their own penises are manifestations, is the phallus (called the lingam) of the god Siva, who inherits much of the mythology of Indra (O'Flaherty, 1973). The lingam appeared, separate from the body of Siva, on several occasions...On each of these occasions, Sivas wrath was appeased when gods and humans promised to worship his lingam forever after, which, in India they still do. Hindus, for instance, will argue that the lingam has nothing whatsoever to do with the male sexual organ, an assertion blatantly contradicted by the material. যদিও অধ্যাপক ডনিগার পরবর্তীকালে তাঁর "দ্য হিন্দুজ ঃ অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি" বইতে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে লিখেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে শিবলিঙ্গকে ঈশ্বরের বিমূর্ত প্রতীক বা দিব্য আলোকস্তম্ভ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব বইতে লিঙ্গের কোনো যৌন অনুষঙ্গ নেই। হেলেন ব্রুনারের মতে, লিঙ্গের সামনে যে রেখাটি আঁকা হয়, তা পুরুষাঙ্গের গ্ল্যান্স অংশের একটি শৈল্পিক অনুকল্প। এই রেখাটি আঁকার পদ্ধতি মধ্যযুগে লেখা মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অনুশাসন এবং আধুনিক ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতির কিছু কিছু প্রথার সঙ্গে যৌনমিলনের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়।

আগামা ধর্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬-১৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে Lin অর্থ বিলীন হওয়া এবং ga অর্থ উৎপন্ন হওয়া। অর্থাৎ যে মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্তা (শিব) থেকে সবকিছু উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে সবকিছু যাতে বিলীন হয় তারই প্রতীক এই শিবলিঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সালে প্যারিসে হয়ে যাওয়া ধর্মসমূহের ঐতিহাসিক মূল শীর্ষক সম্মেলনে বিশ্ববাসীর সামনে অথর্ববেদের স্কম্ভসুক্তের সাহায্যে তুলে ধরেন যে শিবলিঙ্গ মূলত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক। স্বামী শিবানন্দ বলেন, "এটি শুধু ভুলই নয়, বরং অন্ধ অভিযোগও বটে যে শিবলিঙ্গ পুরুষলিঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী"। তিনি লিঙ্গপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন — "প্রধানাম প্রকৃতির যদাধুর লিঙ্গমুত্তমম গান্ধবর্নরসাহ্নম শব্দ স্পর্শাদি বর্জিতম"।

শিবপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা দুর্গার সঙ্গে যৌনমিলনকালে শিব এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাতে দুর্গার প্রাণনাশের উপক্রম হয়। দুর্গা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে নিজ সুদর্শন চক্র দ্বারা আঘাত করলে উভয়ের সংযুক্ত যৌনাঙ্গ কেটে আসে। ওই সংযুক্ত যৌনাঙ্গের মিলিত সংস্করণের নাম বাণলিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ, যা হিন্দুসমাজের একটি প্রধান পূজ্য বস্তু এবং ওই শিবলিঙ্গের পুজোর জন্য বহু বড়ো বড়ো শিবমন্দির গড়ে উঠেছে। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে হিন্দুসমাজ মহাসমারোহে ওই শিবলিঙ্গ পুজো করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণেশ্বরে শিবের সঙ্গমের অবস্থান প্রদর্শনের জন্য পরপর বারোটি মন্দির রয়েছে। ওই মন্দিরগুলিতে যৌনমিলনকালীন সময়ের বারো প্রকারের প্রমত্তাবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন হাজার হাজার মহিলা দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

এক শাস্ত্রীয় কাহিনিতে পাচ্ছি, দেবতারা সব একত্রে মিলিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য— রাসমেলার পরিদর্শন। কৈলাস থেকে আগত মহাদেব রাসমেলায় পরিদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীকৃষ্ণ কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, যেহেতু সর্বাধিক বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয়েই অবগত। নিরাশ না-হয়ে মহাদেব ছদ্মবেশ ধারণ করে রাসমেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে নৃত্যরত স্বল্পবসনা এক সুন্দরীকে দেখতে পান। সুন্দরী দেখে মহাদেবের লিঙ্গ বিশালাকার ধারণ করল। চতুঃপার্শ্বে ত্রাহি রব — হায়! এ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবার শঙ্কা! অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে দেবদেবীদের সম্মিলিত প্রার্থনায় মহামায়া প্রকট হলেন। মহামায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জোড়া মহাযোনি সৃষ্টি করলেন। মহাদেবের নিয়ন্ত্রণহীন বিশালাকার পুরুষদণ্ডকে ধারণ করে নিবৃত্ত করলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অহেতুক বিনাশ থেকে রক্ষা পেল। সেই থেকে প্রচলন হল যোনিতে প্রোথিত মহাদেবের লিঙ্গপুজো। উল্লেখ্য যে, শিবরাত্রির বিশেষ ক্ষণে শিবলিঙ্গকে স্নান করানো পূর্বক অবিবাহিত তনয়ারা উত্তম পুরুষাঙ্গ-ধারী বীর্যবান প্রাপ্তির আশীর্বাদ লাভ করেন।"

"লিঙ্গ" শব্দটি কোল বা অস্ট্রিক ভাষার। ঋগ্বেদে "লিঙ্গ"-এর প্রতিশব্দ "শিশ্ন"। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের একুশ সুক্ত থেকে জানা যায় — একশ্রেণির মানুষ শিশ্ন-উপাসনা করতেন। এরা শিশ্নদেবাঃ নামে অভিহিত। বলা হয়েছে, এই সম্প্রদায়গণ বেদ-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। তাই তাদের অনার্য রাক্ষসদের সমপর্যায়ের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বৈদিক ঋষিরা। অনেকের মতে — লিঙ্গপুজো প্রচলিত ছিল মহেনজোদারো এবং হরপ্পায়। শিব অনার্য দেবতা, লিঙ্গ বা শিশ্নও। তাই লিঙ্গ বা শিশ্নই যে শিবলিঙ্গটা, তা সবার কাছে গৃহীত। সেকালের ঋষিরাও শিবলিঙ্গের পুজোর নিন্দা করেছেন। কিন্তু পরে বৈদিক আর্যদের বংশধররা এ পুজোকে মেনে নিয়েছিলেন। এ হচ্ছে আর্যসমাজে অনার্যসমাজের প্রভাবের প্রতিফলন। যুগের ক্রমধারায় এই শিব তো বটেই — শিবলিঙ্গও প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা হিসাবে অভিষিক্ত হন। শিবলিঙ্গ দুই ধরনের। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম। মতান্তরে চল আর অচল। মন্দিরে স্থাপিত লিঙ্গ "অচল" আর যেগুলো স্থানান্তরিত হয় সেগুলোকে বলা হয় "চল"। পুরাণে জানা যাচ্ছে, বিষ্ণুর চক্রে সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হলে শোকার্ত শিব ক্ষোভ এবং লজ্জায় প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ ধারণ করে। কিন্তু তা নিছকই প্রতীক, পুরুষ-চিহ্ন নয়। বামনপুরাণেই শিবলিঙ্গ নিয়ে অনেক কাহিনি আছে — এর মধ্যে একটি কাহিনি হল — সতীর দেহত্যাগের পর শিব কামদেবের বাণে কামাসক্ত হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় দারুবনে যান এবং সেখানকার মহর্ষিদের কাছে অভিলাষিত ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এসময় অরুন্ধতি ও অনসূয়া ছাড়া ঋষিপত্নীরা শিবকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন। ক্রুদ্ধ মহর্ষিদের অভিশাপে শিবের লিঙ্গ খসে পড়ে এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ এসে শিবকে তার লিঙ্গ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এ লিঙ্গের পুজো করতে হবে — এই শর্তে রাজি হলেই শিব তা আবার ধারণ করেন।

পুরাণেই উল্লেখিত ভিন্ন একটি গল্প হল — কোনো বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য শিব

সুন্দর পুরুষ সেজে বনমালা পরে উলঙ্গ অবস্থায় বালখিল্য ঋষিদের পাড়ায় আসেন ভিক্ষাছলে। তাকে দেখে কামার্ত ঋষিপত্নিরাও উলঙ্গ হতে চান এবং শিবকে নিয়ে টানাটানি করতে থাকেন। শিব জানান, পুরুষহীন কোনো নির্জন স্থানে গেলে তিনি এই উলঙ্গব্রতের কারণ বলবেন। এ সময় বালখিল্যরা এসে স্ত্রীদের পিটাতে থাকেন। এক পর্যায়ে এক ঋষিপত্নীর স্পর্শে খসে পরে শিবের লিঙ্গ এবং বাড়তে থাকে। শেষপর্যন্ত ব্রহ্মা এবং অন্যদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব জানান, এই লিঙ্গের পুজো করলে জগতের শান্তি হবে। সেই থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রচলিত আছে শিবলিঙ্গের পুজো।

ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে প্রচলিত জনপ্রিয় উপাখ্যানটির সঙ্গে শিবলিঙ্গের অনুসঙ্গ লক্ষ করা যায় — মৃকণ্ডু ঋষি ও তাঁর পত্নী মরুদ্বতী পুত্রকামনায় শিবের আরাধনা করেন। তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা কেমন পুত্র চান — দীর্ঘজীবী মূর্খ পুত্র না ক্ষণজীবী জ্ঞানী পুত্র। মৃকণ্ডু ঋষি বলেন, ক্ষণজীবী জ্ঞানী পুত্রই চান। জন্ম হয় মার্কণ্ডেয়ের। মার্কণ্ডেয়ের আয়ু ছিল মাত্র ষোলো বছরের। সে ছিল শিবের ভক্ত। ষোড়শ বছরে পদার্পণ করার পর যখন তার মৃত্যুকাল আসন্ন, তখন সে একটি শিবলিঙ্গ গড়ে পুজোয় বসে। যম তাকে নিয়ে যেতে এলে সে সেই শিবলিঙ্গ ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে। যম তাঁর রজ্জু দিয়ে মার্কণ্ডেয়কে বন্ধন করলে, মার্কণ্ডেয় শিবলিঙ্গটিকে আঁকড়ে ধরে এবং শিবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। ভক্তবৎসল শিবভক্তের দুর্দশা দেখে শিবলিঙ্গ থেকে আবির্ভূত হন। ক্রুদ্ধ শিব আক্রমণ করেন যমকে। যম পরাভূত হন এবং মার্কণ্ডেয়ের উপর তাঁর দাবি ত্যাগ করে ফিরে যান। শিব যমকে পরাজিত করে মৃত্যুঞ্জয় নামে পরিচিত হন। শিবের বরে মার্কণ্ডেয় অমরত্ব লাভ করেন। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মার্কণ্ডেয়ের রচনা বলে মনে করা হয়। তামিলনাড়ুর তিরুক্কদাভুর মন্দিরে শিবের যমবিজয়ের ধাতুচিত্র রয়েছে। নৃসিংহ পুরাণ গ্রন্থেও একই প্রকার একটি কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই কাহিনি অনুযায়ী, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠের পর বিষ্ণু যমের হাত থেকে মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করেছিলেন।

ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের একটি ধর্মস্থানের কথা জানা যায়। আমরা জানব সেই ধর্মস্থানের পৌরাণিক কাহিনি, পেয়ে যাব আর-একটি লিঙ্গ-কাহিনি। লঙ্কারাজ রাবণ ছিলেন নিষ্ঠাবান শিবের উপাসক। কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে নানা বরের সঙ্গে অতুলনীয় এক জ্যোর্তিময় শিবলিঙ্গ লাভ করেন। মহাদেব রাবণকে লঙ্কায় এই লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আরাধনা করতে আদেশ করেন। তবে তিনি তাঁকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে পথে কোথাও তিনি লিঙ্গটি রাখতে পারবেন না। কোথাও মুহূর্তের জন্য রাখলেও লিঙ্গটি চিরকালের জন্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। রাবণ সাবধানে তাই লঙ্কার পথে এগিয়ে চললেন। দেবতারা দেখলেন লঙ্কায় এই লিঙ্গ নিয়ে গেলে শিব-প্রসাদে রাবণ আরও শক্তিমান ও অত্যাচারী হয়ে উঠবেন। তাই দেবতারা শলা-পরামর্শ করে জলদেবতা বরুণকে পাঠালেন রাবণকে দিগভ্রান্ত করতে। যেই ভাবা সেই কাজ — বরুণ এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন। বরুণ রাবণকে প্ররোচিত দিতে থাকলেন। রাবণের মূত্রত্যাগের ইচ্ছে হল এবং মূত্রত্যাগের জন্য এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ব্রাহ্মণ-বেশী বরুণের কাছে লিঙ্গটি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ধারণ করতে বললেন। বরুণ লিঙ্গটি ধারণ করলে রাবণ সামনে ছুটলেন মূত্রভার লাঘব করতে। মূত্রত্যাগ সম্পন্ন করে রাবণ ফিরে এসে দেখেন ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে যেটি দেখে রাবণ সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাকাতর হয়ে যান, তা হল, লিঙ্গটি সেখানেই স্থাপিত হয়ে আছে। ছুটে গিয়ে লিঙ্গটি সেখান থেকে ওঠানোর চেষ্টা করেও এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলেন না। জ্যোতির্লিঙ্গটি চিরকালের জন্য সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এই স্থানটির নামই দেওঘর বা দেবস্থান। সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য ৩৬টি পুরাণ রচিত হয়েছে। এর ১৮টি মহাপুরাণ এবং ১৮টি উপপুরাণ। মহাপুরাণগুলি হল যথাক্রমে — (১) মার্কণ্ডেয়, (২) মৎস্য, (৩) ভাগবত, (৪) ভবিষ্য, (৫) ব্রহ্মাণ্ড, (৬) ব্রহ্ম, (৭) ব্রহ্মবৈবর্ত, (৮) বায়ু, (৯) বামন, (১০) বরাহ, (১১) বিষ্ণু, (১২) অগ্নি, (১৩) নারদ, (১৪) পদ্ম, (১৫) লিঙ্গ এবং (১৬) গরুড়। অপরদিকে ১৮টি উপপুরাণ হল — (১) সনৎকুমার, (২) নারসিংহ, (৩) শিব, (৪) শিবধর্ম, (৫) আশ্চর্য, (৬) নারদীয়, (৭) কাপিল, (৮) মানব, (৯) ঔশনস, (১০) আদিত্য, (১১) বারুণ, (১২) কালিকা, (১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শাম্ব, (১৫) সেরি, (১৬) পরাশর, (১৭) ভাগবত এবং (১৮) বাশিষ্ঠ।

মহাপুরাণের পঞ্চদশ পুরাণটিই হল লিঙ্গপুরাণ। কীভাবে লিঙ্গপুরাণ শুরু হচ্ছে তা সূত ও নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের কথোপকথনের মাধ্যমে একবার বাংলা তর্জমায় দেখে নিই — ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আদিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী প্রকৃতিপুরুষের নিয়ামক পরমাত্মা শিবকে প্রণাম করি। নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কারপূর্ব্বক জয় অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণাদি গ্রন্থ উচ্চারণ করবে শৈলেশ, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্গস্থিত, হিরণ্যগর্ভ, বারাণসী, মহালয়, রৌদ্র, গোপেক্ষক, শ্রেষ্ঠ পাশুপাত, বিঘ্নেশ্বর, কেদার, গোমায়ূকেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, চন্দ্রনাথ, ঈশান্য, ত্রিবিষ্টপ ও শুক্রেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে যথাবিধি শিবলিঙ্গ পুজো করে মহর্ষি নারদ নৈমিষারণ্যে গমন করলেন। (১-৩) তৎকালে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ নারদকে দেখামাত্র আনন্দিত মনে পুজো করে যথাযোগ্য আসন প্রদান করলেন। তিনিও মুনিবরকর্ত্তৃক পূজিত হয়ে হৃষ্টমনে তাঁদের প্রদত্ত উত্তমাসনে সুখে উপবেশন করে শিবলিঙ্গ মহাত্ম্যা বিষয়কে মনোহর ভাবশালী উপাখ্যান বলতে লাগলেন। ইত্যবসরে সেখানে সর্বপুরাণবেত্তা বুদ্ধিমান সূত স্বয়ং মুনিগণকে প্রণাম করতে উপস্থিত হলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শিষ্যের অভ্যর্থনার জন্য যথাযোগ্য সবিনয় সম্ভাষণ ও পুজো বিধান করলেন। (৪-৭) এরপর তাঁদের পুরাণশ্রবণে ইচ্ছা হলে তপস্বী সমস্ত অতি বিশ্বস্ত বিদ্বান রোমহর্ষণ সূতকে শিবলিঙ্গ-মহাত্ম্যপূর্ণ পবিত্র পুরাণশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করলেন। (৮-৯) হে মহামতে সূত! আপনি পুরাণের জন্য মহর্ষি বেদব্যাসকে উপাসনা করে তাঁর কাছে পুরাণশাস্ত্র অবগত হয়েছেন। হে পৌরাণিকাগ্রগণ্য! সেই জন্য লিঙ্গ-মাহাত্ম্যপূর্ণ স্বর্গীয় পুরাণসংহিতা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ব্রহ্মার পুত্র শ্রীমান মুনিবর নারদ দেবাদিদেব পরমাত্মা মহেশ্বরের

সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে লিঙ্গপুজো করে এই স্থানে উপস্থিত আছেন। আপনি, আমরা ও মহর্ষি নারদ সবাই-ই শিবভক্ত; অতএব আপনি মহর্ষি নারদের কাছে (?)। এমন আপনি যা জেনেছেন, তা সবই সফল হতে পারবে। পৌরাণিকাগ্রগণ্য পূণ্যাত্মা সূতকে এমন বললে, তিনি অগ্রে ব্রহ্মার পুত্র নারদকে অনম্বর, নৈমিষবাসী মুনিগণকে অভিবাদন করে পুরাণ বলতে আরম্ভ করিলেন। (১০-১৬) আমি লিঙ্গপুরাণ বলার জন্য মহাদেবকে নমস্কার করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মুনিবর বেদব্যাসকে স্মরণ করছি। শব্দ-ব্রহ্মা যার শরীর, যিনি সাক্ষাৎ শব্দ-ব্রহ্মের প্রকাশক, বর্ণমালা যাঁর অঙ্গ, তিনি অনেক রূপে স্থিতি করলেও অব্যক্ত স্বরূপ, যিনি অকাব, উকাব ও মকাব স্বরূপ এবং যিনি সূক্ষ্ম, স্থূল, পরাৎপর, ওঙ্কারস্বরূপ, ঋগ যার মুখ, সামগান যার জিহ্বা, যজুর্বেদ যার সুদীর্ঘ গ্রীবাদেশ, অথর্ববেদ যার হৃদয়, যিনি প্রকৃতিপুরষের অতীত, জন্ম-মৃত্যুবর্জিত হলেও তমোগুণযোগে কাল, রুদ্র, রজোগুণযোগে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণযোগে সর্বময় বিষ্ণু নামে বিখ্যাত, যিনি নির্গুণ অবস্থায় পরম ব্রহ্ম মহেশ্বর, যিনি প্রকৃতি, পুরুষ, অহংকার, মন, দর্শেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতরূপে বিরাজমান হলেও স্বয়ং এদের অতীত ষড়বিংশ স্বরূপ, সেই মায়ার কারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-লীলার জন্য লিঙ্গরূপধারী সর্বময় মহেশ্বরকে প্রণাম করে মঙ্গলময় লিঙ্গপুরাণ বলতে আরম্ভ করছি। (১৭-২৩)

মৎস্যপুরাণ, শিবপুরাণ, বামনপুরাণ, বায়ুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণগুলিতে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত জানা যায়, তেমনি লিঙ্গপুরাণেও কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ আছে। মহর্ষি কশ্যপ ও দিতির পুত্র দানব বজ্রাঙ্গ। বজ্রাঙ্গের স্ত্রী বরাঙ্গী। বজ্রাঙ্গ ও বরাঙ্গীর পুত্রের নাম তারক বা তারকাসুর। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তারকাসুর দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। দেবতাদের পরাজিত করে সে স্বর্গলোক অধিকার করে এবং দেবতাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। তাঁর অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ পরিত্রাণের জন্য পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা দেবতাদের অভয় দিয়ে বললেন — শিব ও পার্বতীর যে অপরাজেয় পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি সুরাসরের অবধ্য তারকাসুরকে নিধন করবেন এবং স্বর্গরাজ্য পুনরায় দেবতাদের হবে। যথাকালে তপস্যানিরত শিবকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর পঞ্চাগ্নি তপস্যানিরতা পার্বতীর বিবাহ হয় এবং শিবতেজে পার্বতীর পুত্র কার্ত্তিকেয়র জন্ম হয়। জন্মের পর ছয়জন কৃত্তিকা-মাতৃকা তাঁকে লালন-পালন করেন। শিব ও পার্বতীর অমিততেজা এই পুত্র ছয়মুখে ছয় কৃত্তিকার স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন। ছয় মুখের জন্য তাঁর নাম 'ষড়ানন' বা 'ষন্মুখ'। ছয়জন কৃত্তিকা-ধাত্রীজননীর স্তন্যপান করে বর্ধিত হন বলে তাঁর নাম হয় 'কার্তিকেয়' বা 'কার্তিক'। জন্মের ষষ্ঠ দিন দেবসেনাপতিরূপে তাঁর অভিষেক হয় এবং ব্রহ্মার মানসকন্যা দেবসেনার সঙ্গে বিবাহ হয়। সপ্তম দিন তিনি তারকাসুরকে বধ। পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান স্কন্দপুরাণ প্রত্যক্ষত তাঁরই নাম বহন করছে।

শিবমহাপুরাণে আমরা দুই ধরনের শিবলিঙ্গ দেখতে পাই — একটা শুধু স্তম্ভ আকারে — যেমন অমরনাথ ইত্যাদির শিবলিঙ্গ। আর-একটি যোনির উপর স্থাপিতরূপে, যেরূপে হিন্দু

রমণীগণ জল-দুধ ঢেলে মনোবাঞ্ছা পূরণ করার প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলল — "যাবল্লিঙ্গং স্থিরং নৈব জগতাং ত্রিতয়ে শুভম্। জায়তে ন তদা ক্বাপি সত্যমেতদ্বদাম্যহম্।। (২৫) অর্থাৎ যে পর্যন্ত লিঙ্গ স্থিরভাবে অবলম্বন না করছে, সেই পর্যন্ত ত্রিজগতের কোথায়ও শুভ হবে না, এটা সত্য বলছে।

অমরনাথের শিবলিঙ্গ ঃ অমরনাথ গুহা একটি হিন্দু তীর্থক্ষেত্র, যা ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত। এটি একটি শৈবতীর্থ। এই গুহাটি সমতল থেকে ৩,৮৮৮ মিটার (১২,৭৫৬ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ১৪১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই তীর্থে যেতে পহেলগাঁও শহর অতিক্রম করতে হয়। এই তীর্থক্ষেত্রটি হিন্দুদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হয়। গুহাটি পাহাড় ঘেরা, আর এই পাহাড়গুলো সাদা তুষারে আবৃত থাকে বছরের অনেক মাস ধরে। এমনকি এই গুহার প্রবেশপথও বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই দ্বার প্রবেশের উপযোগী হয়।

গুহার ভিতরে ৪০ মিটার (১৩০ ফুট) ভিতরে গুহার ছাদ থেকে জল ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়ে। এই চুঁইয়ে পড়া জলের ধারা খাড়াভাবে গুহার মেঝেতে পড়ার সময় জমে গিয়ে লিঙ্গাকৃতি ধারণ করে। কখনো-কখনো ৮ ফুট উঁচুও হয় এই শিঙ্গাকৃতি বরফখন্ড বা শিবলিঙ্গ। তবে গত কয়েকবছর ধরেই সময়ের আগেই বরফলিঙ্গ গলে যাচ্ছে, যা হয়তো উষ্ণায়নের ফল। জুন-জুলাই মাসে শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় অমরনাথ যাত্রা। শেষ হয় জুলাই-আগস্ট মাসে গুরু পূর্ণিমার সময় ছড়ি মিছিলে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অমরনাথ যাত্রায় যোগদান করেন। তীর্থ যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্যই এই শিবলিঙ্গে পুজো দেওয়া। অমরনাথে কবে থেকে তীর্থযাত্রা শুরু হয় তা জানা যায় না। একটি তথসুত্র থেকে জানা যায় কিংবদন্তী রাজা আরজরাজা (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সাল) বরফনির্মিত শিবলিঙ্গে পুজো দিতেন। ধারণা করা হয়, রানি সূর্যমতী ১১ শতকে অমরনাথের এই ত্রিশূল, বাণলিঙ্গ ও অন্যান্য পবিত্র জিনিস উপহার দেন। এ ছাড়াও প্রাচীন কিছু পুথি থেকে আরও বেশ কিছু ভিন্ন এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় মধ্যযুগে অমরনাথের কথা মানুষে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতকে তা আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হয়। প্রচলিত আছে, কাশ্মীর একসময় জলে প্লাবিত হয়ে যায় এবং কাশ্যপ মুনি সে জল নদীর মাধ্যমে বের করে দেন। এরপর ভৃগুমুনি অমরনাথ বা শিবের বা শিবলিঙ্গের দেখা পান।

পরিশেষে লিঙ্গকে কেন্দ্র করে একটি ভুল ধারণা ভাঙার চেষ্টা করব। সৌদি আরবে অবস্থিত মক্কা শরিফের হাজরে আসওয়াদ পাথরটি কি শিবলিঙ্গ? হিন্দুদের কেউ কেউ তো এমনই বলেন শুনেছি। সত্যটা কী? মহানবি হজরত মোহম্মদ (সা.) কর্তৃক মক্কা শরিফে স্থাপিত পবিত্র হাজরে আসওয়াদকে (কালোপাথর) লাখ লাখ মুসলমান পাপ থেকে মুক্তি পেতে চুম্বন করে থাকেন। অথচ এই হাজরে আসওয়াদই নাকি শিবলিঙ্গ? এই ধরনের ভিত্তিহীন

যুক্তিহীন বিবৃতি থেকে সকলকেই বিরত থাকা উচিত। এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, যা দিয়ে সেটাকে শিবলিঙ্গ বলা যায়। পবিত্র হাজরে আসওয়াদ মোটেই শিবলিঙ্গের আদলে নয়। পাথর মানেই শিবলিঙ্গ নয়। কোনোভাবেই সেটা শিবলিঙ্গ হতে পারে না। যে হজরত মোহাম্মদ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসীদের যেভাবে সৌদি আরব থেকে উৎখাত করেছিলেন, সেই মোহম্মদ আহ্লাদ করে মক্কায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছেন, এটা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। ইসলামের ইতিহাস এবং হজরতের জীবনী পড়লেই জানা যায় এটা কোনো মতেই শিবলিঙ্গ নয়। ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করা অপরাধ এবং অনৈতিক।

উপসংহারের বিষয় ধর্ষণ। লিঙ্গের সবচেয়ে বড়ো অপচয় এবং জঘন্যতম ব্যবহার হল ধর্ষণ। একশ্রেণির মানসিক বিকারগ্রস্ত পুরুষ নারীদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যেই এই অপকর্মটি করে থাকেন। এইসব যৌন-প্রতিবন্ধী (Sexual Handicapped) পুরুষরা আসলে লিঙ্গ নামক অস্ত্রটিকে ব্যবহার করে নারীদের হত্যা করে। কিছু আগ্রাসী পুরুষও আছে, যাদের মধ্যে জোর করে ভোগ করার প্রবণতা কাজ করে। প্রাচীনকাল থেকে সামাজ্যবাদীরা এলাকা দখল করতে এসে তলোয়ার-বল্লমের পাশাপাশি নিজেদের লিঙ্গটাকে ব্যবহার করতে ভোলেননি। পছন্দ হলে জোর করে মেয়েদের তুলে এনে ফেলে দেওয়া হত হারেমের অন্ধকারে। নারীদের উপর চড়াও হওয়া এবং ধর্ষণ করা ছিল নিত্য আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক কি আজও নেই — অন্যভাবে, অন্য রূপে? আজও সীমান্ত এলাকায় সৈনিকদের বন্দুকের নলের নীচে কত নারী ধর্ষিতা হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে! শুধু সৈনিক কেন, সৈনিক নয় এমন মানুষও তো ধোয়া তুলসীপাতা নয়। এইরূপ পুরুষদের উত্থিত লিঙ্গ কেউ কর্তন করে না কেন? শুধু আইন দিয়ে ধর্ষণ নির্মূল করা যাবে না। ধর্ষণ নির্মূল করতে হলে মেয়েদের সক্রিয়তা বাড়াতে হবে। সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কীভাবে? ধর্ষকের লিঙ্গ কর্তন করে দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। নারীর সম্ভ্রম, নারীর আত্মরক্ষার জন্য এই কর্তন আদালত নিশ্চয় সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন। জয়তুঃ ভব।

নিছক গোরুর রচনা এবং গোমাতা

"গোরু যতদিন দুধ দেয় ততদিনই মা। দুধ দেওয়া বন্ধ করলেই গোরু খেদাও। মাতার মাংস পরিণতির নিমিত্ত মুসলিমদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বলদেরও যতদিন গতর ততদিনই কদর।"

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্রের একটি অংশে স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন, একদা হিন্দুগণ গো-মাংস ভক্ষণ করত। পৈতে অর্থাৎ উপনয়ন অনুষ্ঠানে বৃষ বলি দেওয়ার প্রথাই প্রমাণ করে হিন্দুরা গোমাংস খেত। মনুর যুগে গো-সম্পদ রক্ষার তাগিদে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। তদুপরি, অতিথির একটি প্রতিশব্দ হল গোঘ্ন; কারণ অতীতে কেউ গৃহে এলেই গোহত্যা করে তাকে আপ্যায়ন করতে হত। বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড খুলে দেখুন সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে -"রাম গোমাংস ভক্ষণ করিতেন"। বনগমনের পথে রাম, লক্ষণ ও সীতা ভরদ্বাজ। মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনিবর বৃষ এবং ফলমূল দিয়ে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ ২/৫৪)। পৌরাণিক যুগে গোরুর মাংস খাওয়ার প্রত্যক্ষ এবং বিস্তারিত প্রমাণ রামায়ণের তুলনায় মহাভারতেই অনেক বেশি। বলা হয়েছে — (১) "বশিষ্ট মুনি মদ্য ও গোমাংস প্রভৃতি দিয়া বিশ্বামিত্রকে তাঁহার সেনাগণের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন।" (২) "ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে গোমাংসাদি দিয়া পরিতুষ্ট সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন ও তৎকালে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দশ সহস্র গোভক্ষণ করিয়াছিলেন।" মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে রাজা বিচখ্যু গো-মেধ যজ্ঞে একদিকে অসংখ্য গোরুর আর্তনাদ এবং ছিন্ন দেহ, আর অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন (বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত ১২/২৬৬)। অর্থাৎ, সে সময়ে মাংসের জন্য অসংখ্য গো-হত্যা করা হত, আর ব্রাহ্মণরাও এ কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

মহর্ষি পাণিনি কী বললেন, দেখা যাক — "অতিথি আগমন করলে তাঁহার জন্য গো-হত্যা করবে।" কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত মানবগৃহ্যসূত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "বাড়িতে অতিথি এলে তাকে আপ্যায়ন করতে গোরুর মাংস দিতে হবে এবং গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে অতিথির সঙ্গে আরও চারজন ব্রাহ্মণকে গোমাংস ভোজনে আমন্ত্রণ জানানো।" (পৃঃ ২৮)। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, " I know there are scholars who tell us that cow-sacrifice is mentioned in the Vedas. I... read a sentence in our Sanskrit text-book to the effect that Brahmins of old (period) used to eat beef." (M.K.Gadhi, Hindu Dharma, New Delhi, 1991, p.120). অর্থাৎ, "আমি জানি (কিছু সংখ্যক পণ্ডিত আমাদের বলেছেন) বেদে গো-উৎসর্গ করার কথা উল্লেখ আছে। আমি আমাদের সংস্কৃত বইয়ে এরূপ বাক্য পড়েছি যে, পূর্বে ব্রাহ্মণরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন।" (হিন্দুধর্ম, এম.কে. গান্ধী, নিউ দিল্লি, ১৯৯১, পৃ. ১২০)

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে - Agni is described as "fed on ox and cow" In the Rig Veda (RV: VIII.43.11) অর্থাৎ, "অগ্নি (অবতার) বর্ণনা করলেন, ষাঁড় এবং গোমাংস দিয়ে ভক্ষণ করাতে। (ঋগ্বেদ VIII.43.11) ঋগ্বেদ সংহিতায় "বিবাহসূক্ত"-এ কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতদের গোমাংস পরিবেশনের জন্য একাধিক গোরু বলি দেওয়ার বিধান আছে (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০/৮৫/১৩)। একবার দেখা যাক "বৃহদারণ্যকোপনিষদ" কী বলছে। বলছে — "কোনো ব্যক্তি যদি এমন পুত্র লাভে ইচ্ছুক হন, যে পুত্র হবে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সভাসমিতিতে আদৃত, যার বক্তব্য শ্রুতিসুখকর, যে সর্ববেদে পারদর্শী এবং দীর্ঘায়ু, তবে তিনি যেন বাছুর অথবা বড়ো বৃষের মাংসের সঙ্গে ঘি দিয়ে ভাত রান্না করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আহার করেন" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৬/৪/১৮)। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের সমর্থন পাওয়া যায়। "বশিষ্ঠস্মৃতি"-তে বলা হয়েছে — ব্রাহ্মণ, রাজা, অভ্যাগতদের জন্য বড়ো ষাঁড় কিংবা বড়ো পাঁঠার মাংস রান্না করে আতিথেয়তা করা বিধেয় (বশিষ্ঠস্মৃতি ৪/৮)। মনু অবশ্য কোনো কোনো প্রাণীর মাংস খেতে বারণ করেছেন। বলার বিষয় হল, নিষিদ্ধ মাংসের মধ্যে গোরু পড়ে না। কারণ, যেসব প্রাণী এক খুরবিশিষ্ট তাদের মাংস খাওয়া বিশেষ বিধান ছাড়া বারণ (মনুস্মৃতি ৫/১২)। এই শ্রেণিতে গোরু পড়ে না। অন্যদিকে, যেসব প্রাণীরা শুধু এক পাটি দাঁত আছে তাদের মাংস খাওয়া যেতে পারে (মনুস্মৃতি ৫/১৮)। এখানেই শেষ নয়, মনুস্মৃতি বলছে — অতিথিদের খেতে দেওয়ার জন্য, পোষ্যদের প্রতিপালনের জন্য, অথবা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনে যে-কোনো মাংস বিধিসম্মত (মনুস্মৃতি ৫/২২)।

চাণক্য বা কৌটিল্য কী বলছেন তাঁর "অর্থশাস্ত্র"-এ? জানুন — (১) গোপালকেরা মাংসের জন্য ছাপ দেওয়া গোরুর মাংস কাঁচা অথবা শুকিয়ে বিক্রি করতে পারে

(অর্থশাস্ত্র ২/২৯/১২৯)। (২) মাংসের জন্য ছাপ মারা গোরু ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণির গোরু হত্যা নিষিদ্ধ (অর্থশাস্ত্র ২/২৬/১২২)। (৩) রাজ্যের গবাদি পশুর তত্ত্বাবধায়কের পদে একজন সরকারি কর্মচারি থাকবেন। তিনি গোরুদের ছাপ দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করবেন। যেমন — দুগ্ধবতী গাভী, হালটানা বা গাড়িটানা বলদ, প্রজননের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ষাঁড় এবং মাংসের জোগানের জন্য অন্যান্য গোরুসমূহ (অর্থশাস্ত্র ২/২৯/১২৯)।

গৃহ্যসূত্রগুলির সুরও প্রায় এক। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রগুলিতে গোরু বলি এবং গোমাংস ভক্ষণের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণ, আচার্য, জামাই বা জামাতা, রাজা, স্নাতক, গৃহস্থের প্রিয় অতিথি, অথবা যে-কোনো অতিথির জন্য মধুপর্ক অনুষ্ঠানের বিধান আছে। আর সেইসব অনুষ্ঠানে গোমাংস পরিবেশন করাই ছিল সাধারণ বিধান ও রীতি।

বিভিন্ন পুরাণেও গোরুর মাংস ভক্ষণ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করার স্পষ্ট নির্দেশ এবং প্রশংসা আছে। বিষ্ণুপুরাণে গোরু, শূকর, গন্ডার, ছাগ, ভেড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পশুর মাংস খাইয়ে ব্রাহ্মণদের হবিষ্য করার বিধান দিয়ে সেই সঙ্গে কোনো মাংস ব্রাহ্মণদের ভক্ষণ করালে পিতৃপুরুষেরা কতদিন পরিতৃপ্ত থাকবেন তার একটা পরিসংখ্যানের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলছে, ব্রাহ্মণদের গোমাংস খাইয়ে হবিষ্য করালে পিতৃগণ ১১ মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। আর এ স্থায়িত্বকালই সবচেয়ে দীর্ঘ (বিষ্ণুপুরাণ ৩/১৬)। গোরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ আয়ুর্বেদাচার্য চরক এবং সুশ্রুত। চরক বলছেন — গোমাংস বাত, নাক ফোলা, জ্বর, শুকনো কাশি, অত্যাগ্নি (অতিরিক্ত ক্ষুধা বা গরম), কৃশতা প্রভৃতি অসুখের প্রতিকারে বিশেষ উপকারী (চরকসংহিতা ১/২৭/৭৯)। সুশ্রুতও একই সুরে বলেছেন — গোমাংস পবিত্র এবং ঠান্ডা। হাঁপানি, সর্দিকাশি, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, অতি ক্ষুধা এবং বায়ু বিভ্রাটের নিরাময় করে (সুশ্রুতসংহিতা ১/৪৬/৪৭)। এত গেল অতীতে, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের গোমাংস ভক্ষণ প্রসঙ্গে তথসূত্র সংবলিত আলোচনা। এবার দেখা যাক, যে গোমাংস সমুদয় ব্রাহ্মণ তথা হিন্দুগণের এতো প্রিয়তর খাদ্যবস্তু ছিল, তা কোন জাদুবলে নিষিদ্ধ হয়ে গেল! স্বামী বিবেকানন্দ এই গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণ বন্ধের অর্থনৈতিক কারণের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, "কালক্রমে দেখা গেল যে আমরা যেহেতু কৃষিজীবী জাতি, অতএব সবচেয়ে ভালো ষাঁড়গুলিকে মেরে ফেলা জাতিকে হত্যা করারই সমার্থক। সুতরাং, এই সব প্রথা বন্ধ করা হল এবং গো-হত্যার বিরুদ্ধে একটি মত গড়ে উঠল"। এই আর্থিক কারণের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত কিছু সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণও যুক্ত হয়েছিল। কারণ — (১) ভারত ইতিহাসে প্রাচীন যুগের শেষ ভাগ থেকে মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ-দেশে বৌদ্ধধর্ম এবং অনেক ক্ষেত্রেই জৈনধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধধর্মে এবং জৈনধর্মে সবরকম প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ এবং সর্বজীবে অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ নীতি বলে গণ্য করা হত। এই

বিষয়টি হিন্দুগণের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থাপিত হল, উদয় হল সমূহ হিন্দুদের অস্তিত্বের সংকট। অতঃপর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে হিন্দুসমাজকে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছুর সঙ্গেই আপস করতে হয়েছিল। আর্থিক কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সাংস্কৃতিক কারণও সম্ভবত গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞার শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। এভাবেই গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ বন্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে মিথ্যা ধর্মীয়তার আধারে ঢাকা পড়ে গেল। কালে কালে গোরু হল গোমাতা, তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান এবং মলমূত্র হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পবিত্র উপকরণ। বেড়ে গেল গোরুর গুরুত্ব। মহাভারত রচনার শেষ পর্যায়ে গোরুর একটা অর্থনৈতিক পুনর্মূল্যায়ন আরম্ভ হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাভারতে সংযোজিত অনুশাসন পর্বে সমকালীন অর্থব্যবস্থায় গোরুর বিশেষ গুরুত্বের নিরিখে খাদ্যদ্রব্য হিসাবে তার মূল্যের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ধন বা ক্যাপিটাল হিসাবে অধিকতর মূল্যের স্বীকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সময়ে গোরুর বিশেষ অর্থনৈতিক উপযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ধন হিসাবে এর গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এহেন আর্থিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়ে ধর্মীয় তত্ত্বের আধারে উপস্থাপন করা হল। কারণ স্বর্গ-নরকের লোভ বা ভয় না-দেখালে গোরুর মতো সহজলভ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্যের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

অতীতে, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণেরা গোমাংস ভক্ষণ করত একথা তো তথ্যপ্রমাণ দিয়ে জানানো গেল। তাহলে বর্তমানে কী অবস্থা? হিন্দুরা কি আর গোমাংস ভক্ষণ করেন না? ছবিটা একবার দেখে নেওয়া যাক। এখনও পর্যন্ত ভারতের কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে কয়েকটি রাজ্য বাদ দিয়ে বাইশটি রাজ্যে গোহত্যা বেআইনি। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ একটি (গোরুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ বিল-২০০৩) বিল উপস্থিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিলটির উদ্দেশ্য ছিল গোহত্যা ও গোমাংসের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা, গোমাংস বিক্রি করা, গোরুকে আঘাত করা জামিন অযোগ্য অপরাধ। ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের প্রাক্তন ফ্যাকাল্টি সদস্য অধ্যাপক এন এস রামস্বামী একটি প্রবন্ধে লিখেছেন। গোরুর দুঃখে জর্জরিত হয়ে যদি গোহত্যা বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়, তবে ওই প্রাণীটির দুর্দশা আরও বাড়বে। তা ছাড়া যতক্ষণ সেটি কোনো সম্প্রদায়ের খাদ্য ততক্ষণ নিষিদ্ধ করে দেওয়াটা অমানবিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলা যায়। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় সংকট (?) ছাড়া অন্য কোনো কারণ তো দেখি না, তাই না? গোরু তো আর বিরল প্রজাতি নয়!

গোহত্যা বন্ধ হলেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে গোরুর চালান হতে থাকবে। এখনও পর্যন্ত ভারতে পৌরসভা অনুমোদিত ৩০০০ শ্লটার হাউস আছে। তা সত্ত্বেও মাংস খাওয়ার উপযুক্ত এমন ২ কোটি পশু বেআইনিভাবে হত্যা করা হয় দেশ জুড়ে। গবেষক রামস্বামী বলেছেন, পূজ্যপাদ ও প্রয়োজনীয় বদলগুলি আমাদের দেশে পাচনের আঘাত

হজম করে ৫০ কোটি বার। দেবতাকে এভাবে কোনো ভক্ত মারতে পারে! হিন্দুভক্তগণ বলতে পারেন গোরু যদি মাতাই হয় তাহলে প্রয়োজন ফুরালে বাড়িতে না-রেখে রাস্তায় ছেড়ে দেন কেন? কেন মুসলিম বা দলিতদের কাছে বিক্রি করে দেন যখন সে আর দুধ দিতে পারে না?

আপনি জানেন কি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মাংসের জন্য গোরু ও মোষ মারা হয়েছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষ, এই ভারতে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ। অবিশ্বাস্য মনে হলেও গবাদি পশুর বাজারের শতকরা ৮০ ভাগই হল গোমাংস। ইন্ডিয়ান ভেটেরেনারি কাউন্সিলের হিসাব অনুযায়ী ভারতে মাত্র ৬০ ভাগ গবাদি পশুকে খাওয়ানোর মতো সংগতি আছে। বাকিরা নির্মমভাবে পরিত্যক্ত হয়। তাদের ভবিষ্যৎ অনাহারে মৃত্যু, পথ দুর্ঘটনায় অথবা বিষাক্ত খাবার অথবা খিদের তাড়নায় অখাদ্য খেয়ে মৃত্যু হয়।

ধর্মীয় বিধানে এমন কিছু যজ্ঞ আছে যা করতে হলে পঞ্চগব্য খেয়ে পবিত্র হতে হবে। পঞ্চগব্য কী? পঞ্চগব্য হল গোরুজাত পাঁচটি দ্রব্য — দই, দুধ, ঘি, গোবর এবং গোমূত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বলেন, গোমূত্রের ভিতর নাকি গঙ্গা বসত করে। তার মানে গোমূত্র সেবন করলেই গঙ্গাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত!

ভারতে প্রায় ৫০ কোটি গবাদি পশু আছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি, মোষের সংখ্যা ২ কোটি — সারা পৃথিবীর অর্ধেক। পৃথিবীর সাড়ে আট কোটি গোরু, বাচ্চা বদল, ষাঁড়। বলদের মধ্যে ভারতে আছে শতকরা ১৫ ভাগ। একটি সাক্ষাৎকারে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ডি ডি লাপাং বলেছেন, "মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই গোরুর মাংস খেয়ে থাকে, উত্তর-পূর্ব ভারতের মাথাপিছু আয় এমনিতেই কম। এখানকার মানুষের পক্ষে বিকল্প খাদ্য হিসাবে মুরগি কেনা সম্ভব নয়"। প্রসঙ্গত বলি, মণিপুরের অধিবাসীদের বক্তব্য হল, গোরুর মাংস যে শুধু সস্তা তাই নয়, এখানকার ঠান্ডা আবহাওয়ায় বেশ মানানসই।

কেরল রাজ্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোমাংস ভোজন করে। ২০০৩ সালের একটা হিসাবে দেখতে পাচ্ছি, সেই বছরে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টন গোমাংস শুধুমাত্র কেরলেই বিক্রি হয়েছে। সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানই নাকি ১৩০ টন গোমাংস বিক্রি করেছে। কেরলে গোমাংসের চাহিদা এত বেশি যে প্রতি বছর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে ৫ লক্ষ গোরু আমদানি হয়। কেরল আবার ওই গোহত্যা বেআইনি এমন রাজ্যগুলিতে গোমাংস রপ্তানি করে। তাই অনেকেই মনে করেন, গোহত্যা বন্ধ হলে কেরলের মানুষ ও পশু দুটোরই স্বাস্থ্য বিপন্ন হবে। কারণ গোমাংস হল সবচেয়ে সস্তা মাংস। কেরলের মাংস বিক্রির শতকরা ৪০ ভাগই হল গোমাংস। যদিও সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ গোমাংস খান না — কিন্তু বাকি হিন্দু, মুসলিম, সন্ত, খ্রিস্টানরা গোমাংস খেয়ে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে তপসিল জাতি এবং তপসিল উপজাতির বেশিরভাগ মানুষই গোমাংস খেয়ে থাকেন। পশ্চিমবাংলার করিডর দিয়ে সারা ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ গোরু বাংলাদেশে প্রতিবছর

পাচার হয়। বাংলাদেশের মানুষ সেই গোরুগুলির মাংস তো খানই, উপরন্তু বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করেন।

কোনো এক সময় আর্যগণ গোমাংস ভক্ষণ করতেন। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ শতাব্দী নাগাদ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কারণে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে এই নিষেধাজ্ঞা ধর্মীয় মোড়কের আড়ালে প্রবর্তন করা হয়েছিল যাতে তা কেউ লঙ্ঘন করতে সাহস না পায়। সাধারণ মানুষ জানল গোহত্যা পাপ; তাই গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এতে গোহত্যা নিষিদ্ধ হল বটে, কিন্তু পরবর্তী গণ্ডগোলের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হল। ততদিনে জাতিভেদ প্রথা সমাজে গেঁড়ে বসেছে এবং ব্রাহ্মণকূল জাতিশ্রেষ্ঠ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে সমাজকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে।

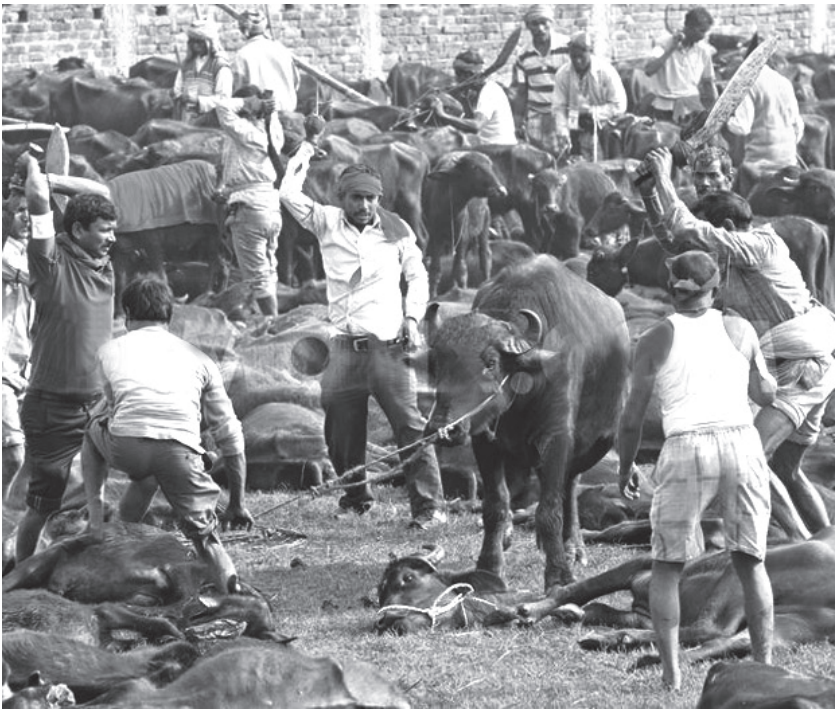

নেপালে গাধীমাই উৎসবে এইভাবেই নির্বিচারে পশু বলি দেওয়া হয়

মুসলিমরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়ে বসল, তখন শুধু শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করেই ক্ষান্ত হল না; বিজিত দেশে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রভাব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করে মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়ে, পুরুষদের হত্যা করে নারীদের বন্দি করে ধর্মান্তর করে

জবরদস্তি বিবাহ করে বংশবিস্তারে মনোযোগী হয়েছিল। সেই সময়ে আমাদের ব্রাহ্মণকুল ধর্মীয় "পবিত্রতা" রক্ষার নামে, নিজেদের জ্ঞান জাহির করার তাগিদে, নিদান হাঁকতে শুরু করলেন, যে বা যারা গোমাংস ভক্ষণ করেছেন (জবরদস্তি করে খাওয়ানো হলেও), বা এমনকি পেঁয়াজ বা রসুনের গন্ধ শুঁকেছেন; তারা সবাই স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন! ব্রাহ্মণকুলের অজ্ঞতার কারণে আক্রমণকারী মুসলিম শাসকদের হাত শক্ত হল; নিমেষে গ্রামকে গ্রাম হিন্দুসম্প্রদায় মুসলিমে পরিণত হয়েছিল। আজ ভারতবর্ষ সহ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান আছেন তাদের প্রায় অনেকেরই অরিজিন হিন্দু! নানা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে রূপান্তরিত।

তবে অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ অতীতে সনাতনধর্মীরা যে গোমাংস ভক্ষণ করত তা নয়, বর্তমানেও হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের রীতি আছে। বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গাধীমাই মন্দিরে পশুবলি দেওয়া হয় এবং ভক্ষণ করা হয়। এই উৎসবে লাখো লাখো গোরু, মহিষ, শূকর, ছাগল, মুরগি, পায়রা এবং এমনকি ইঁদুর প্রাণী বলি দেওয়া হয়। মহিষই বেশি পছন্দ। সত্যি কথা বলতে এইরকম নৃশংস বলি পৃথিবীতে আর কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। বলি না-বলে হত্যালীলা বলা যায়। দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীগুলিকে অতর্কিতে কোপ বসিয়ে গলা নামিয়ে দেওয়া। বলা উচিত কচু-কাটা করা হয়। ২০০৯ সালে প্রায় ২,৫০,০০০ পশু হত্যা করা হয়। ভারত থেকেও প্রচুর গবাদি পশু চলে যায় নেপালে গাধীমাইয়ের সেবার জন্য। এ ঘটনায় সারাবিশ্ব প্রতিবাদে মুখর হচ্ছে। জনমত গঠন করা হচ্ছে। নেপালে বলি বন্ধ হবে কি না জানি না, তবে ভারত থেকে পশু রপ্তানি বন্ধ হবে আশা করি।

তবে বিজ্ঞানভিত্তিক কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে-কোনো রেডমিট ভক্ষণের বিরোধী। গরু তো নয়ই। কারণ — (১) আমিষ ভক্ষণ করলে মৃত পশুর শরীরের নিহিত জীবাণু ভক্ষণকারীর শরীরে প্রবেশ করে; যেমন Mad Cow Disease। (২) একটি গোরুকে খাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে যে পরিমাণ শস্য তাকে খাওয়াতে হয়, তা বেশ কয়েকজন মানুষের খোরাকির সমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্যদেশে গোরু মাঠে ঘাটে চরে খায় না; বরং তাকে রীতিমতো উৎকৃষ্ট মানের খাদ্যশস্য খাইয়ে পুষ্ট করা হয় ভোজে লাগানোর জন্য। কারণ মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম গোমাংসের কারণে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য গোরুকে খাওয়াতে হয়, তা দিয়ে বহুলোকের খাদ্য প্রস্তুত সম্ভব।

নিম্নলিখিত লিঙ্কগুলি দেখুন ঃ

http://news.iskcon.org/meat-eating-the-cause-for-world.../

http://www.vegsoc.org/animals

http://www.opednews.com/.../Feast-or-Famine-Meat-Prod-by...

(৩) বহু গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে নিরামিষ ভোজীগণ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী

হন। তা ছাড়া তাদের মেধা উৎকর্ষ ও ঈর্ষা করার মতো! এটা প্রমাণিত সত্য; কাজেই প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবু প্রমাণ চাইলে ISRO-র বিজ্ঞানীদের নামের তালিকায় চোখ বোলালেই ব্যাপারটি জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। (৪) এমনকি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণে চর্মরোগ অবশ্যম্ভাবী; তা আপনাদের অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন।

হায় হিন্দু! গোরু যতদিন দুধ দেয় ততদিনই মা। দুধ দেওয়া বন্ধ করলেই গোরু খেদাও। মাতার মাংস পরিণতির নিমিত্ত মুসলিমদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বলদেরও যতদিন গতর ততদিনই কদর। ষাঁড় না-হলে বংশবৃদ্ধির ক্রিয়া জারি রাখবে কে? তাই ষাঁড় দু-একটা রেখে বাকিটা ধর্মের নামে উৎসর্গ করা হয়। ওরা হাটেবাজারে তোলা তুলে খায়, আর বেগড়বাই করলে পিটানি খায়, গরম জলের ছ্যাঁকা খায়। হায় রে গোরু, তুই বড়োই নিরীহ প্রাণী। সাপের ফোঁস কিংবা বাঘের মতো হালুমটুকু থাকত — তাহলে হিন্দুও তোমায় গিলতো না, মুসলমানও নয়।

তথ্যসূত্র ঃ (১) মহাকাব্য ও মৌলবাদ — জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) বিষ্ণুপুরাণ, (৩) ফ্রন্টলাইন (২০০৩), (৪) আউটলুক (২০০৩), (৫) সাহারা টাইমস্ (২০০৩), (৬) নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (২০০৩), (৭) ঋগ্বেদ সংহিতা, (৮) বৃহদারণ্যকোপনিষদ, (৯) হিরণ্যকেশী গৃহসূত্র, (১০) আপস্তম্ভ গৃহসূত্র, (১১) পারস্কর গৃহসূত্র, (১২) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, (১৩) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, (১৪) মনুস্মৃতি, (১৫) বশিষ্ঠস্মৃতি, (১৬) চরক সংহিতা, (১৭) সুশ্রুত সংহিতা, (১৮) গরু ও ত্রিশূল — শ্যামল চক্রবর্তী।

সরস্বতী ঃ বাস্তবে এবং অবাস্তবে

"দধীচি একবার এক অপ্সরাকে অবলোকন করে উত্তেজিত হয়ে ধাতুস্খলন করে ফেলেন। সেই ধাতু সরস্বতী নদীতে পতিত হয়, আর অতি যত্নে তা ধারণ করে সরস্বতী একটি শিশুর জন্ম দেন।"

ভৌগোলিক দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যাবে কি সরস্বতী নদী শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল? অনুমান করা যায় যে বৈদিক সরস্বতী (আঞ্চলিক নাম সরসুতী) হরিয়ানার থানেশ্বর অঞ্চলে প্রবাহিত। ঋগ্বেদের অষ্টম অধ্যায়, ৩৬.৩ সূক্ত বলা হয়েছে সপ্তথি সরস্বতী নদীগুলির মাতা (সিন্ধুমাতা) একসঙ্গে দুগ্ধ ও স্রোতস্বিনীদের নিয়ে বিপুল গর্জনে তীব্র স্রোতে প্রভূত জলধারায় স্ফীত হয়ে প্রবাহিত।

ঋগ্বেদে দুই ধরনের সরস্বতীর উল্লেখ আছে। একটি ত্রিলোক্য ব্যাপিনী সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। সরস্ ধাতু তদুত্তরে অস্ত্বর্থে বতু এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে সরস্বতী — এ মত স্বামী নির্মলানন্দের আলোকময়ী বলে সর্বশুক্লা। শংকরনাথ ভট্টাচার্যের মতে সরস + বতী = সরস্বতী অর্থ জ্যোতির্ময়ী। ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদে অনেকবার ইড়া, ভারতী, সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখা যায়। বেদের মন্ত্রগুলো পর্যালোচনায় প্রতীতী জন্মে যে, সরস্বতী মূলত সূর্যাগ্নি। দেবীভাগবতে সরস্বতী জ্যোতিরূপা। ভৃগুপনিষদে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও জলময়ী সরস্বতীর সমীকরণ করা হয়েছে। এই উপনিষদে জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন। 'রামায়ণ' রচয়িতা বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চ হননের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সে সময় জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী তার ললাটে বিদ্যুৎরেখার মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ট তেমনি ঘনিষ্ঠ মরুদ ও অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে। সরস্বতী কখনও ইন্দ্রের পত্নী আবার কখনো শত্রু, কখনো-বা ইন্দ্রের চিকিৎসক। শুক্ল যজুর্বেদে তিনি চিকিৎসক রূপে রুদ্র

অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। সরস্বতীর রোগ নিরাময় শক্তির কথা পরবর্তী সময়েও জনশ্রুতিতে ছিল। কথাসরিৎসাগর-এ সোমদেব (একাদশ শতক) জানিয়েছেন, পাটলিপুত্রের নারীরা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সরস্বতীর ঔষধ ব্যবহার করতেন। নিরুক্তকার যাস্কের মতে, সরস্বতী শব্দের অর্থ যাতে জল আছে। সৃ ধাতু নিস্পন্ন করে সর শব্দের অর্থ জল। অর্থাৎ যাতে জল আছে তাই সরস্বতী। নদী সরস্বতী আর্যভূমির অন্যতম নদীরূপে ঋগ্বেদে বহুবার কীর্তিত ও স্তোত্র হয়েছে। ঋগ্বেদে সরস্বতী সিন্ধু ও তার পাঁচটি উপনদী নিয়ে সপ্তসিন্ধুর বারংবার উল্লেখ আর্যভূমিতে এদের অপরিসীম গুরুত্ব প্রমাণ করে। 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী' — অর্থাৎ নদী হিসাবে সরস্বতীকে। সম্ভবত সরস্বতী নদী তীরেই বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্ভব। তাই হয়তো শিক্ষার সঙ্গে সরস্বতীর অচ্ছেদ্য বন্ধন এবং এর জন্যই পৌরাণিক যুগে সরস্বতী বিদ্যার দেবী হয়ে উঠেছেন। সরস্বতীর আর-এক নাম ভারতী। তিনি ব্রাহ্মণ-এ বাক্ নামে পরিচিতা। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নদী সরস্বতীর এই একাত্মতা সম্পর্কে নানা মত থাকলেও সরস্বতীকে ব্রহ্মার মানসকন্যা হিসাবে কল্পনা করা হয়।

স্কন্দপুরাণে সরস্বতীর উৎস হলেন বিষ্ণুর জিহ্বাতে এবং সরস্বতীর অবস্থান বিষ্ণুর জিভে। নারদপুরাণে বলা হয়েছে চরম অবস্থায় রাধা এবং কৃষ্ণ একই দেহে বিরাজ করেন এবং তাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। এই অবস্থায় রাধা থেকে পাঁচটি রূপ আবির্ভূত হয় তারা হলেন লক্ষ্মী, দুর্গা, সাবিত্রী এবং রাধার নিজেরই আর-একটি রূপ। কারো-কারো মতে শক্তির রূপভেদ পাঁচটি নয় আটটি, যেমন — শ্রীদেবী, ভূদেবী, প্রীতি, কৃতি, শান্তি, তান্তি এবং পুস্তি। বামনপুরাণে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ কোন্দলের গল্প উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠ তার আশ্রমে একটি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এবং সরস্বতীর একটি বিরাট মূর্তির পূজা করতেন। বশিষ্ঠের ওখানে এভাবে পূজা করা বিশ্বামিত্রের মনে ক্রোধ উৎপন্ন করায় তিনি নদী সরস্বতীকে বলেন বশিষ্ঠকে ধরে তার কাছে নিয়ে আসতে যাতে উপযুক্ত সাজাটা তিনি বসে বসেই দিতে পারেন। সরস্বতী বিশ্বামিত্রের ক্ষমতা জানতেন। তাই তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে বশিষ্ঠকে নিয়ে যেই হাজির হলেন অমনি বিশ্বামিত্র তাকে মানে বশিষ্ঠকে হত্যার জন্য একটি অস্ত্র আনতে গেলেন এই সময়ে সরস্বতী যিনি ছিলেন নদী তিনি নিজের জলধারার মাঝে বশিষ্ঠকে লুকিয়ে রাখলেন। বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিয়ে বললেন — সরস্বতী এরপর হবেন রক্তনদী আর যতসব অসুর, রাক্ষস তা পান করে স্ফূর্তি করবে। অবশেষে একদল সাধুর প্রার্থনায় সৃষ্টি হল প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম — আর যত দুরাত্মা সেখানে স্নান করল সবাই পবিত্রাত্মা হয়ে গেল।

হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা তাঁর কন্যার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হন। এহেন বিষয়ে কলকাতার জাদুঘরের একটি প্রস্তর মূর্তি থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। এই মূর্তিটি ব্রহ্মার বামজানুর উপর সরস্বতী বসে আছেন, তাঁর এক হাতে ব্রহ্মার স্কন্ধবেষ্টিত। সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার এই সম্বন্ধের সন্ধান ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। এখানে ব্রহ্মার সঙ্গে

বাক্‌দেবীর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। বাক্‌ই যে সরস্বতী তা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই। ব্রাহ্মণ্য যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর। এখানে দেখা যাচ্ছে "প্রজাপতি ব্রহ্মা পুনরায় নিজেকে আপ্যায়িত করিলেন, বাক্ তাহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বাক্-কে আত্মবশ করিলেন। এখানে তিনি বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত হইলেন বলবান হইলেন"। এইভাবেই বোধহয় আমরা সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রী হিসাবে পাই। বেদের উষাই পরবর্তীতে সরস্বতী রূপে পাই। তাই উষার মতো সরস্বতীও শুভ্র এবং জ্ঞানের প্রতীক। সেই কারণে সরস্বতী একদিকে সূর্যের কন্যা ও অন্যদিকে স্ত্রী।

মহাভারতের শল্যপর্বে উল্লেখ আছে যে দধীচি একবার এক অপ্সরাকে অবলোকন করে উত্তেজিত হয়ে ধাতুস্খলন করে ফেলেন। সেই ধাতু সরস্বতী নদীতে পতিত হয়, আর অতি যত্নে তা ধারণ করে সরস্বতী একটি শিশুর জন্ম দেন। মহাভারতের আদিপর্বেও শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেছিলেন তার পূর্বপুরুষ সরস্বতীর পুত্র ছিলেন বলে বলা হয়েছে — এক্ষেত্রে পিতা ছিলেন এক মুনি।

সরস্বতীর বাহন হাঁস ছাড়াও মেঘ আর বরাহকে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক এন এস ভট্টসারী একটি লেখায় বলেছেন, "একসময় ইন্দ্রের শরীরের শক্তি চলে যাওয়ার ফলে তিনি মেষ আকৃতি গ্রহণ করেন। সেসময় ইন্দ্রের চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল স্বর্গের অশ্বিনীদ্বয়ের উপর এবং সেবা-শুশ্রূষার ভাব ছিল সরস্বতীর হাতে। সংগীত ও নৃত্যপ্রেমী ইন্দ্র সরস্বতীর গানবাজনা ও সেবায় সুস্থ হওয়ার পর তাকে মেষটি দান করেন। সেই থেকেই সরস্বতীর সঙ্গী এই মেষ। তাহলে কি সরস্বতী স্বর্গের সেবাদাসীও। সরস্বতীর বাহন বরাহ (শুয়োর), কারণ তিনি নাকি বিষ্ণুরও স্ত্রী ছিলেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত 'সরস্বতী' গ্রন্থটিতে এ তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকেও স্বামী হিসাবে কামনা করেছিলেন তিনি — "ইয়েষ কৃষ্ণং কামুকী কামরূপিনী"। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ শ্রীকৃষ্ণ-সরস্বতীর কেচ্ছাকাহিনি যথাযথভাবেই বর্ণিত আছে। ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী 'নারী' প্রবন্ধে বলেছেন, সরস্বতী গণেশেরও স্ত্রী। মহারাষ্ট্রের কোনো কোনো পূজারী মনে করেন, গণেশের পত্নী সরস্বতী কিংবা সারদা। হয়তো সরস্বতী এবং গণেশ দুজনই বিদ্যা ও সংগীতের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলেই এই পতি-পত্নির কল্পভিত্তি। আর-এক তথ্য অনুসারে জানা যাচ্ছে, দুর্গার কন্যা এই সরস্বতী দুর্গার কুমারী সত্তা। আবার বাঙালিরা মনে করেন গণেশ ও সরস্বতী ভাইবোন, দুর্গার সন্তান। অথচ চিরকুমারী (!) সরস্বতীকে স্বর্গের দেবতারা কখনও সেবাদাসী, কখনও গণিকা, আবার কখনও অসুরদের রূপে ভুলিয়ে কাত করাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার সৃজন শক্তি। সংস্কৃতে এর মানে (এসেন্স অব দ্য সেলফ) আপন সত্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গুণাবলি। তার চারটি হাত। এক হাতে গোলাপ, এক হাতে বই এ দুটি হল পিছনের হাত। সামনের দু-হাতে তিনি বীণা বাজাচ্ছেন। তার পরিধানে সাদা বস্ত্র, যা শুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। বীণাবাদন জাগতিক কর্ম আর পদ্মধারণ আধ্যাত্মিক জগতের প্রতীক বলে বলা হয়েছে। পদ্ম পরম সত্তার প্রতীক। এর দ্বারা

মনোযোগ, ধ্যান-সমাধি এবং পরম সত্তার সঙ্গে একাত্মতা বোঝায়। হংস বাহন দ্বারা ভালো মন্দের প্রভেদকারী জ্ঞান শক্তি বোঝায়। তার কাছেই একটি ময়ুর থাকলেও তিনি হংসকেই বাহন করেছেন। ময়ুরের মুড আবহাওয়ার সংগে বদলায়। তাই তিনি ময়ুর পছন্দ করেননি বলে বলা হয়েছে।

হিন্দুদের দেবী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছেও পুজো পেয়েছেন। গান্ধারের প্রাপ্ত বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি বা সারনাথে সংরক্ষিত মূর্তিতে এর প্রমাণ মেলে। পাথরের একটি ছোটো মূর্তি আছে তাতে সরস্বতী বীণা বাজাচ্ছেন, এর সঙ্গে হিন্দুদের সরস্বতীর কোনো পার্থক্য নেই। মথুরায় জৈনদের প্রাচীন কীর্তির আবিষ্কৃত নিদর্শনে সরস্বতীর যে মূর্তি পাওয়া গেছে সেখানে দেবী জানু উঁচু করে একটি চৌকো পীঠের উপর বসে আছেন, এক হাতে বই। শ্বেতাম্বরদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর অনুমোদিত ছিল। জৈনদের ২৪ জন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ১৬ জন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অন্যতম হলেন সরস্বতী। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় উভয়েই সরস্বতীকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে গৃহীত একজন প্রধান দেবীরূপে স্থান হয়ে গেল।

শ্রীপঞ্চমীর 'শ্রী' অর্থে লক্ষ্মীকে বোঝায়। অর্থাৎ এই তিথি লক্ষ্মীর। তাই শ্রীপঞ্চমীর পুজো ধনের বা শস্যের বা তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও পুজো। এ জন্যেই দেখা যায় কৃষিজীবী মানুষের কৃষি-উৎপাদনের উপাদানগুলি এই পুজোয় অন্তর্ভুক্ত। তাই সরস্বতী পুজোর অন্যতম উপাদান পঞ্চশস্য (ধান, যব, সাদা সর্ষে, মুগ, মাষকলাই) ও পঞ্চপল্লব (কাঁঠাল-আম-অশ্বত্থ-বট-বকুল)। অনেকে মনে করেন সরস্বতী নামে দেবী কৃষিকর্মের সহায়ক এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেই বেশি যুক্ত। অমর সিংহের সময় পর্যন্ত প্রাচীন কোনো কোশগ্রন্থে 'শ্রী' শব্দের অর্থ 'সরস্বতী' না-থাকলেও মধ্যযুগের আচার্য রেদিনীবর হেমচন্দ্র প্রমুখের অভিধানে সরস্বতী আর-একটি নাম হিসাবে 'শ্রী'-র সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাভারতের এক জায়গায় আছে, নগরে প্রবেশের আগে যুধিষ্ঠির গণিকাদের তাঁর প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ লোক মারফত প্রেরণ করেন। প্রাচীন ভারতে গণিকারাই ছিলেন নারীদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিতা শ্রেণি — যাঁদের চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হতে হত। শুধু তাই নয়, অলংকার, ছন্দ ও কাব্য সম্পর্কেও তাঁদের বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে হত। এই সব জ্ঞান ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে সরস্বতী ধনী নাগরিক ও গণিকাদের দ্বারা যে পূজিতা হতেন, তার উল্লেখ বাৎসায়নের কামসূত্রে পাওয়া যায়।

সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শক্তি জ্যোতিরূপা সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। অন্যভাবে দেখলে, সরস্বতী নদীর তীরে প্রথম যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সেখানেই ঋষিরা লাভ করেন বেদ, সাম-মন্ত্র গীত হয়। সুতরাং সরস্বতী নদী স্থান-মাহাত্ম্য লাভ করে জ্ঞান বা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী হন। সরস্বতী নদীর প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ প্রদানকালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় সরস্বতী হন বিদ্যারূপী — জ্ঞানের

উদ্দীপনকারিণী। সরস্বতী নদী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর কল্পিত দেবীতে স্থানগত, গুণগত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তাঁকে বাক্-এর দেবী করা হয়েছে।

তবে উপপত্নী বা গণিকাদের লক্ষীপুজো থেকে বঞ্চিত করা হলেও সরস্বতী পুজো করতে পারেন। সরস্বতী কেন? সরস্বতী জায়গা কী তবে গণিকালয়ে? তা না-হলে লক্ষ্মী নয় কেন? দক্ষিণ ভারতে যে ময়ূরবাহন সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া গেছে সেটা কৌমারীর সঙ্গে অনেকটা মিলজুল হয়। কৌমারী কার্তিকের পত্নী। তাই বোধহয় গণিকাদের দেবতা কার্তিকের পাশাপাশি সরস্বতীর পুজোও গণিকালয়ে হয়ে থাকে। যুগে যুগে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন উপাসনালয় থেকে গণিকালয় — সর্বত্র পুজো পায় সরস্বতী। সরস্বতী তাঁর কৌমার্য হারিয়েছে বহু পুরুদের বাহুডোরে। নেপালে চতুর্দশ শতকের পাওয়া শিলালিপিতে লেখা আছে — "সারদা তুমি মাতৃরূপী, তুমি কামমূর্তি"। তাই কি স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের উচ্চারণ করতে হয়— ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে"। তিব্বতে এমন অনেক সরস্বতী পাওয়া গেছে যাঁর উর্ধ্বাঙ্গে কোনো বসনই ছিল না। তাই হয়তো মকবুল ফিদা হোসেনের সরস্বতীর পরনে আব্রু নেই। সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ — এরা কেউ কারোর ভাইবোন নয় এটি বাঙালিদের মনগড়া রূপকল্প। ভিত্তি নেই, সমর্থনও নেই।

আদি পুরাণ বলছে, সরস্বতী ব্রহ্মার মুখজাত। মুখজাত-এর অর্থ জ্ঞান। মুখনিঃসৃত কথাই তো বেদ। ফলে ব্রহ্মার মুখজাত সৃষ্টি সরস্বতী জ্ঞানেরই। আবার শিবপুরাণ তো অন্য কথা বলছে। কী বলছে? বলছে — ব্রহ্মা কামপরবশ হয়ে সরস্বতীর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। ছেলেদের বাধায় ব্রহ্মা দেহত্যাগ করেছিলেন। এখানেই আছে ব্রহ্মার এই কুপ্রস্তাবে সরস্বতী ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন। ফলে তার একটি মাথা খসে পড়ে। সেই থেকে ব্রহ্মা চতুরানন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও সরস্বতী বিষ্ণুর মুখজাত, কিন্তু ব্রহ্মার স্ত্রী। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে গোলকে পাঠাচ্ছেন। প্রকৃতির অংশরূপী ভারতীকে সেখানে মানে গোলকে দেখতে পাবেন এবং তাকে দেখার পর তার সঙ্গে যৌনমিলনে ব্যস্ত হবেন। এও আছে ব্রহ্মা ভারতীর সঙ্গে রতিক্রিয়া করেছেন স্থানে স্থানে নির্জনে নির্জনে। যিনি ভারতী, তিনিই সরস্বতী।

শুধু বৈদিক যুগে নয় — পরবর্তীকালে মহাভারত, পুরাণ, কাব্যে পূতসলিলা সরস্বতীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল হিমালয়ের সিমুর পর্বতে, এখান থেকে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আদবদ্রী নামক স্থানে সমভূমিতে অবতরণ করেছিল। যে প্রস্রবন থেকে এই নদীর উৎপত্তি তা ছিল প্লক্ষাবৃক্ষের নিকটে, তাই একে বলা হত প্লক্ষাবতরণ। এটি হিন্দুদের তীর্থস্থান। ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা-যমুনা ছিল অপ্রধান নদী, পক্ষান্তরে সরস্বতী নদী ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রযোজনীয়। এর তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থান দেবনির্মিত স্থান হিসাবে বিবেচ্য হত। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে উল্লেখিত সারস্বত যজ্ঞ এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হত। মহাভারত রচনা

হওয়ার আগেই রাজপুতনার মরূভূমিতে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেলেও কয়েকটি স্রোতধারা অবশিষ্ট ছিল। এই স্রোতধারা হল চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ। রাজস্থানের মরূভূমির বালির মধ্যে চলুর গ্রামের নিকটে সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে ভবানীপুরে দৃশ্য হয়। আবার বলিচ্ছপুর নামক স্থানে অদৃশ্য হয়ে বরখের নামক স্থানে দৃশ্য হয়। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্লক্ষপ্রস্রবণ ও বিনাশস্থল হিসাবে বিনশনের নামোল্লেখ আছে। ভারতের বর্তমান উদয়পুর, মেওয়াড় ও রাজপুতনার পশ্চিম প্রান্তে মরূ অঞ্চলে সিরসা অতিক্রম করে ভুটানের মরূভূমিতে সরস্বতীর বিলোপ স্থানই বিনশন। লাট্যায়ণের শ্রৌতসূত্র মতে, "সরস্বতী নামক নদী পশ্চিম মুখে প্রবাহিত, তার প্রথম ও শেষভাগ সকলের প্রত্যক্ষ গোচর, মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন হয়ে প্রবাহিত, যে অংশ কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়"। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও দ্বারকার কাছে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়ে আছে। সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষভাগে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, খ্রিস্টের দেড় হাজার বছরের আগে। মহাভারতে আছে যে নিষাদদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য বিনাশন নামক স্থানে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়েছে। নদীর স্থানীয় নামই এই ঐতিহ্য বহন করছে। অনেকেই বলেন, সিন্ধুনদই সরস্বতী। সরস্বতী ও সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী।

সরস্বতী পূজা হিন্দু বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবী সরস্বতী আরাধনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠেয় একটি অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব। পুরোহিত দর্পণ (শাস্ত্রীয় বিধান?) অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয়। তিথিটি শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী নামেও পরিচিত। উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, নেপাল ও বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপঞ্চমীর দিন খুব সকালে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের গৃহ ও সর্বজনীন পূজামণ্ডপে দেবী সরস্বতী পূজা করা হয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারে এই দিন শিশুদের হাতেখড়ি, ব্রাহ্মণভোজন ও পিতৃতর্পণের প্রথাও প্রচলিত। পূজার দিন সন্ধ্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সর্বজনীন পূজামণ্ডপগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। পূজার পরের দিনটি শীতলষষ্ঠী নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো হিন্দু পরিবারে সরস্বতী পূজার পরদিন অরন্ধন পালনের প্রথা আছে। নদী সরস্বতী বৈদিক সাহিত্য থেকে পুরোপুরি বাগ্‌দেবী হয়ে দাঁড়ান ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। সরস্বতী বৈদিক দেবী হলেও সরস্বতী পূজা বর্তমান রূপটি আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। তবে প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী-সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির উপর তালপাতার তাড়ি ও দোয়াতকলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ছাত্রেরা বাড়িতে বাংলা বা সংস্কৃত গ্রন্থ, শ্লেট, দোয়াত ও কলমে সরস্বতী পূজা করত। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা হওয়ায় সরস্বতী পূজার দিন ইংরেজি বইয়ের পূজা নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই

প্রথা বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। শহরে ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই সরস্বতীর প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করতেন। বর্ধমান মহারাজার পূজায় বিশেষ সমারোহের আয়োজন করা হয়। দূর-দুরান্ত থেকে মানুষ এই পূজার বিসর্জন দেখতে আসত। পূজা উপলক্ষ্যে দুই ঘণ্টা আতসবাজিও পোড়ানো হত। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সরস্বতী দেবী হলেও মেয়েরা অঞ্জলি দিতে পারত না। কিছু পণ্ডিতের মতে সমাজপতিরা ভয় পেতেন হয়তো এই সুযোগে ধর্মের নামে মেয়েরা দাবি করে বসেন লেখাপড়ার স্বাধীনতা।

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা যায়। সরস্বতী পূজা সাধারণ পূজার নিয়মানুসারেই হয়। তবে এই পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপাচার বা সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যেমন অভ্র-আবীর, আমের মুকুল, দোয়াত-কলম ও যবের শিষ। পূজার জন্য বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলও প্রয়োজন হয়। লোকাচার অনুসারে, ছাত্রছাত্রীরা পূজার পূর্বে কুল ভক্ষণ করেন না। পূজার দিন কিছু লেখাও নিষিদ্ধ। যথাবিহিত পূজার পর লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনী-মস্যাধার (দোয়াত-কলম), পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করার প্রথা করার প্রথা প্রচলিত আছে। পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রথাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের দল বেঁধে অঞ্জলি দিতে দেখা যায়।

কেউ কেউ বলেন, মর্ত্য ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে প্রথম বারের মতো শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবী পূজার প্রচলন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশবকাল থেকেই সরস্বতী পূজা প্রচলন করে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষার্থীদের সরস্বতী পূজার গুরুত্ববহ বিদ্যার্জন ও বিদ্যালয় সমূহে সরস্বতী পূজার প্রচলন করে গেছেন, যা এখনও পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত রয়েছে। সরস্বতী পূজা স্বর্গমর্ত্যে, উভয়লোকে দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, ঋষি, মহর্ষি, রাজা-প্রজা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে করে আসছে। সরস্বতী পূজার অঞ্জলী দেওয়ার সময় পলাশ ফুলের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণই প্রচলন করেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন ৭ বছর।

নদী সরস্বতী মহিমা ভারতবাসীর মনে এত রেখাপাত করেছিল যে পরবর্তীকালে গঙ্গা সরস্বতী স্থান দখল করলেও তারা তাকে ভুলতে পারেনি। প্রয়োগে অন্তঃসলিলারূপে গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম, পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গার স্রোত ধারর থেকে সরস্বতীর মুক্তি হিন্দুদের প্রিয় ও পবিত্র বিশ্বাস। সরস্বতী নিয়ে নানা ব্যাখ্যা নানা বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে। তাই সঠিক সিদ্ধান্তে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা, তবে অসম্ভব নয়।

উপসংহারে বলতে চাই, সরস্বতী মূলত হিন্দুদের দেবী। হিন্দুদের উপাস্য। খ্রিস্টান, মুসলমান, শিখ এবং অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের দেবী নয়। তাই সেক্ষেত্রে স্কুল-কলেজে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা শুধু অশোভনীয়ই নয়, অন্যায়। ভারতবর্ষ কোনো হিন্দু রাষ্ট্র নয়, এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় স্কুল-কলেজগুলিতে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরাই পাঠ নেন না, পাঠ নেয় সব ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা। অন্য ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন ধর্মের বন্দনা চাপিয়ে দেওয়া অসাংবিধানিক। যদি জোর করে সরস্বতী-বন্দনা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা হবে সাংবিধানিক অধিকার হরণের সামিল। সরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পুজোর কোনে নিয়ম নেই, তবু বিদ্যার দেবী হিসাবে সরস্বতী স্কুল, পাঠশালা কিংবা কলেজে পুজো পেয়ে থাকে। হিন্দু ধ্বজাধারী কোনো স্কুল-কলেজে পুজো-পার্বণ হতেই পারে, তাই বলে সর্বসাধারণের স্কুল-কলেজগুলিতে এই পুজো কতটা প্রাসঙ্গিক, প্রশ্ন উঠতে পারে। ভেবে দেখতে বলি সবাইকে।

মনু, মনুসংহিতা এবং হিন্দুবাদের ভারতবর্ষ

"দৃশ্যমান হিন্দুদের তথাকথিত উদারনৈতিকতা তাদের সমাজের সত্যিকারের পরিচয় নয়। এই উদারনৈতিকতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে আর্যসমাজের সত্যিকার রূপ। অর্থাৎ যোগফল মনুসংহিতা মানেই ব্রাহ্মণ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ মানেই মনুসংহিতা, মনুসংহিতা মানে হিন্দুবাদ।"

ঋগ্বেদে মনুকে মানবজাতির পিতা বলা হয়েছে। তিনি আদিত্য বিবস্বতের পুত্র বলে বিবস্বান, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার পুত্র বলে স্বায়ম্ভুব মনু, যাস্কের নিরুক্তে মনু দ্যুস্থানীয় দেবতা, তৈত্তিরীয় সংহিতায় মনু এক পরিবারের পিতা, শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে সুপ্রসিদ্ধ মনুমৎস্যকথা অংশে তিনি মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানবজাতির পিতা, তাই তিনি নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রবর্তক — মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যজ্ঞানুষ্ঠানের সৃষ্টিকর্তা, শাসক ব্যবহার বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তি, মহর্ষি, বেদবিদ্যায় বিদ্বান, পৃথিবীর উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ তিনি জানেন।

পুরাণ মত অনুযায়ী মনু ব্রহ্মার দেহ থেকে তৈরি হয়েছেন। সুতরাং, পৃথিবীতে ভগবান ব্রহ্মার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন মনু। যাকে স্বায়ম্ভুব মনু বলা হয়। তবে জানা গেছে ব্রহ্মার ইচ্ছায় ১৪ জন মনু [স্বায়ম্ভুব (ব্রহ্মা ও গায়ত্রী থেকে সম্ভূত), স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত বা সত্যব্রত, সাবর্ণি, রোচ্য, ভৌত, মেরূ সাবর্ণি, ঋভু, ঋতুধামা, বিবস্ব] জন্ম নিয়েছেন এবং এদের সবাই ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছেন। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করা শিখে তা তার শিষ্যদের তা পাঠ করান। পরবর্তীতে ভৃগু নামে একজন মনুর আদেশে এই ধর্মশাস্ত্র ঋষিদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। যা এখন 'মনুসংহিতা' নামে পরিচিত। বলা হয় বেদের পরেই মনুসংহিতা সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর দেখানো পথ অনুসরণ করে বাকি ১৪ জন মনু এই শাস্ত্র ধারণ ও পরিবর্ধন করেছেন। মূলত 'ভগবান ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু' এর বর্ণিত শ্লোকগুলিই বাকি মনুরা সম্পাদনা ও টীকা বা ব্যাখ্যা

যোগ করেছেন এবং কিছু কিছু আইন ও আচরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। এরকমই একটা পরিচয় অনেকেই বিশ্বাস করেন।

এখন প্রশ্ন হল মনু কি সত্যিই 'ভগবান' ছিলেন? আমরা এ লেখার পরতে পরতে দেখতে চেষ্টা করব মনু কেমন ভগবান ছিলেন। মনুসংহিতার পাতাতেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারি। উত্তর সেখানেই লুকিয়ে আছে। বস্তুত মনু ছিলেন একজন শাসক বা রাজা, ব্রাহ্মণ-শাসক — ভগবান কখনোই নয়। ভগবান যে নয়, তার প্রমাণ মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিন জায়গায় তিন রকম বর্ণনা করেছেন। পড়ুন — (১) মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে উনিশতম শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্বে বলছেন, আদিতে এই বিশ্ব অন্ধকারময় ছিল, তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না, কোনো কিছুরই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছিল না, প্রমাণগ্রাহ্য ছিল না। সব কিছু ছিল অবিজ্ঞেয়। যেন সবদিকে প্রসুপ্ত, তারপর অপ্রতিরোধ্য শক্তিসম্পন্ন অন্ধকারনাশক ভগবান স্বয়ংভূ স্বয়ং অব্যক্ত থেকে পঞ্চমহাভূতাদি সকল পদার্থকে ব্যক্ত করলেন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম সনাতন, সর্বভূতময়, অচিন্তনীয় তিনি নিজেই উদ্ভূত হলেন। তিনি নিজের শরীর থেকে বিবিধ জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে ভেবে ভেবে প্রথমে জল সৃষ্টি করে তাতে তাঁর বীজ আরোপিত করলেন। সেই বীজ সূর্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট স্বর্ণডিম্বে পরিণত হল। তাতে সমগ্র জগতের পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম বাস ছিল জলে, জলকে যেহেতু নারা বলে অভিহিত করা হত, সেইহেতু তাঁকে বলা হত নারায়ণ (নারা+অয়ন বা আশ্রয়)। সেই-ই প্রথম কারণ, যা অব্যক্ত এবং যা সৎও বটে, অসৎও বটে। তার থেকে উদ্ভূত পুরুষকেই লোকে ব্রহ্মা বলে। সেই অণ্ড বা ডিম্বে ভগবান এক বছর বসবাস করে তাকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন, সেই দুই ভাগ থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন স্বর্গ এবং মর্ত্য। তাদের মাঝখানে অন্তরিক্ষ, আট দিক্ এবং সমুদ্র [আধুনিক ভূতত্ত্ববিদদের মতে একদা পৃথিবী দু-ভাগে বিভক্ত ছিল — (১) সমুদ্র বা জলভাগ, যা "প্যানথালাসা" নামে চিহ্নিত এবং (২) স্থলভাগ, যা "প্যানজিয়া" নামে চিহ্নিত]। নিজের থেকেই তিনি মন উদ্ধৃত করলেন — তা সৎ বটে, অসৎও বটে। মন থেকে উদ্ভূত হল অহংকার এবং মহদাত্মা, সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক সবকিছু, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম উপাদান নিজের অংশের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি সমস্ত জীব সৃষ্টি করলেন। পঞ্চমহাভূত সকল জীবের স্রষ্টার মধ্যে প্রবিষ্ট হন। (২) মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে বত্রিশতম থেকে একচল্লিশতম শ্লোকে মনু বলছেন, ব্রহ্মা স্বদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন — একভাগ হল পুরুষ, অপরভাগ নারী। সেই নারীর থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন বিরাজ্। এই বিরাজ্ তপস্যা করণান্তর একটি পুরুষ সৃষ্টি করলেন; এই পুরুষই 'মনুসংহিতা'-র প্রবক্তা মনু। জীবসিসৃক্ষু মনু প্রথমে সৃষ্টি করলেন প্রজাপতি স্বরূপ দশজন মহামুনিকে। তাঁরা সৃষ্টি করলেন সপ্তমনু, বিভিন্ন শেণির দেবগণ, মহান ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প, বিহঙ্গ, বিভিন্ন শ্রেণির পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, মেঘ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নক্ষত্ররাজি, বানর, মৎস্য, গোমহিষাদি, হরিণ, মানুষ, কীট, মক্ষিকা ও স্থাবর বৃক্ষাদি। (৩) মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে চুয়াত্তরতম

থেকে আটাত্তরতম শ্লোকে মনু বলছেন, সুপ্তোত্থিত ব্রহ্মা তাঁর মন সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার সিসৃক্ষার প্রেরণায় উদ্ভূত হল শব্দগুণ আকাশ, আকাশের বিকৃতি থেকে সৃষ্ট হল স্পর্শগুণ বায়ু, বায়ু থেকে উদ্ভব দীপ্তিময় আলোকের, যার থেকে প্রাদুর্ভাব হল জলের, জল থেকে উৎপত্তি হল গন্ধযুক্ত ক্ষিতি বা মাটির।

সে যাই-ই হোক, প্রভূত স্ববিরোধিতা থাকলেও বলা যায় মনুই হলেন (সম্ভবত) ভারতবর্ষের প্রথম সুশৃঙ্খল এবং বিচক্ষণ প্রজাপালক বা শাসক, যিনি সুসংগঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রের স্রষ্টা বা জনকও। রাষ্ট্র-পরিচালনার লক্ষ্যে ভারতবর্ষের প্রথম সংবিধানটি ইনিই প্রণয়ন করেছেন, যা 'মনুসংহিতা' নামে পরিচিত। 'মনুসংহিতা' বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মনুবাবু খুব উঁচুতে রেখেছেন ক্ষত্রিয় বা শাসক বা রাজাকে এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণদের। সবচেয়ে নীচে রেখেছেন শূদ্র এবং নারীদের। ক্ষত্রিয় বা শাসক বা রাজাকে এবং ব্রাহ্মণদের উঁচুতে রাখার কারণ তিনি একাধারে ব্রাহ্মণ ও রাজা। শূদ্র এবং নারীদের নীচে রাখার কারণ শূদ্ররা ভারতবর্ষের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী এবং নারীদের শক্তি উনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন নারী অপ্রতিরোধ্য, দুর্দমনীয়, বিধ্বংসী। শূদ্র ও নারীদের মধ্যে অনুশাসনের ভীতি সঞ্চার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই ছিল শাসক তথা আইন-প্রণেতার উদ্দেশ্য। সেটাই স্বাভাবিক। প্রজাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে রাষ্ট্র পরিচালনা করাই রাষ্ট্রপ্রধান মনুর কৌশল। সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকগণ দেশের আইন মানতে বাধ্য, ঠিক তেমনই মনুর যুগেও 'মনুসংহিতা' নামক অনুশাসন বা আইন মানা বাধ্যতামূলক ছিল। অমান্য করলে হাত কেটে নেওয়া, পা কেটে নেওয়া, চোখ উপড়ে নেওয়া, শূলে চড়িয়ে হত্যা করা, হিংস্র পশুকে দিয়ে খাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি পুরস্কার জুটত কপালে। বিদ্রোহ? এখনও হয়, তখনও হত। বিদ্রোহ দমনও হত অকথ্য পীড়ন দ্বারা। কেমন ছিল মনুর সংবিধান? এই সংবিধান যাতে সকলে অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেন সেজন্য অনুশাসন যাঁরা প্রয়োগ করবেন তাঁরা কে সে বিষয়ে মনু নিপুণ হস্তে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে আসি ব্রাহ্মণদের কথায়। কারণ মনু প্রথমে ব্রহ্মণ, পরে রাজা। ব্রাহ্মণ কে সে বিষয়ে মনু কী জানিয়েছেন আমরা দেখব। মনুসংহিতার কাঠামো দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণকে প্রকৃতপক্ষে দেবতার আসনে বসিয়ে একটি স্থায়ী বৈষম্যপূর্ণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। প্রতিটি বিধানের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রাহ্মণ। তাঁর স্বার্থকে রক্ষা, সংহত এবং নিরঙ্কুশ করাই হচ্ছে মনুর একমাত্র উদ্দেশ্য। এর জন্য যত ধরনের নিষ্ঠুরতা দরকার মনু তা অনায়সেই করেছেন। শুরু করেছেন চারবর্ণের অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য জন্ম কাহিনি দিয়ে। মনু বলছেন — (১) "উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যেষ্ঠাদব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।/ সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ" (১/৯৩) অর্থাৎ, ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ বা মুখ থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বলে এবং বেদ ধারণের কারণে ধর্মত ব্রাহ্মণ এই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু। (২) "ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ/ বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।।" (১/৯৬) অর্থাৎ, সৃষ্ট (স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে) প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। (৩) "উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য

মূর্তিধর্মস্য শাশ্বতী।/ স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।" (১/৯৮) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের দেহই সনাতন মূর্তি। তিনি ধর্মের জন্য জাত এবং মোক্ষলাভের যোগ্য পাত্র। (৪) "ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।/ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।।" (১/৯৯) অর্থাৎ, জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভু হন। (৫) "স্বর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিৎজ্জগতীগতম।/ শ্রৈষ্ঠোনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোইর্হতি।।" (১/১০০) অর্থাৎ, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেই সব ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হেতু ব্রাহ্মণ এই সবই পাওয়ার যোগ্য। (৬) "স্বমেব ব্রাহ্মণ্যে ভুঙতে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ। / আনৃশংস্যাদব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ।।" (১/১০১) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নিজের অন্নই ভক্ষণ করেন, নিজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্য দান করেন। অন্য লোকেরা যা ভোগ করে, তা ব্রাহ্মণের দয়া হেতু করে।

কী বুঝলেন বন্ধু? ব্রাহ্মণদের আসন পাকা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আসুন, এবার দেখব মনুর মতে রাজা কে? রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা কেমন সেটাও দেখে নিতে পারি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যাঁরা ছাত্র তাঁরা জানেন রাষ্ট্রর উৎপত্তির বিষয়ে ঐশ্বরিক মতবাদ। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না বোধকরি। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক মতবাদ বহুল প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টাইন, সেন্ট পল, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের লেখনীতে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে এই মতবাদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে। ঐশ্বরিক মতবাদের মূল বক্তব্য ছিল — (১) রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির পিছনে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। (২) রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা রাজার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। সেইজন্য রাজার আদেশ বা নির্দেশ, যা আইনরূপে গণ্য হয়ে থাকে, তা মান্য করা সকল মানুষের একান্ত কর্তব্য। রাজার আইন মান্য না-করার অর্থ হল ঈশ্বরকে অবমাননা করা। (৩) ঈশ্বরের বিধান অনুসারে রাজপদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায়। রাজার মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হবেন। (৪) রাজা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেইহেতু তিনি কখনোই অন্যায় করতে পারেন না। ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কাছে কারও কাছে তাঁর কাজের জন্য জবাব দিতে বাধ্য নন। (৫) ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই রাজার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ করা যায় না। এই ধারণা বা তত্ত্ব শুধু ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মেই নয় — এই তত্ত্ব মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সব ধর্মেই প্রচার করা হয়েছে। যেহেতু আমি এই রচনায় শুধুমাত্র মনু এবং মনুসংহিতা নিয়ে আলোচনা করব সেইহেতু অন্য ধর্মের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। মনু বলছেন রাজা কে? রাজশূন্য এই জগতকে রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের — এই দেবতার সারভূত অংশ নিয়ে পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু এই শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশ থেকে রাজার সৃষ্টি হয়েছিল সেইজন্য তিনি সকল জীবকে তেজে অভিভূত করেন। (অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।/ রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ।।/ ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।/

চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ।।/ যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ।/ তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা"।। (মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, শ্লোক ৩-৪-৫) রাজা কী? মনু বলছেন — (১) তিনি সূর্যের মতো চোখ ও মন সন্তপ্ত করেন। পৃথিবীতে কেউ তাঁকে মুখোমুখি অবলোকন করতে পারে না। (২) বালক হলেও রাজাকে মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ইনি মানুষের রূপে মহান দেবতা। (৩) অতি নিকটে গেলে আগুন একমাত্র সেটাই দগ্ধ করে, কিন্তু রাজারূপ আগুন বংশ-পশু-সম্পত্তি সহ দগ্ধ করে। (৪) রাজার অনুগ্রহে বিশাল সম্পত্তি লাভ হয়, যাঁর বীরত্বে জয়লাভ হয়, যাঁর ক্রোধে মৃত্যু বাস করে, তিনি প্রকৃতই সর্বতেজোময়। ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার নিষ্কন্টক সিংহাসনও পাক্কা। কারণ মনু শাসক তথা রাজাও ছিলেন। তদুপরি নিজেই যেহেতু ব্রাহ্মণ, তাই ব্রাহ্মণদের প্রতি রাজাদের কী করণীয় কর্তব্য সেটা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। বিশেষ করে দানকর্ম। যেমন — (১) অব্রাহ্মণকে দান সমফল, ব্রাহ্মণব্রুবকে (যিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণের আচার-আচরণ পালন করেন না এবং নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে শ্লাঘা করেন, তিনিই ব্রাহ্মণব্রুব) দানে দ্বিগুণ ফল, যে বেদাধ্যয়ন শুরু করেছে তাঁকে দানের ফল লক্ষগুণ, বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে দানের ফল অনন্ত। (২) যুদ্ধে পরান্মুখ না হওয়া, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণ শুশ্রূষা রাজাদের যারপরনাই শ্রেষ্ঠ কাজ।

তাহলে এবার হাতে রইল নারী এবং শূদ্র। পৃথিবীর সব সুখ নিজেরাই (রাজা এবং ব্রাহ্মণ্য) যাতে ভোগ করতে পারেন তার জন্য যা যা করা উচিত সবই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ যেমন পালকের ভূমিকায়, তেমনিই নারী এবং শূদ্র শোষিতের ভূমিকায়। যাতে নারী এবং শূদ্রেরা মাথা-চোখ তুলে দাঁড়াতে না-পারে, বিদ্রোহ করতে না-পারে সেইসব ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিলেন। অল্পকিছু নমুনা আমরা দেখে নিতে পারি। প্রথমেই নারীকে দেখে নেব মনুর চোখে। মনুর চোখে নারীগণ মানুষ পদবাচ্য নন। নারী সম্পর্কে মনুর বিধান কঠোর ও বৈষম্যমূলক। যেমন — (ক) স্ত্রীলোক পতিসেবা করবে। তাঁর স্বাধীন কোনো সত্তা নেই। (খ) নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে। (গ) স্ত্রীলোকের পৃথক কোনো যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস বিধান নেই। (ঘ) স্ত্রীলোকের সাক্ষী হওয়ার বা স্বাধীনভাবে ঋণ করার অধিকার নেই। (ঙ) বিধবা সাধ্বী নারী ব্রহ্মচর্য পালন করবে। পড়ুন — (১) স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা অপরাধ করলে সূক্ষ্ম দড়ির দ্বারা কিংবা বেতের দ্বারা শাসনের জন্য প্রহার করবে। — "ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ প্রেষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।/ প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুদলেন বা।।" (৮/২৯৯)। (২) স্ত্রীলোক, পুত্র ও দাস — এরা তিনজনই ধনহীন; এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে তা তাদের যে মালিক তারই হয়। — "ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।/ যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্।।" (৮/৪১৬) (৩) বেশি নিদ্রা যাওয়া, কেবল বসে থাকার ইচ্ছা, শরীরকে অলংকৃত করা, কাম অর্থাৎ পুরুষকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, নীচ হৃদয়তা, অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কুচর্মা অর্থাৎ নীচ পুরুষকে

ভজনা করা — স্ত্রীলোকদের এই সব স্বভাব মনু এদের সৃষ্টিকালেই করে গিয়েছে। — "শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।/ দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।।" (৯/১৭)। (৪) টাকাকড়ি ঠিকমতো হিসাব করে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালী শুদ্ধ রাখা, ধর্ম-কর্ম সমূহের আয়োজন করা, অন্নপাক করা এবং শয্যাসনাদির তত্ত্বাবধান করা—এই সব কাজে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করে অন্যমনস্ক রাখবে। — "অর্থস্য সংগ্রেহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।/শৌচে ধর্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে।।" (৯/১১)।

এরকম সংখ্যক উদাহরণ দেওয়া যায়। দিলে রচনাটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে। যাঁরা আরও বেশি জানতে কৌতূহলী তাদের 'মনুসংহিতা'-র নবম অধ্যায়টি মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করব। একই সঙ্গে এটাও উল্লেখ চাই, মনু তাঁর গ্রন্থে নারীদের বিষয়ে যেটুকু ভালো ভালো আপাত মঙ্গলদায়ক নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলি কোনোটাই নারীদের কথা ভেবে নয়, পুরুষদের কথা ভেবে। কারণ মনু পুরুষ ছিলেন।

মনু যেটা ছিলেন না, তা হল শূদ্র — কারণ মনু ছিলেন ব্রাহ্মণ। আর তাই শূদ্র জনজাতির প্রতি মনু এত নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা। এরা সংখ্যায় বৃহৎ হলেও, মর্যাদায়-অধিকারে অতি ক্ষুদ্র করে দেওয়া হল। এবার দেখি শূদ্র সম্পর্কে মনু কী বলেন — (ক) শূদ্র বা দাসদের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি রাখার অধিকার নেই। (খ) দাস ও শূদ্রের ধন ব্রাহ্মণ অবাধে নিজের কাজে প্রয়োগ করবেন। (গ) শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করতে পারবে না। কারণ তাঁর সম্পদ থাকলে সে গর্বভরে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করতে পারে। (ঘ) প্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা ও তোষক প্রভৃতি শূদ্র ব্যবহার করবে। (ঙ) প্রভুর উচ্ছিষ্ট তাঁর ভক্ষ্য। (চ) দাস বৃত্তি থেকে শূদ্রের কোনো মুক্তি নেই। (ছ) যজ্ঞের কোনো দ্রব্য শূদ্র পাবে না। (জ) ব্রাহ্মণের পরিবাদ বা নিন্দা করলে শূদ্রের জিহ্বাছেদন বিধেয়। (ঝ) ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিন্দা করলে যৎসামান্য জরিমানা দেয়। (ঞ) ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রহত্যা সামান্য পাপ। এই রূপে পেঁচা, নকুল ও বিড়াল ইত্যাদি হত্যার সমান। (ট) শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণ হত্যার বিচার মৃত্যুদণ্ড। (ঠ) শূদ্র সত্য কথা বলছে কি না তাঁর প্রমাণ হিসাবে তাকে দিব্যের আশ্রয় নিতে হবে। এতে তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হাঁটতে হয় অথবা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। অদগ্ধ অবস্থায় অথবা জলমগ্ন না-হয়ে ফিরলে তাঁর কথা সত্য বলে বিবেচিত হবে। (ড) দ্বিজকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) প্রহার করলে শূদ্রের হাত কেটে ফেলা বিধেয়। (ঢ) ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তাঁর কটিদেশে তপ্তলৌহ দ্বারা চিহ্ন একে তাকে নির্বাসিত করা হবে, অথবা তাঁর নিতম্ব এমনভাবে ছেদন করা হবে যাতে তাঁর মৃত্যু হয়। (ণ) দ্বিজের ন্যায় উপবীত বা অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করলে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড বিধেয়। (ত) যে পথ দিয়ে উচ্চ বর্ণের লোকেরা যাতায়াত করেন, সেই পথ শূদ্রের মৃতদেহও বহন করা যাবে না। (থ) ব্রাহ্মণের গায়ে থুথু দিলে তার ওষ্ঠছেদন হবে। মূত্রপুরীষ নিক্ষেপ করলে যৌনাঙ্গ ছেদন করা হবে এবং অধোবায়ু ত্যাগ করলে গুহ্যদেশ ছেদন করা হবে। (দ) শূদ্র যদি হিংসার বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণের চুল, চিবুক, পা, দাড়ি, ঘাড় এবং অণ্ডকোশে হাত দেয় তাহলে নির্বিচারে তাঁর দুটি হাতই কেটে দেওয়া হবে। ভগবানের

নির্দেশ বলে কথা! আরও পড়ুন — (১) সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ করে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। অর্থাৎ সমান জাতীয়া নারী বিবাহ না করে দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করলেও তাতে সন্তান উৎপাদন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়। — "শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।/জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।।" (৩/১৭) (২) কোনো দ্বিজাতি-নারী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারী) স্বামীর দ্বারা রক্ষিত হোক বা না-ই হোক, কোনো শূদ্র যদি তার সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহলে অরক্ষিতা নারীর সঙ্গে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্বহরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে, আর যদি স্বামীর দ্বারা রক্ষিতা নারীর সঙ্গে সম্ভোগ করে তাহলে ওই শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মারণদণ্ড হবে। — "শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।/ অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে।।" (৮/৩৭৪) (৩) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিরা যদি মোহবশত (ধনলাভজনিত অবিবেকবশতই হোক অথবা কামপ্রেরিত হয়েই হোক) হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহলে তাদের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদির সঙ্গে নিজ নিজ বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় —"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।/ কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্।।" (৩/১৫) (৪) শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন — এটি অত্রি এবং উথ্যতনয় গৌতম মুনির মত। শৌনকের মতে, শূদ্রা নারীকে বিবাহ করে তাতে সন্তানোৎপাদন করলে ব্রাহ্মণাদি পতিত হয়। ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি পতিত হয়। (মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মতে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর ক্ষেত্রেই এই পাতিত্য বুঝতে হবে। কুল্লুক ভট্টের মতে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — এই তিনজাতির শূদ্রা স্ত্রী সম্বন্ধেই এই পাতিত্য হবে)। — "শূদ্রাদেবী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।/শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ।।" (৩/১৬) (৫) সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ করে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন [অতএব সমানজাতীয়া নারী বিবাহ না করে দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করলেও তাতে সন্তান উৎপাদন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়]। — "শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্। জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।।" (৩/১৭) (৬) শূদ্রা ভার্যা গ্রহণের পর যদি ব্রাহ্মণের দৈবকর্ম (যেমন — দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ প্রভৃতি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণভোজনাদি হয়, তা), পিত্র্যকর্ম (পিতৃপুরুষের প্রতি করণীয় কর্ম, যথা, শ্রাদ্ধ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি) এবং আতিথেয় কর্ম (অতিথির পরিচর্যা, অতিথিকে ভোজন দান প্রভৃতি) প্রভৃতিতে শূদ্রা ভার্যার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ওই কর্মগুলি যদি শূদ্রা স্ত্রীকর্তৃক বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহলে সেই দ্রব্য পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ওই সব দেবকর্মাদির ফলে স্বর্গেও যান না (অর্থাৎ সেইসব কর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়)। — "দৈবপিত্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু। /নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি।।" (৩/১৮) (৭) কোনো হীনজাতীয়

পুরুষ যদি কোনো উচ্চবর্ণের কন্যাকে তার ইচ্ছা অনুসারেও সম্ভোগ করতে থাকে, তাহলে সেই পুরুষের বধদণ্ড হবে। কিন্তু নিজের সমানজাতীয়া কন্যার সঙ্গে ওইরকম করলে সে ওই কন্যার পিতাকে শুল্ক দেবে, যদি তার পিতা ওই শুল্ক নিতে ইচ্ছুক হয়। — "উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি।/শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি।।" (৮/৩৬৩)। (৮) কোনো দ্বিজাতি-নারী স্বামীর দ্বারা রতি হোক বা না-ই হোক, কোনো শূদ্র যদি তার সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহলে অরক্ষিতা নারীর সঙ্গে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্বহরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে; আর যদি স্বামীর দ্বারা অরক্ষিতা নারীর সঙ্গে সম্ভোগ করে তাহলে ওই শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মারণদণ্ড হবে। — "শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।/অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে।।" (৮/৩৭৪)। (৯) শূদ্র পুরুষ থেকে প্রতিলোমক্রমে জাত অর্থাৎ শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত চণ্ডাল — এই তিন জাতি পুত্রকাজ করার অযোগ্য। এই জন্য এরা অপসদ অর্থাৎ নরাধম বলে পরিগণিত হয়। এদের মধ্যে চণ্ডাল হল অস্পৃশ্য। — "আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।/প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ।।" (১০/১৬) (১০) চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। এইসব জাতিকে 'অপপাত্র' করে দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হবে তাদের ধনস্বরূপ। — "চণ্ডালশ্বপচানাং তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।/অপপাত্রাশ্চ কর্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দভম্।।" (১০/৫১)

যে দেশের নাগরিকের বৃহৎ অংশ (নারী এবং শূদ্র) বঞ্চিত, অবহেলিত, অধিকারহীন, ঘৃণিত, ধিক্কৃত, অশিক্ষিত থাকে — সে দেশ কখনোই অগ্রবর্তী হতে পারে না। হয়ওনি। মনু চেয়েছেন অগ্রবর্তী হোক কতিপয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তথা রাজা এবং বৈশ্যদের। মনুসংহিতার ছত্রে ছত্রে এঁদেরই সমৃদ্ধর কথা ভেবেছেন। মনুর এই মনুসংহিতার অনুশাসনই পরবর্তীতে হিন্দু বা হিন্দুত্ববাদ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের জাতপাত এর একটা বড়ো সমস্যা। এই সমস্যা এখনও গর্বের সঙ্গে হিন্দুরা অনুসরণ করে থাকে। আধুনিক এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আইন বা সংবিধান থাকলেও বহুকাল ধরে বিনা প্রতিবাদে চালু থাকায় রাষ্ট্রের আইনের চেয়ে 'মনুর' বিধান অনেক বেশি শক্ত ও দৃঢ়মূল হয়ে আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বি আম্বেদকরও খুব বেশি মনুবাদকে নড়াতে পারেননি। হরিজনদের উপরে ওঠানোর প্রয়াসে সংরক্ষণ করা ছাড়া বিশেষ কিছু করেছেন বলে জানা নেই। সেই সংরক্ষণও এমনভাবে প্রয়োগ হয়, যেখানে হরিজনেরা যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে, এগিয়ে আছে এগিয়ে থাকারাই। মনুর এই ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য মনুষ্যচিত, ভগবানোচিত নয়। মানুষই ভোগলিপ্সায় এইসব বিভাজন, বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা নির্মাণ করে থাকবে, দেবতা বা ভগবান নয়। দেবতা বা ভগবান পরম করুণাময়, ক্ষতিকর হতে পারে না। অতএব মনু ভগবান নয়, মানুষ —দোষেগুণে তমোগুণসম্পন্ন মানুষ, মাননীয় শাসকমাত্র। ড. আম্বেদকর ভারতের গরিব "মহর" পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসাবে গণ্য হত) জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণেই হয়তো তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের সংরক্ষণ করেছিলেন। উনি হয়তো

চেয়েছিলেন আরও পরিবর্তন, কিন্তু ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য (Untouchables or Untouchables community) প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং হাজারো শত (Hundreds of Thousands) অস্পৃশ্যদের থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম (Theravada Buddhism) স্ফুলিঙ্গের মতো রূপান্তরিত করে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে আম্বেদকর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গণ-আন্দোলন শুরু করেন এবং সুপেয় জলের উৎসদানে সংগ্রাম চালিয়ে যান (উল্লেখ্য, সে সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে নিম্নবর্ণের প্রবেশের অধিকার ছিল না।) মহদে সত্যাগ্রহ নামের অস্পৃশ্যদের (অন্ত্যজ জাতির) জন্য সংগ্রাম করে সুপেয় জল পানের অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁকে ১৯২৫ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটিতে নিয়োগ করা হয়েছিল, যাতে করে তিনি সমস্ত ইউরোপীয় সিমন কমিশনের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। সমগ্র ভারতজুড়ে স্ফুলিঙ্গের আকারে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন এই তালিকাটি অধিকাংশ ভারতীয় কর্তৃক ত্যাগ করা হয়েছিল, আম্বেদকর নিজে ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক সুপারিশের জন্য একটি পৃথক সুপারিশনামা লিখিত দেন।

অপরদিকে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্যদের জন্য গঠিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন, যদিও তিনি অন্য সকল সংখ্যালঘুদের যেমন মুসলমানদের ও শিখদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Separate Electorate) বিনা দ্বিধায় মেনে নেন এই বলে যে, তিনি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের গঠনকৃত নির্বাচকমণ্ডলী হিন্দুসমাজকে ভবিষ্যতে বিভক্ত এবং উচ্চশ্রেণির ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। ১৯৩২ সালে যখন ব্রিটিশরা আম্বেদকরের সঙ্গে একমত হন এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীদের ঘোষণা করেন, তখন মহাত্মা গান্ধী পুনের এরোদা কেন্দ্রীয় কারাগারে (Yerwada central jail) শুধুমাত্র অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি উপবাস শুরু করেন। গান্ধীর এই উপবাস (fast) ভারতজুড়ে বেসামরিকদের মাঝে প্রবল বিক্ষোভের উদ্দীপনা জোগায় এবং ধর্মীয় গোঁড়াবাদী নেতারা (Orthodox Politicians), কংগ্রেস নেতারা কর্মীদের মধ্যে মদনমোহন মালোভি ও পালঙ্কর বালো ও তাঁর সমর্থকরা আম্বেদকরের সঙ্গে এরাভাদে (Yeravada) যৌথ বৈঠক করেন। গান্ধিবাদীদের প্রবল চাপের মুখে (Massive coercion) এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ (Communal reprisal) ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে নির্মূলীকরণের আশঙ্কায় আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বাতিল করতে সম্মত হন। এই চুক্তির পরে গান্ধি উপবাস পরিত্যাগ করেন, ইতিহাসে এটি "পুনে চুক্তি" নামে পরিচিত। চুক্তির ফলশ্রুতিতে আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি ছেড়ে দেন যা আম্বেদকর গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হন। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হয়। এই চুক্তিতে যাকে বলা হয় অস্পশ্য সম্প্রদায় (Depressed Class)। আম্বেদকর হিন্দুবাদকে কর্কশ ভাষায় সমালোচনা করেন তাঁর "দ্য আন্ টাচেব্যলস ঃ এ থিসিস অন দ্য অরিজিনস অব

আন্‌টাচেব্যলিটি” রচনায় — The Hindu Civilisation ... is a diabolical contrivance to suppress and enslave humanity. Its proper name would be infamy. What else can be said of a civilisation which has produced a mass of people ... who are treated as an entity beyond human intercourse and whose mere touch is enough to cause pollution? (হিন্দু সভ্যতা হচ্ছে ..... মানবতাকে দমন এবং পরাভূত করতে একটি পৈশাচিক কৌশল। এর প্রকৃত নাম হবে সামাজিক কুখ্যাতি। কাকে সভ্যতা বলে ডাকা যায়, যার একগাদা মানুষ...., যাদের সত্ত্বা মানব সম্পর্কের নীচে গণ্য হয় ও শুধু যাদের ছোঁয়া দূষণের জন্য যথেষ্ট?)

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন-শোষণে নিপীড়িত নিম্নশ্রেণির মানুষের সামনে ভীমরাও রামজি আম্বেদকর আলোর মশাল নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। জাতপাত থেকে দলিত সম্প্রদায়কে চিরতরে মুক্তি দিতে তিনি বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে আম্বেদকর আবিষ্কার করেন মহরেরা আসলে প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ। আম্বেদকর তাঁর সারাজীবনে বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করেন, ১৯৫০ এর সময়ে তিনি এই ধর্মে তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন এবং শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন (তারপর শিলং) বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ও ভিক্ষুদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। যখন তিনি পুনের কাছাকাছি একটি নতুন বৌদ্ধমন্দির অর্পণ করেন, তখন আম্বেদকর ঘোষণা দেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্মের উপর একটি বই লিখেছেন, যত শীঘ্রই তিনি বইটি শেষ করবেন, তিনি সাদামাটাভাবে এই ধর্মে গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ যন্ত্রণার দীর্ঘ ৫৯ বছর বাবাসাহেব হিন্দুধর্মে যাপন করলেও, বাকি শেষ ৬ বছর তিনি বৌদ্ধধর্মেই ছিলেন। আম্বেদকর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সভিতা আম্বেদকর (বিবাহ-পূর্ব নাম ঃ সার্দা কবির), তাঁর স্বামীর সঙ্গে তিনিও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং ২০০২ সালে বৌদ্ধাবলম্বী হিসাবেই মারা যান।

বর্তমানে মনুস্মৃতি প্রথম থেকেই এরূপ ছিল না। আদি সংহিতায় এক লক্ষ শ্লোক ছিল, কিন্তু এখন মাত্র ২৬৯৪টা শ্লোক পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে মনুকে শিখিয়েছিলেন। মনু, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে শিখিয়েছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের ৫৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, ভৃগু এই শাস্ত্র মুনিগণকে শোনাবেন। এর থেকে বোঝা যায়, অন্তত তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থ বর্তমান আকার ধারণ করেছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। পণ্ডিতপ্রবরগণ কেউ কেউ বলেন, আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়েছে। স্যর উইলিয়াম জোনসের মতে খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক, শ্লেগেলের মতে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতক, এলফিনস্টোনের মতে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক, বুহলারের মতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল। অদ্যাপি মনুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁর স্মৃতির দোহাই দিয়ে পণ্ডিত সমাজ পদে পদেই দেওয়া হয়। স্মৃতিনিবন্ধগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনুর বচনের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মনুর প্রভাব ভারতের চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ নয়— ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমার, সিংহল বা শ্রীলংকা, পারস্য বা ইরান, চিন, জাপান এবং সুদূর প্রাচ্যের কিছু দেশে তাঁর প্রভাব ব্যাপক এবং সুগভীর।

মায়ানমারের কিছু আইনের গ্রন্থে মনুর ঋণ স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার 'চুলবংশ' নামক গ্রন্থে মনুর রাজধর্মের উল্লেখ বারবার করা হয়েছে। চিনে প্রাপ্ত একটি পুথিতে মনুর আইনকানুনের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাপানে উপনিবেশ স্থাপনকারী কিছু আর্য সেই দেশে মনুর ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তিত করেছিলেন বলে মনে হয়। প্রাচীন পারস্য বা ইরানের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন বৈবস্বত মনু।

বলা হয় হিন্দুদের প্রধান ধর্ম গ্রন্থ বেদ। মনুসংহিতা হিন্দু পৌরাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে হিন্দু আইনের ভিত্তিস্বরূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হিন্দুধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ, আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের বিধিবিধান সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলাপ করা হয়েছে। মনু কর্তৃক সংকলিত বলে এর নাম মনুসংহিতা। কথিত আছে, এই গ্রন্থটি প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু রচনা করেছিলেন। বেদ হিন্দুদের আদি গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেই 'মনুসংহিতা' বা 'মনুস্মৃতি' রচিত হয়েছে একথা বলা যায়। অতএব হিন্দুধর্ম মূলত মনুসংহিতা-নির্ভর। হিন্দু এবং হিন্দুবাদের আগাপাছতলাই মনু এবং মনুসংহিতা। মনুকে যদি আদি মানব বলা হয়, তাহলে হিন্দুদের কাছে ইনি প্রাতঃস্মরণীয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি কোনো এক অজানা কারণে। মনুকে আদি মানব বলা হলেও নিশ্চয় অন্য ধর্মের, মানে পৃথিবীর অন্য মানুষদের তিনি আদি নন, তিনি শুধু হিন্দুমানবদেরই আদি মানব, তাই নয় কি?

মনুস্মৃতি ও মহাভারত গ্রন্থদুটিতে কতকগুলি শ্লোকের হুবহু মিল পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমার্জন হলেও একইরকম। বস্তুত মনুর গ্রন্থ আমাদের কাছে আদিরূপে পৌঁছোয়নি। বর্তমান মহাভারত বহুদিন যাবৎ বিবর্তনেরই রূপ। সুতরাং মহাভারতের কাছে মনুসংহিতা ঋণী, নাকি মনুসংহিতার কাছে মহাভারত ঋণী—তা বলা প্রায় অসম্ভব। এই দুই গ্রন্থে এমন কিছু শ্লোক আছে যেগুলিতে শব্দগত সাদৃশ্য না-থাকলেও ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'মনুসংহিতা'-য় কী কী আছে? ২৬৯৪টি শ্লোকে সন্নিবেশিত গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো হল — (ক) পৃথিবীর উৎপত্তি (খ) বিভিন্ন সংস্কারের নিয়ম (গ) ব্রতাচারণ (ঘ) বিবাহের নিয়মাবলি (ঙ) অপরাধের শাস্ত্রীয় বিধি (চ) শ্রাদ্ধবিধি (ছ) খাদ্যাখাদ্য বিধি (জ) বিভিন্ন বর্ণের কর্তব্য, (ঝ) বর্ণাশ্রম বিধি (ঞ) স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক ধর্ম (ট) সম্পত্তি বণ্টনের বিধি (ঠ) সংকর বর্ণের বিবরণ (ড) জাতিধর্ম (ঢ) কুলধর্ম (ণ) ব্রাহ্মণের অধিকার ও করণীয় এবং (ত) রাজা-প্রজার পারস্পরিক কর্তব্য ইত্যাদি।

হিন্দুদের ধর্মভিত্তিক আইন ও সামাজিক রীতিনীতি পরিচালিত হয় আরেকটি গ্রন্থ 'মনুসংহিতা' বা মনুস্মৃতির উপর ভিত্তি করে। বেদের নির্যাস নিয়েই আরোপিত এই ধর্মটির প্রচারিত সংবিধান হয়ে উঠল মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। এর মাধ্যমে যে সমাজ-কাঠামোর নির্মাণ যজ্ঞ চলতে থাকল তার ভিত্তি এক আজব চতুর্বর্ণ প্রথা। যেখানে আদিনিবাসী অনার্যরা হয়ে যায় নিম্নবর্ণের শূদ্র, যারা কেবলই উচ্চতর অন্য তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের অনুগত সেবাদাস। কোনো সমাজ-সংগঠনে বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যজ্ঞে অংশগ্রহণের অধিকার শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর যারা এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে প্রতিবাদী-বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল, এদেরকেই সুকৌশলে করা হল অচ্ছ্যুৎ, দস্যু, অসুর, দৈত্য, সমাজচ্যুত বা অস্পৃশ্য

সম্প্রদায়। পৃথিবীতে যতগুলো কথিত ধর্মগ্রন্থ আছে তার মধ্যে মনে হয় অন্যতম বর্বর, নীতিহীন, শঠতা আর অমানবিক প্রতারণায় পরিপূর্ণ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা'।

এ পর্যন্ত পাঠ করে যাঁরা ভাবছেন মনু খুবই নৃশংস ধরনের আইন-প্রণেতা ছিলেন, তাঁদের বলব ভুল ভাবছেন। ১২টি অধ্যায়ের ২৬৯৪টি শ্লোক জুড়ে মনু কেবলই নৃশংসতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেননি, অসংখ্য উদার এবং কল্যাণকর মানসিকতার বিধানও সংযোজন করেছেন। দুর্ভাগ্য এই যে সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেইসব কল্যাণকর বিধানগুলির পথ মাড়াননি এবং অত্যন্ত সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। দুটি উদাহরণই উল্লেখ করব — (১) "যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী অথবা সন্তান না থাকে তাহলে তার সম্পত্তি তার ভাই-বোনদের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেবে। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার ভাই-বোনদের মাঝে প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে অস্বীকৃত জানায় তাহলে আইন অনুযায়ী সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।" (৯/২১২)। (২) "নারীর সুরক্ষা বিধান নিশ্চিত করার জন্য মনু আরও কঠোরতর শাস্তি বিধানের পরামর্শ দিয়েছেন তাদের উপর যাঁরা নারীর সম্পত্তি হনন করার চেষ্টা করবে, এমনকি সে তার নিকট-আত্মীয় হলেও তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।" (৯/২১৩) অথচ নারীকে বহুকাল সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, আজ তক। নানা কৌশলে নারীকে পিতামাতার সম্পত্তি থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নারীর সম্পত্তির আধিকার বিষয়ে আইন আছে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। হাজার হাজার বছর ধরে মনুর বিধান যেমন মনুসংহিতায় বন্দি হয়ে ছিল, আধুনিক আইনও ওইভাবেই প্রায়-অপ্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। দাবি করলে পাওয়া যায় বটে, না দাবি করলে কিছুই নেই।

পরিশেষে বলব — ব্রাহ্মণ্যবাদের আকর গ্রন্থ শ্রুতি বা 'বেদ'-এর নির্যাসকে ধারণ করে যেসব স্মৃতি বা শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে কথিত, তার শীর্ষে অবস্থান করছে মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। তাই মনুসংহিতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। সাধারণত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আদি মতবাদ ছাড়াও চার্বাকের অবিমিশ্র নিরীশ্বরবাদ, আচার্য রামানুজের দ্বৈতবাদ, আচার্য শংকরের সর্বেশ্বরবাদ, রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ এবং বহুদেবত্ববাদও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হিন্দুধর্ম হল কতকগুলো পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় মতবাদ ও দর্শনের সমষ্টি। হিন্দুবাদ হচ্ছে কঠোর বর্ণাশ্রমভিত্তিক একটি সমাজব্যবস্থা, যাতে মানুষের মর্যাদা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুবিচারের কোনো স্বীকৃতি নেই। হিন্দুবাদের প্রাচীন ভাবধারার প্রভাব এখনও সুদূরপ্রসারী। সমাজের বহিরঙ্গে দৃশ্যমান হিন্দুদের তথাকথিত উদারনৈতিকতা তাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় নয়। এই উদারনৈতিকতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে আর্যসমাজের সত্যিকার রূপ। অর্থাৎ যোগফল মনুসংহিতা মানেই ব্রাহ্মণ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ মানেই মনুসংহিতা, মনুসংহিতা মানে হিন্দুবাদ।

পদবিনামার চালচলন

"মানুষের সৃষ্ট এ জাত ও পদবি একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের অনেক দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। এতে হিন্দুসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জাতি-যাতনায় অসংখ্য নিম্নশ্রেণি ও বর্ণের হিন্দুরা ধর্ম ত্যাগ করেছে।"

দেবদেবীগণের পদবি নেই কেন? এমন একটা প্রশ্ন সকলের মনেই উঁকি মারতে পারে। প্রশ্ন উঠলে উত্তর খুঁজতে হবে, এটাই দস্তুর। চলুন, উত্তর খোঁজা যাক। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত বাঙালি হিন্দুদের পদবিসমূহ বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। বাঙালির বংশ পদবির ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। মধ্যযুগে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার ফলে পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমান্তরালে বাঙালির পদবির বিকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ ব্যক্তি নামের শেষে একটি পদবি নামক পুচ্ছ যুক্ত হয়ে আছে। যেমন উপাধি, উপনাম কিংবা বংশসূচক নামকে সাধারণভাবে পদবি বলা হয়। বাঙালির মূল নামের শেষে বংশ, পরিবার, পেশা, বসতি স্থান ইত্যাদির পরিচয়বাহী উপনাম ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। সামন্ততান্ত্রিক পদবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক ক্ষেত্রেই জমি ও হিসাব সংক্রান্ত পদবি। তবে এই সমস্ত পদবির বেশিরভাগই বংশপরম্পরায় চলে এলেও বর্তমানে পদবির সমাজগত কোনো মূল্য নেই বললেই চলে। এখানে যেমন ধর্মীয় জাতিভেদ প্রথার প্রভাব বিদ্যমান, তেমনই ঐতিহ্যবাহী পেশাকেও পদবি হিসাবে গ্রহণের রেওয়াজ বিদ্যমান। তৎকালীন সমাজে কোনো মানুষেরই পদবি ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই দেবদেবীদেরও পদবি নেই। দেবতাগণ মানুষেরই প্রতিরূপ। তৎপরবর্তী সমাজজীবনে বর্ণাশ্রম গেড়ে বসার পর পেশাভিত্তিক পরিচয় নামের সঙ্গে যুক্ত হল। পদবি তো আসলে আমাদের পেশারই পরিচয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র — প্রত্যেককেই আলাদা করে চেনা যেত পদবি দিয়েই। নাহলে তো মুড়ি-মুড়কির একদর হয়ে যাবে, তাই না? নাম ও পদবির

প্রয়োগ নিয়ে মনুবাবু (বৈবস্বত মনু) কী বলেছেন দেখি ঃ ব্রাহ্মণের নাম মঙ্গলবাচক এবং পদবি শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলবাচক এবং পদবি রক্ষাবাচক, বৈশ্যের নাম ধনবাচক এবং পদবি পুষ্টিবাচক, শূদ্রের নাম নিন্দাবাহীবাচক এবং পদবি বশ্যতা বা দাসবাচক হতে হবে। পদবি থেকেই বোঝা যাবে আমার পূর্বপুরুষ কোন্ পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সামাজিক মর্যাদাই-বা কোন্ স্তরে ছিল। সামাজিক মর্যাদা সেইভাবেই নির্ণয় হল।

বেদ, পুরাণ, জাতক বা কথাসরিৎসাগরের পাতা তন্নতন্ন করে খুঁজলেও সেখানে পদবির কোনো টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপনিষদে কোনো কোনো নামে অবশ্য দুটি অংশ লক্ষ করা যায়। যেমন প্রাচীনশাল ঔপমানব, উদ্দালক আরণি। আরুণির অর্থ অরুণের পুত্র। অর্থাৎ নামের সঙ্গে ছিল পিতার পরিচয়। পিতৃপরিচয়ের মতো পুরাণকালে মাতৃপরিচয়ও স্বীকৃত ছিল। যেমন সত্যকাম জাবালি। জাবালির অর্থ জবালার পুত্র। মহাভারতের ও রামায়ণের কোনো চরিত্রেরই কোনো পদবি ছিল না—সে অর্জুন হোক কিংবা একলব্য। বাপের পরিচয়ে কৃষ্ণার নাম ছিল দ্রৌপদী, জন্মস্থানের পরিচয়ে পাঞ্চালী, জন্ম-ইতিহাসের পরিচয়ে যাজ্ঞসেনী। কালীদাস, বাণভট্ট, হর্ষবর্ধন, কনিষ্ক, ভাস, বরাহমিহির, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, পরাশর, রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, মৈত্রেয়ী, অপালা, গার্গী প্রমুখ অজস্র প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরও কোনো পদবি নেই — এরা কিন্তু কেউই দেবদেবী নয়, মানুষ। সম্ভবত পদবি যুক্ত হয়েছে বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেনের যুগ থেকে। প্রাচীনকালের শাসকগণ “divide and rule policy” প্রয়োগ করে ভারত উপমহাদেশের বৃহৎ জনজাতিকে শত শত ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। হিন্দু জাতির মধ্যে হাজার তিনেক শাখা-উপশাখা, তস্য শাখায় ভাগ করা জাতপাত আছে। ভারতে ব্রাহ্মণ জাতের সংখ্যা নাকি প্রায় ৩০০। সব ভাগই ছিল পেশাভিত্তিক। যুগে যুগে পেশার সংখ্যা যত বেড়েছে জাতও তত বেড়েছে। প্রাচীন ভারতে কেউ যদি কোনো কাজে দক্ষ হয়ে উঠত এবং পেটের জন্য নিয়মিত সেই কাজ করত ব্রাহ্মণবাদের ধারক ও বাহকেরা মানে সমাজপতিরা সেই কাজটাই তার জাতপেশা বা বংশধারা বা পৈতৃক পেশা হিসাবে দেখত। সব পদবির বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করছি কয়েকটা উদাহরণ দিতে। এমনি একটি পদবি “কয়াল” বা “কইয়্যাল” (কয়াল মানে যে ধান-চাল ওজন করে, যে বিক্রয়ের জন্য ওজন করে), অর্থাৎ কয়াল পদবিধারীদের পূর্বপুরুষ যে ধান-চাল ওজন করা, যে বিক্রয়ের জন্য ওজন করার পেশার সঙ্গে যুক্ত করতেন। জনৈকা অভিনেত্রীর পদবি কয়াল। মুচিরাম গুড়ের পদবি গুড়, অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষ গুড় তৈরি করতেন বা বেচতেন। এরকম চিনি, দা, হাড়ি, ঢেঁকি, ঢাকি, ঢুলি, কড়াই, ঘড়া, খাঁড়া, হাতা, উকিল, গায়েন, তন্তুবায়, কর্মকার, মোদক, যোগী, স্বর্ণকার, মালাকার, ঘটক, পাঠক, জ্যোতিষী, কবিরাজ, ঘরামি, বৈদ্য, বণিক ইত্যাদি পেশাভিত্তিক পদবি আছে। মজুত থেকে মজুম, মজুত রক্ষা করেন যিনি

তিনিই তো মজুমদার (অনেকের মতে মৌজার অধিকর্তা যিনি হতেন, তাঁকে বলা হত 'মজুমদার')। যিনি দৈনিক হিসাব রাখতেন, তাঁকে বলা হত 'সেহানবিশ'। যিনি শান্তিরক্ষকের কাজ করতেন, তাঁকে বলা হত 'শিকদার' বা 'সিকদার'। যিনি কেরানির কাজ করতেন, তাঁকে বলা হত 'মুনশি'। বড়োবাবুর কাজ যিনি করতেন, তাঁকে বলা হত 'মুস্তাফি'। ব্যাংকার বা মহাজনদের বলা হত 'পোদ্দার'। যাঁরা হাবিলদারের কাজ করতেন, তাঁদের বলা হত 'লস্কর'। দশজন সেনার উপরে যিনি থাকতেন, তাঁকে বলা হত 'পদিক'। মুখে মুখে যা হয়ে দাঁড়ায় 'শতিক'। দশ শতিকের উপরে যিনি থাকতেন, তাঁকে বলা হত 'সেনাপতি'। দশ সেনাপতির উপরে যিনি থাকতেন, তাঁকে বলা হত 'নায়ক'। 'দলুই' এসেছে দলপতি থেকে। অনুরূপ 'চাকলাদার', চাকলা মানে কতকগুলি পরগনার সমষ্টি। এই পরগণা সমষ্টির রক্ষাকর্তা চাকলাদার। যিনি যে-গ্রামে জন্মাতেন বা বসবাস করতেন, তিনি কোথাকার, তার শিকড় কোথায়, তা জানান দিতেই নামের সঙ্গে উল্লেখ করা হত সেই জায়গার নাম। যেমন বটব্যাল ও বড়াল একই পদবি। এসেছে বড়ো গ্রাম থেকে। কুশো গ্রাম থেকে এসেছে কুশারি। লোকমুখে পরে সেটা 'ঠাকুর' পদবিতে রূপান্তরিত হয়। ঘোষাল এসেছে ঘোশ বা ঘোশাল গ্রাম থেকে। গড়গড়ে থেকে গড়গড়ি। পাকুর বা পর্কট থেকে পাকড়াশি। অম্বলু থেকে অম্বলি। পলশা থেকে পলসাঁয়ী। পোষলা থেকে পুষালী। পোড়াবাড়ি থেকে পোড়ারি।

প্রাচীন যুগে অর্থাৎ হিন্দু আমলে এবং মধ্যযুগের মোঘল-পাঠান শাসনামলে ও আধুনিককালের শাসনামলে পদবিসমূহ কম-বেশি সংস্কারকৃত হয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়েছে। তবে কিছু পদবি আছে, যা বাঙালি সমাজে শুধু হিন্দুশ্রয়ী, কিছু পদবি একান্তই মুসলমানি, আবার বেশ কিছু পদবি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। শেখ, সৈয়দ, চৌধুরী প্রভৃতি বংশ-পদবি বাঙালি মুসলমান সমাজকে আশরাফ এবং আতরাফ এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। একদা এই তথাকথিত আশরাফ সম্প্রদায় বাঙালি মুসলমান সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। এদেশের সাধারণ মুসলমানকে বলা হত আতরাফ, যার আভিধানিক অর্থ নিচু সমাজ, নিচু বংশ, নিচু বর্গের লোক। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, একমাত্র পদবি চেতনাই বাঙালি মুসলমান সমাজে সীমিত অর্থে হলেও একটা সময় সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি দীর্ঘকাল পূর্বে পদবিই নির্ধারণ করে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক মর্যাদা। অন্তত পদবির পরিচিতিতে বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু জাতি গত ঐতিহ্যের শিকড়কে খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মগত বিভাগের খোলসের বাইরে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের বংশগত ও পেশাগত ঐতিহ্যের গোড়ার কথা সন্ধান মেলে এই পদবি পরিচিতিতে। শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, কাজি, গাজি, মিঞা, মির্জা, মোল্লা, খন্দকার ইত্যাদি কয়েকটি ভিনদেশি পদবি যা উপমহাদেশে মুসলমান আগমনের সঙ্গে

জড়িত সে কয়টি পদবি ব্যতীত বাংলার অধিকাংশ পদবিই হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে প্রায় সকল ধর্মে ও বর্ণে দুর্লভ নয়।

হিন্দুদের ব্রাহ্মণগণ বর্ণভেদ প্রচলন করেছিলেন ঠিকই, তার মানে এই নয় যে বর্তমানে পদবিরাজের মহিরূহ অবস্থার জন্য ব্রাহ্মণগণদের পুরোপুরি দায়ী করা যায়! ব্রাহ্মণগণ শুরু করলেও শেষ করেছেন সমাজের একশ্রেণির প্রতিপত্তি এবং প্রভাবশালী অব্রাহ্মণ এবং সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ তথা বর্ণহিন্দুদের উচ্চতায় উঠবার লিপ্সা। সমাজের যে স্তরের মানুষ যেই ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বলীয়ান হলেন, সেই ক্ষেত্রেই প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন স্বজাতি হলেও সেইসব মানুষদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। যে "মজুমদার" বংশে প্রতিপত্তি বেড়ে গেল সে হল কুলীন কায়স্থ, আর বাকি পিছিয়ে-পড়া "মজুমদার" হয়ে গেল শূদ্র। শূদ্র মজুমদাররাও কম যায় না, তাদের থেকেও পিছিয়ে-পড়া এবং দুর্বল মজুমদারদের কাপালিক বলে ঘৃণ্য করে দিল। নানা সময়ে পদবির বিবর্তনের ফলে পদবি এক হলেও গোষ্ঠী এক হলেও তাদের সবারই একইরকম পেশার পরম্পরা ছিল না। কোনো নির্দিষ্ট পেশাকে তুলনামূলকভাবে ছোটো বা বড়ো করে দেখা হত। নতুন আর-একটি বর্ণ বিভাজন তৈরি হত। যেমন "ঘোষ" পদবি। বলতে শুনি কায়স্থ ঘোষ, আবার গোয়লা বা গোয়ালা ঘোষ। গোয়লা ঘোষ বর্ণভেদ নিয়মে কায়স্থ ঘোষের থেকে ছোটো, ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করে। এই কায়স্থ ঘোষরা নিজেদেরকে কুলীন বলে দাবি করেন। কে ছোটো কে বড়ো, কে কুলীন কে মলিন, কে ব্রাত্য কে জাত্য — এ নিয়ে কায়স্থরা গর্বিত আলাপন করে। বলে — "বাংলাদেশে চার ঘর কুলীন — ঘোষ, বোস (বসু), গুহ, মিত্র। আর এদেশে কায়স্থরা গর্বিত আলাপন করে। আর এদেশে (পশ্চিমবঙ্গে) তিন ঘর কুলীন — ঘোষ, বোস, মিত্র" (মিত্র কায়স্থ, কিন্তু মৈত্র হলেই নাকি ব্রাহ্মণ)। ও বঙ্গের কুলীন গুহ এ বঙ্গে মর্যাদা হারিয়ে ব্রাত্য হয়ে গেল। কোন্ জাদুবলে গুহ বাদ পড়ে গেল কোনো কায়স্থ তা বোঝাতে পারেনি। কায়স্থরা আরও একটা মর্যাদাভিত্তিক ছড়া আওড়ে থাকে। খুব পরিচিত — "ঘোষ বংশ বড়ো বংশ, বোস বংশ দাতা। মিত্র বংশ কুটিল বংশ, দত্ত হারামজাদা"। বুঝুন ঠ্যালা!

তৃতীয় শতক থেকে গৌড় বঙ্গে এবং পঞ্চম শতক থেকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি স্থান পেয়েছে। পাঁচ শতকের বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় এই সময়ের ব্রাহ্মণদের প্রধান পদবি ছিল "শর্ম্মা" ও "স্বামী"। ব্রাহ্মণদের "শর্ম্মা" পদবিটি এখনও বাংলায় আছে। তবে দক্ষিণ ভারতে "স্বামী" পদবি প্রচলিত। মূলত অষ্টম শতক থেকে মনুসংহিতা তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুশাসন জোরদার হয়েছে ভবদেব ভট্ট, কুমারিল ভট্ট, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, শূলপাণি, রঘুনন্দন এবং শংকরাচার্যের নেতৃত্বে। কী অনুশাসন? অবশ্যই জাতপাতভেদ এবং জাতপাতভিত্তিক পদবি সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ

ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ হিন্দুরাজা বল্লালসেনের আমলে আমরা বাঙালিরা দেখতে পাই। তিনি শুধু সর্বজনবিদিত কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেননি, তিনি বাঙালিদের জন্য প্রচুর পদবি সৃষ্টি করলেন। শুধু কুলীন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ নয়, সৃষ্টি করলেন ৩৬টি জাত এবং তাদের ৩৬টি পদবি। বল্লালসেন ঘোষণা করলেন ৩০ বছর পর পর পরীক্ষা হবে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার কুলীনের গুণাবলি রক্ষা করে চলতে পেরেছে কি না, রক্ষা করতে না-পারলে কুলীনত্ব হারাতে হবে। পরবর্তীতে রাজা লক্ষণসেন কৌলীন্য প্রথাটির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেন। আদেশ দিলেন কুলীনরা পুরুষাণুক্রমে কুলীনত্ব ভোগ করবেন, কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা হবে না। মনে রাখতে হবে পদবি বিতরণের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কর্তা হল অবশ্যই ব্রাহ্মণ গুরু বা পুরোহিত। তারপরই রাজা, জমিদার, সমাজপতিদের।

চতুর্বর্ণের চারটি বর্ণ — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। বাংলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্তিত্ব কোনো সময় তেমনভাবে ছিল না। কেন ছিল না, কেনই-বা নেই বলা সম্ভব নয়। বাংলার বাঙালিদের প্রধানত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-অন্ত্যজদের নিয়ে বর্ণবিন্যাস। কায়স্থ-করণ-অম্বষ্ঠ-বৈদ্য—এইসব সংকর বর্ণদেরকে শূদ্রগোষ্ঠীতে ফেলা হত। কায়স্থ ও করণ বর্ণ হিসাবে সমান ও অভিন্ন। অন্যদিকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানরা গ্রহবিপ্র বা গণক বলে পরিচিত এদেরই অন্য একটি শাখা হল অগ্রদানী। আর সূত পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানরা হল ভট্ট ভাট (ভাটদের পাড়া ছিল ভাটপাড়া) ব্রাহ্মণ। এই তিন শ্রেণির ব্রাহ্মণ পতিত। তবে স্মৃতি পুরাণে বলা হয়েছে — বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলেই শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত।

মনুবাবু কী বলছেন? ব্রাহ্মণ কে, ব্রাহ্মণের মর্যাদাই-বা কতটা — এ ব্যাপারে "মনুসংহিতা"-য় মনু পরিষ্কারভাবে বলেছেন — (১) "ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।/বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ"। (১/৯৬) অর্থাৎ, সৃষ্ট (স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে) প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। (২) "উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তিধর্মস্য শাশ্বতী।/ স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। (১/৯৮) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের দেহই ধর্মের সনাতন মূর্তি। তিনি ধর্মের জন্য জাত এবং মোক্ষলাভের যোগ্য পাত্র। (৩) "ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।/ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে"।। (১/৯৯) অর্থাৎ, জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভু হন। (৪) "সর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিৎজ্জগতীগতম।/ শ্রষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোইর্হতি।। (১/১০০) অর্থাৎ, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেই সব ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হেতু ব্রাহ্মণ এই সবই পাওয়ার যোগ্য। (৫) "স্বমেব ব্রাহ্মণ্যে ভুঙতে স্বয়ং বস্তে স্বয়ং

দদাতি চ। / আনৃশংস্যাদব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ”।। (১/১০১) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নিজের অন্নই ভক্ষণ করেন, নিজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্য দান করেন। অন্য লোকেরা যা ভোগ করে, তা ব্রাহ্মণের দয়া হেতু করে।

এবার ব্রাহ্মণদের পদবির উৎস খুঁজব। মুখটি/মুখুটি > মুখোপাধ্যায় > মুখুজ্যে > মুখার্জি। আচার্য সুনীতিকুমার বলছেন, গ্রামেরনামেই ব্রাহ্মণদের পদবি ছিল। যেমন চাটু গ্রাম থেকে চাটুতি > চট্টোপাধ্যায় > চাটুজ্যে > চ্যাটার্জি, মুখটি গ্রাম থেকে মুখুটি > মুখোপাধ্যায় > মুখুজ্যে > মুখার্জি, বন্দ্য গ্রাম থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় > বাড়ুজ্যে > ব্যানার্জি, তেমনই ‘গঙ্গাকুলির’ থেকে গাঙ্গৌলি, গাঙ্গুলি। মুখার্জি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, গাঙ্গুলি পদবিগুলি ইংরেজদের থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। পেশাগতভাবে ব্রাহ্মণের পদবির সঙ্গে আচার্য এবং উপাধ্যায় যুক্ত করে দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র — এই তিন বর্ণের কাজ কী হবে? “মনুসংহিতা”-য় মনু নির্দিষ্ট করে দিলেন। ব্রাহ্মণদের জন্য বললেন — “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। / দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ”।। (১/৮৮) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের জন্য সৃষ্টি করলেন অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ।

ক্ষত্রিয়দের জন্য বললেন — “প্রজনাং রক্ষনং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। / বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।। (১/৮৯) অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়ের (কর্ম) সংক্ষেপে লোকরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অত্যাসক্তির অভাব।

বৈশ্যদের নির্দেশ দিলেন — “পশূনাং রক্ষনং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। / বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ”।। (১/৯০) অর্থাৎ, পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, সুদে অর্থ বিনিয়োগ ও কৃষি বৈশ্যের (কর্ম)।

শূদ্রদের জন্য নির্দেশ ছিল — “একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।/ এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়া”।। (১/৯১) অর্থাৎ, প্রভু শূদ্রের কিন্তু একটি মাত্র কর্মের নির্দেশ দিলেন, তা হল সকল বর্ণের অসূয়াহীন সেবা।

মনু বললেন, যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন করিয়ে তাকে কল্প (যজ্ঞবিদ্যা) ও রহস্য (উপনিষদ) সহ বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁকে আচার্য বলে। কর্ণাটক থেকে বাংলায় আগত ভট্ট-ব্রাহ্মণেরা এই পেশা গ্রহণ করে ভট্টাচার্য (ভট্ট + আচার্য) হলেন। সেনরাও কর্ণাটক থেকেই এসেছে। বর্মনরা এসেছে কলিঙ্গ (অধুনা ওড়িশা) থেকে। মনু বললেন, যে ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্য বেদের অংশমাত্র বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তিনি উপাধ্যায় হবেন। এই পেশা গ্রহণ করে বন্দ্য + উপাধ্যায় = বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখু + উপাধ্যায় = মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। চক্রবর্তী কিন্তু ব্রাহ্মণদের পদবি নয়, উপাধি। উপাধি থেকেও সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর পদবি। যেমন রায়, চৌধুরী, সরকার, হাজারী, তালুকদার, হালদার,

খাঁ। ইংরেজ আমলেও অনেকগুলি উপাধির প্রচলন হয়েছিল পদবি হিসাবে। যেমন রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, নাইট বা স্যার। ছিল 'মহামহোপাধ্যায়' খেতাবও। এটা এতটাই লোভনীয় ও সম্মানজনক ছিল যে, নামের পরে পদবি হিসাবে নয়, প্রাপকরা তাঁদের নামের আগেই ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। "ঠাকুর" বাঙালি পদবি বা উপাধি, "ঠাকুরমশাই" শব্দটি থেকে সাধিত শব্দ। তদানীন্তন কোনো কোনো বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের যেমন, কুশারি অথবা ভট্টাচার্য পদবিবিশিষ্ট মানুষদের সম্মান করে "ঠাকুরমশাই" বলে ডাকত। এই ডাকার ফলে পরে তা 'ঠাকুর' রূপে বদলে গিয়েছিল। নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চ আধ্যাত্মিক তথা ব্রাহ্মণ পদবিধারী কোনো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে "ঠাকুর" বলে ডাকা হয়। কারও কারও মতে অবশ্য কারও নামের শেষাংশ থেকে নয়, 'ভারত' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'গল্প'। তা থেকেই 'ভর্ত্ত'। পরে মুখে মুখে তা 'ভট্ট' হয়ে যায়। 'দেব' শব্দটি কিন্তু ইতিহাস-খ্যাত ক্ষত্রিয় রাজাদের নামেই দেখা যেত। এই দেব শব্দেরই অপভ্রংশ রূপ দে।

আবার ফিরে গোড়ায় ফিরে যাওয়া যাক। সে রকম নামের কেউ বিখ্যাত হয়ে গেল তাঁর পরবর্তী প্রজন্মরা নিজেদের ওই বিখ্যাত লোকের উত্তরাধিকারী বোঝানোর জন্য নিজের নামের সঙ্গে সেই বিখ্যাত লোকের নামের শেষাংশটা জুড়ে দিতেন। যেমন বাণভট্ট, আর্যভট্ট। এঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষ ছিলেন, এঁদের পরম্পরা অনুসারে উত্তসূরিদের সকলে চিনত। তাই তাঁদের নামের পাশে পুর্বপুরুষের নামের দ্বিতীয় অংশ ব্যবহার করতেন। এইভাবে বাণভট্ট বা আর্যভট্টের উত্তরসূরিরা তাদের নামের পর ভট্ট ব্যবহার শুরু করেন। এই ভট্টরাই পরবর্তীতে ভট্টাচার্য (ভট্ট + আচার্য)। যেমন ঈশ্বরঘোষ বা অনন্তঘোষ, অশ্বঘোষ। এভাবেই বিশ্ববসু বা পৃথ্বীবসু থেকেই 'বসু' পদবির উৎপত্তি। বিষ্ণুশর্মা থেকে শর্মা, কৃষ্ণস্বামী থেকে স্বামী, চন্দ্রবর্মা থেকে বর্মা পদবির আবির্ভাব। মহাবল, ইন্দ্রবল জাতীয় নাম থেকে 'বল'। পরহিতভদ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, বুদ্ধগুহ, বিশুদ্ধসিংহ, ধনগুপ্ত, কল্যাণমিত্র, জগৎমিত্র, বিমলমিত্র থেকে এসেছে যথাক্রমে ভদ্র, রক্ষিত, শীল, গুহ, সিংহ, গুপ্ত, মিত্র পদবি। একইভাবে এসেছে ধর, দেব, দত্ত, সেন, সোম, চন্দ্র, যশ বা দাস। এই সময়ে দেখুন — আনন্দশংকর, রবিশংকর, অমলাশংকর, মমতাশংকর, তনুশ্রীশংকর ইত্যাদি। আমি তো ছোটোবেলায় "শংকর" বলে পদবি জানতাম, পরে জেনেছি পদবি নয় এটি নামের অংশ।

ডিগ্রি বা পদমর্যাদাও পদবিতে যুক্ত হল। "মুন্নাভাই এমবিবিএস" নতুন কিছু নয়। এই কিছুকাল আগেও অনেকেই নামের পাশে বি.এ, এম.এ, বি.এড লিখতেন। তেমনই তারও বহু আগে যাঁরা একটা বেদ পাঠ করতেন, তাঁদের বলা হত পণ্ডিত। বাংলার বাইরে যা হয়ে যায় পাণ্ডে। যাঁরা দুটো বেদ পাঠ করতেন, তাঁদের বলা হত দ্বিবেদী। বাংলার বাইরে যাঁরা দুবে হিসাবে পরিচিত। তিনটে বেদ পাঠ করতেন যাঁরা, তাঁদের

বলা হত ত্রিবেদী। বাংলার বাইরে এঁরাই হয়ে যান তেওয়ারি। চারটে বেদ যাঁরা পড়তেন, তাঁদের বলা হত চতুর্বেদী। বাংলার বাইরে তাঁরাই চৌবে। তবে হ্যাঁ, বংশের কোনো একজন পণ্ডিত হলে, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কেউ তিনটে বেদ পড়লেও তিনি কিন্তু আর ত্রিবেদী বা তেওয়ারি হয়ে উঠতে পারতেন না। তাঁকে পণ্ডিত পদবি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। তেমনই দুটি বা তিনটি বা চারটে বেদ পড়া কারও বংশধর যদি একটিও বেদ না পড়তেন, তাঁরাও শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই ওই পূর্বের পদবিই ব্যবহার করবেন।

তৎকালীন ওড়িশা, বর্তমানে মেদিনীপুরের পদবি "পাঁজা" এসেছে পাঞ্জা থেকে। মোঘল আমলে পাঞ্জা ছাপ দেওয়া কোনো বাদশাহি সনদপ্রাপ্তি বা ভূমি দানের স্মৃতিকেই বংশ-গৌরব হিসাবে ধরে রাখার জন্য পাঞ্জা ছাপ থেকে পাঞ্জা এবং তা থেকে পাঁজা পদবির সৃষ্টি। পায়রা মানে কিন্তু কবুতর নয়। শীতের প্রথমে খেজুর গাছের রস থেকে গুড় বানাতে হলে গাছটির গুঁড়ি খানিকটা কেটে কলসি ঝুলিয়ে দিতে হয়। নিয়ম হল, পর পর তিন দিন গুঁড়ি কাটা যাবে ও রস গ্রহণ করা যাবে। তারপর তিন দিন বিশ্রাম। এই বিশ্রামের পর প্রথম যে দিন আবার গুঁড়ি কাটা হবে, তার রস থেকে যে গুড় তৈরি হয়, তাকে বলা হয় পায়রা। অর্থাৎ পহেলা বা পয়লা শব্দ থেকেই পয়রা, পয়ড়্যা ও পায়রা। "মান্না" এসেছে হয়তো মান্য থেকে। ধনবান বা ধনাঢ্য থেকে এসেছে আঢ্য। পরে আড্ডি। ভুঁইয়া হল ভৌমিকের অপভ্রংশ রূপ। শা এসেছে সাধু বা সাউ থেকে। "সাধু'-র সঙ্গে খাঁ উপাধি যুক্ত হয়ে সাধুখাঁ হয়েছে। 'তা' এসেছে হোতা থেকে। হোমক্রিয়ার পুরোহিত, যার আদি রূপ হোত্রী। যেমন অগ্নিহোত্রী। ভড় শব্দের অর্থ মালবাহী বড়ো নৌকা বা বার্জ। আবার ভড় হচ্ছে প্রাচীন গৌড়ের একটি অঞ্চলের নাম। কারও কারও মতে, "ভড়" এসেছে ভদ্র থেকে। ঢোল পদবিধারীরা ছিলেন আসলে সান্যাল। এঁদের যৌথ পরিবারটি ছিল বিশাল। প্রায় দুশো জনের মতো। খাবারের সময় ঢোল বাজিয়ে সবাইকে ডাকা হত। অন্য পরিবার থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্যই এঁদের নামকরণ হয় ঢোল-সান্যাল। পরে সান্যাল উঠে শুধু ঢোল হয়ে যায়। কোনো কোনো পরিবার-পরম্পরায় ঢোল উঠে গিয়ে সান্যালও রয়ে গেল। 'লাহা' এসেছে সুবর্ণরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে লাক্ষা চাষ করা থেকে। 'রাহা' বোধ হয় এরই অপভ্রংশ রূপ। 'নাহা'ও তাই। তবে নাহার আর-এক অর্থ ছোটো নদী বা খাল। তা থেকেও নাহা এসে থাকতে পারে।

১৫১০ সালে আনন্দভট্ট রচিত ও ১৯০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত "বল্লালচরিত" নামক বইয়ে হিন্দু সমাজে পদবি প্রচলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে (তথ্যসূত্র : সমাজদর্পণ ১৫ বর্ষ, সংখ্যা ১২ ; জুন ১৯৯৯)। ওই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, গৌড়ের বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালসেন (১১৫৮-১১৭৯

সাল) নিজ সহধর্মিণী থাকা অবস্থায় অধিক বয়সে পদ্মিনী নাম্নী এক সুন্দরী ডোম নর্তকীকে বিয়ে করেন। এতে দেশজুড়ে রাজার সুনাম বিনষ্ট হয় এবং এ কুকীর্তি নিয়ে প্রজারা সমালোচনা শুরু করে দেন। রাজা এই কলঙ্ক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সকল সম্প্রদায়ের প্রজাদের এক সম্মিলিত ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কিন্তু, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত থাকলেও নমশূদ্র বিপ্রগণ এই ভোজ অনুষ্ঠানে যোগদানে বিরত থাকেন, অর্থাৎ রাজার এই কুকীর্তিকে সমর্থন না করে তারা ভোজসভায় অংশ নেয়নি। রাজা তাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হন এবং নমশূদ্র লোকদের চাকরিচ্যুত করেন। শুধু তাই নয়, রাজা তাদের 'চণ্ডাল' বলে গালাগাল করে নগর-বন্দর থেকে উৎখাতও করে দেন। অন্যদিকে ভোজসভায় অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায়ভুক্তরা রাজার সকল কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দিয়ে রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে যত্নবান হন। রাজাও এসব সম্প্রদায়কে সাহায্য করেন এবং অনেক সম্প্রদায়কে কৌলীন্য বা পদবি দান করেন। এভাবেই বল্লালসেন পদবি-বৈষম্য সৃষ্টি করে হিন্দুসমাজে বিষাক্ত বীজ বপন করেছিল, যা বর্ণভেদকে আরও শক্তিশালী করে। বল্লালসেনের পরবর্তী বংশধর লক্ষ্মণসেনের ভূমিকাও ছিল লজ্জাকর। এই বর্ণভেদ আজও আমাদেরকে দুর্বল করে রেখেছে। সেনরাজারা বাঙালি ছিলেন না। তবুও, পদবি-বৈষম্য সৃষ্টি করে বাঙালিদের শাসন করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। অষ্টম শতকে বাংলাদেশে চরম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার পর গ্রাম সভা ও বিশিষ্ট নাগরিকরা সাধারণ একজনকে সম্রাট পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন, যার নাম 'গোপাল'। কিন্তু এই গোপালের নামের শেষাংশ ধরে রাখার প্রচেষ্টায় উত্তরাধিকাররা ক্রমান্বয়ে সকলেই নামের শেষে গোপাল-এর 'পাল' অংশকে পদবি হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন, পরে তাই ঐতিহাসিক "পাল" বংশের সূত্রপাত ঘটে। বল্লালসেনের আমলে ছত্রিশটি জাত সৃষ্টি করে ছত্রিশটি আলাদা মর্যাদা তৈরি করা হয়েছিল। সমাজে এভাবে ছত্রিশটি প্রধান পদবিরও সৃষ্টি হয় পেশাগুণে। এর পর ৩৬টি জাতে আরও হাজার রকম বিভাজন ঘটে এবং হাজার হাজার পদবির সৃষ্টি হয় বাংলার সমাজে। এই সব হাজার হাজার পদবির উত্তরাধিকারত্ব লাভ করেছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল বাঙালি বৌদ্ধ, বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান। তাই দেখি চৌধুরী, তালুকদার, বিশ্বাস, মজুমদার, খান, মলি, মুন্সি, সরকার, সরদার প্রভৃতি প্রায় সকল পেশাগত সামাজিক পদবি রয়েছে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রায় সমানভাবে। বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান অথবা বৌদ্ধসমাজে পদবি এসেছে বিচিত্রভাবে।

মুসলিমদের কয়েকটি পদবি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। "মির" বা "মীর" শব্দটি এসেছে আরবি থেকে। আরবি শব্দ 'আমীর'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে মীর। সেই অর্থে "মীর" অর্থ দলপতি বা নেতা, প্রধান ব্যক্তি, সরদার ইত্যাদি। জিতে নেয়া বা জয়ী হওয়া অর্থে মীর শব্দের ব্যবহার হত। তরে মীরবংশীয় লোককে সম্ভ্রান্ত এবং সৈয়দ বংশীয়

পদবিধারীর একটি শাখা বলে গবেষকগণ মনে করেন। "মিঞা" মুসলিম উচ্চপদস্থ সামাজিক ব্যক্তিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহৃত সম্ভ্রমসূচক শব্দ। এক অর্থে সকল মুসলমানের পদবিই হচ্ছে মিঞা। অন্যরূপ, বাঙালি হিন্দুর 'মহাশয়'-এর পরিবর্তে বাঙালি মুসলমান "মিয়া" শব্দ ব্যবহার করে থাকে। "সৈয়দ" পদবি মূলত এসেছে নবি-নন্দিনী হজরত ফাতেমা ও হজরত আলির বংশধর থেকে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগের এই বংশের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র না-থাকলেও বাংলাদেশের অনেক মুসলমান পরিবার সৈয়দ বংশ-পদবি ব্যবহার করে নিজেদের সম্ভ্রান্ত ও কুলীন (খানদান?) মুসলমান বলে দাবি করে থাকেন। "শেখ" আরবি থেকে আসা পদবি। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সম্মানসূচক বংশ-পদবি শেখ। যিনি সম্মানিত বৃদ্ধ অথবা যিনি গোত্রপ্রধান, তাকেই বলা হত শেখ। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সরাসরি যাকে বা যাঁদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তিনি বা তার বংশধরও "শেখ" হিসাবে অভিষিক্ত হতেন অথবা শেখ পদবি লাভ করতেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে যারা শেখ পদবি ধারণ করেন, তারা এ রকম ধারণা পোষণ করেন না যে, তারা বা তাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন সৌদি আরব থেকে। "মোল্লা" শব্দের অর্থ মুসলমান পুরোহিত। বস্তুত মসজিদে নামাজ পরিচালনার কারণেও অনেকে মোল্লা উপাধি পেয়েছিল এবং তার পর থেকেই মোল্লা পদবির ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মোল্লা হচ্ছে তুর্কি ও আরবি ভাষার "মোল্লা" থেকে আসা একটি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। অন্য অর্থে মুসলিম পণ্ডিত বা ব্যবস্থাপক বা অধ্যাপক হলেন মোল্লা। পরবর্তীকালে মসজিদে নামাজ পরিচালনাকারীমাত্রই "মোল্লা" নামে অভিহিত হতে থাকে। এখান থেকেই সাধারণত বংশ-পদবি হিসাবে তা ব্যবস্থার হওয়া শুরু হয়। তাঁরা সকল জ্ঞানের জ্ঞানী না-হওয়া সত্ত্বেও মোল্লা পদবি ধারণ করে। সেইজন্য বোধহয় 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের পদবি ব্যবহারের উদ্যোগ খুব বেশি প্রাচীন না হলেও, তাতে কম করে হলেও হাজার বছরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাঙালির বংশ-পদবিগুলির মধ্যে রয়েছে কিছু আঞ্চলিক পদবি, শুধু অঞ্চল থেকেই তার জন্ম ও ব্যবহার। কিছু পদবি আছে একেবারে বাঙালির জাতীয়। সারা বঙ্গ জুড়েই তার প্রসার। কয়েকটি অবশ্য ধর্মীয় পদবি আছে, যা হিন্দু-মুসলমানদের একান্ত নিজস্ব। তবে জনপ্রিয় পদবিগুলির বেশিরভাগই ধর্মনিরপেক্ষ এবং একান্তভাবে বাঙালির সম্পদ। সেই কারণেই সব পদবিধারী মানুষকে সব অঞ্চলে দেখা যায় না। উদাহরণ দিতে পারি — "বেরা", "মাইতি" পদবিধারীগণ সাধারণত মেদিনীপুরে বাসিন্দাদের ভিতর পাওয়া যায়। আবার "পায়রা" "পট্টনায়ক" পদবিধারীরা ওড়িশায়।

হিন্দু হল, মুসলিম হল — এবার বৌদ্ধদের পদবি নিয়ে সামান্য আলোকপাত করে এই আলোচনায় ইতি টানব। বাঙালি বৌদ্ধরা বড়ুয়া (এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ), রাজবংশী,

সিকদা, মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী ও সিংহ পদবি করে থাকে। আরাকানি শাসনামলে আরাকানি পদবিও ব্যবহার করত। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যবহৃত বড়ুয়া পদবিটা শুধু চট্টগ্রামের ও আসাম-ত্রিপুরায় যথাক্রমে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা ব্যবহার করে না, বিশ্বের অনেক অঞ্চলের অনেক সম্প্রদায়ে এ শব্দটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উপরোক্ত পদবিগুলি বৌদ্ধরা ব্যবহার করতে থাকে মূলত ব্রিটিশ শাসনামল থেকে। বৌদ্ধধর্মে কোনো ধরনের বর্ণপ্রথা না-থাকার কারণে বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে শাসনকার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শাসকের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা নিয়ে বা সুযোগসুবিধা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদবি গ্রহণ করেছে, এখনও স্বেচ্ছায় অনেকে পদবি পরিবর্তন করছে।

অন্যদিকে মেয়েরা যেন পদ্মপাত্রে জল, সর্বদাই করছে টলমল। প্রাক-বিবাহে এক পদবি, বিয়ের পরে অন্য পদবি, বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে ফের পিতার পদবি, পুনর্বিবাহে আবার আর-এক নতুন পদবি। যখন নারী যে পাত্রে থাকে, তখন সে সেই রূপ ধারণ করে। এজন্যই কি বিবাহের "পাত্র" চাই? অথচ একদা এমন সময়ও তো ছিল যখন পুরুষরা পদবিধারী হলেও মেয়েরা নয়। বিবাহিত স্ত্রীলোকের নামকে স্বামীর পরিচয়যুক্ত করা সারা ভারতবর্ষে কোথাও কোনোকালেই ছিল না। কে বা কারা যে এসব প্রচলন করল কে জানে! মেয়েদের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হত দাসি, অথবা দেবী। সরলা দাসি, ভগবতী দেবী ইত্যাদি।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন, মানুষের সৃষ্ট এ জাত ও পদবি একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের অনেক দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। এতে হিন্দুসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জাতি-যাতনায় অসংখ্য নিম্নশ্রেণি ও বর্ণের হিন্দুরা ধর্ম ত্যাগ করেছে। একজন মানুষ তার কর্মগুণে স্বীকৃতি লাভ করুক, এটা আজ সকলের প্রত্যাশা হোক। সূর্য ও চাঁদ যেমন ধনী-গরিব-বর্ণ-জাত-নির্বিশেষে সমান আলো বিতরণ করে, তেমনই সকলকে সমান সামাজিক মর্যাদা যেন আমরা দিতে পারি। যেমন ইসকনের দীক্ষা অনুষ্ঠানে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তরা তাদের সবাই সামাজিক পদবি বিসর্জন দিয়ে 'দাস' পদবি গ্রহণ করেন। সকলপ্রকার ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা ভুলে একে অন্যের আপনজনে পরিণত হয়েছে।

সমাজ সামান্য সামান্য করে হলেও বদলাচ্ছে। এখন আর নাপিতের ছেলে নাপিত হয় না, তাঁতির ছেলে তাঁতি হয় না। তারাও এখন উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে তথাকথিত উচ্চবর্ণের একচেটিয়া পেশায় থাবা বসিয়েছে। নাপিতের ছেলে নাপিত না-হয়ে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজার হলেও ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যারা আবার নাপিতের পেশা বেছে নিচ্ছেন, যার আধুনিক নাম বিউটিপার্লার। ধোপার পুত্রকন্যাদের ধোপার পেশা না-করে আইপিএস অফিসার হতে বাধা নেই যেমন, তেমনই উচ্চবংশীয় পুত্রকন্যারা লন্ড্রি ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত হচ্ছেন। ইত্যাদি। এইভাবে সামাজিক মর্যাদার কিছুটা করে পরিবর্তন

হচ্ছে বইকি। পেশাভিত্তিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে সামাজিক মর্যাদা একসময় নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, যাবেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "নামের পদবী" (১৯৩১) প্রবন্ধে বলেছেন - ".....মেয়েরই হোক, পুরুদেরই হোক পদবী মাত্রই বর্জন করবার আমি পক্ষপাতী। ভারতবর্ষে অন্য প্রদেশে তার নজীর আছে..."। বিবেকানন্দ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন - "জাতপাতের কুসংস্কারের সঙ্গে ধর্মপালনের কোনো সম্পর্ক নেই। জাতপাত হল সামাজিক ক্ষমতার অপববহার সৃষ্টি"।

আচ্ছা, আমরা যারা ভারতীয় তাদের পদবি এমন হলে কেমন হত — এই ধরুন, আমার অনির্বাণ ভারত, আপনার নাম সাত্যকী ভারত। ওর নাম কোয়েল ভারত। তার নাম আয়েসা ভারত। আমার পাশের পাড়ার প্রতিবেশীর নাম সিরাজুল ভারত, রাজ্জাক ভারত। দেশের পরিচয়ে আমাদের সকলের পরিচয় হোক। থাকবে না বনেদিপনা কিংবা কুলীনপনার দম্ভ, থাকবে না অন্ত্যজদের কুঁকড়ে যাওয়া, ন্যূজ হওয়া। মানুষের পরিচয় শুধুই মানুষ। ভেবে দেখুন তো — সকলেরই ধর্মহীন, জাতপাতহীন একটা পদবি হলে মন্দ হবে কি!

তথ্যসূত্র ঃ (১) ঋগবেদ, (২) মনুসংহিতা, (৩) নিম্নবর্গের ইতিহাস — গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, (৪) প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ সাহিত্য — সুকুমারী ভট্টাচার্য, (৫) আমাদের পদবির ইতিহাস — লোকেশ্বর বসু, (৬) সংস্কৃতির ধর্ম ঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি — নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, (৭) পদবির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস — খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, (৮) হিন্দু জাত-পাত পদবির ভবিষ্যৎ — নীলকণ্ঠ ঘোষাল, (৯) সনাতন ভাবনা ও সংস্কৃতি ব্লগ, (১০) ধম্মইনফো ব্লগ, (১১) সামহোয়্যারইন ব্লগ।

একটি শাস্ত্রীয় ভাষা এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট

"ফটফট করে কেউ ইংরেজি বললে আম-বাঙালি তথা তামাম হিন্দুগণ যেমন তার দিকে সমীহ করে তাকায়, একদা সংস্কৃত ভাষাটিরও ছিল সেইরকম দাপট। সংস্কৃত-বলা পণ্ডিতের কদর ছিল সর্বত্র।"

অনেক পণ্ডিতগণ ঘোষণা দিয়ে থাকেন, প্রাচীন ভারতে মানুষ নাকি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের সমগ্র মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন না। বলতে পারেন না। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে একথা কক্ষনোই মেনে নেওয়া যায় না। ভারত উপমহাদেশে কোনো একটি জাতি কোনো একটি গোষ্ঠীর ভূখণ্ড নয়। ভারতীয় উপমহাদেশ একাধিক জনগোষ্ঠী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিরজাশঙ্কর গুহর বিশ্লেষণ অনুসারে ভারতীয় জনপ্রবাহে ছয় ধরনের স্বতন্ত্র নরগোষ্ঠী আছে— (১) নেগ্রিটো (Negrito), (২) আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid), (৩) মোঙ্গোলীয় (Mongoloid), (৪) ভূমধ্যসাগরীয় (Mrditerranean), (৫) পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড (Western Branchycephals) এবং (৬) নর্ডিক (Nordic)। এইসব নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করেছে। এইসব নরগোষ্ঠী ইন্দোচিন, ইরাক, ইরান, এশিয়া মাইনর, গ্রিস, বেলুচিস্তান থেকে দলে দলে এসে ভারতে বসবাস করেছে। এরাই আবার আরও নতুন নতুন নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া এই উপমহাদেশে কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ডা গোষ্ঠীর মানবসম্পদও ছিল। এদের কারোরই এক এবং অদ্বিতীয় ভাষা ছিল না। কেউ একই ভাষাতে কথা বলতেন না। যত গোষ্ঠী তত ভাষা — ততই উপভাষা। এইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ১৬৫২ টি মাতৃভাষা, ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ১৫৭৬টি মাতৃভাষায় কথা

বলেন। হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতায় অসংখ্য ভাষার জন্ম হয়েছে, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাবালক হয়েছে। আবার চর্চার অভাবে অসংখ্য মাতৃভাষার অকালমৃত্যুও হয়ে গেছে। সংস্কৃত ভাষা মানুষের মুখের ভাষা নয়, দেবতাদের মুখ-নিঃসৃত ভাষাও নয় — তাই এটি দেবভাষাও নয়। সংস্কৃত ভাষা অখণ্ড ভারতবাসীর আদি ভাষা নয়। সংস্কৃত বহিরাগতদের সৃষ্ট একটি কৃত্রিম বা বানানো ভাষা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। আঁতুরঘর ভারতীয় হলেও সাবালকত্ব লাভ আর্য দ্বারা পুষ্ট হয়ে। সংস্কৃত ছিল এই প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক সাহিত্যিক ভাষা মাত্র। বলা যায়, সংস্কৃত ভাষার আদি রূপ ছান্দস ভাষা, যে ভাষায় বেদ রচিত হয়। পতঞ্জলির কথিত শিষ্ট বা ব্রাহ্মণ্য সমাজে এর প্রচলন থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে যে এর কোনোই ব্যবহার ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তাই আমরা দেখতে পাই যে, এটি মুখের ভাষা ছিল না বলেই গত আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এর বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষা কোনো জাতির মুখের ভাষা নয় — মায়ের মুখের ভাষা, মানে মাতৃভাষা নয়। সংস্কৃত মানে সংস্কার। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি আর্যদের বৈদিক ভাষার সংস্কারসাধন করেন। এই সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষাই পরবর্তীতে সংস্কৃত ভাষা। ব্রাহ্মণগণ ধর্মীয় অনুশাসন রচনা করতেই এই ভাষাকে মাধ্যম করেন। এমন এক ভাষা, যে ভাষা ছাড়া কেউ বুঝবেন না। এই ভাষাচর্চার একমাত্র অধিকারী ছিলেন ব্রাহ্মণরাই, তবে ক্ষত্রিয়গণও সেই অধিকারের প্রসাদ একটু-আধটু পেতেন। আর বাকিরা চর্চা তো দূরের কথা, লুকিয়ে শুনলেই কানে গরম সিসা ঢেলে দেওয়ার বিধান ছিল। বর্তমান ভারতের উত্তরাখণ্ড নামক রাজ্যের মাত্র ০.০১ কোটি মানুষ এহেন বিলুপ্ত-প্রায় ভাষা সংস্কৃতে কথা বলেন। সবদিক বিচার করে আমি মনে করি, ভাষা মোটামুটি দুই ধরনের হতে পারে - একটি কৃত্রিম, অন্যটি স্বাভাবিক বা মুখের ভাষা। কৃত্রিম ভাষাগুলি হল সংস্কৃত, লাতিন, হিব্রু, ব্রজবুলি, এস্পেরান্তো (কৃত্রিম ভাষা তৈরির কথা বলেছিলেন দার্শনিক রেনে দেকার্ত, ফ্রান্সিস বেকন, জন উইলকিন্স। উনিশ শতকে জোহান মার্টিন শ্লেইয়ার 'ভোলাপুক' নামে একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন। সেই সূত্র ধরেই ১৮৮৭ সালে পোল্যান্ডের চক্ষুচিকিৎসক এল.এল. জামেনহফ একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন। রুশ ভাষায় তিনি যে প্রস্তাবটি লেখেন সেখানে তিনি ব্যবহার করেন ছদ্মনাম Doktoro Esperanto, যার অর্থ Doctor Hopeful। এই নাম থেকেই তাঁর প্রস্তাবিত নতুন কৃত্রিম ভাষার নাম হয় 'এস্পেরান্তো'। বর্তমান পৃথিবীতে কুড়ি লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে পারে, যার মধ্যে প্রায় ১০০০ মানুষের মাতৃভাষা 'এসপেরান্তো'। একই সঙ্গে এটাও বলা দরকার, এস্পেরান্তো ভাষাকে সংস্কার (সংস্কৃত) করতে চেয়ে আরও বেশ কয়েকটি কৃত্রিম ভাষার জন্ম হয়েছিল। যেমন - Ido, Occidental, Novial, Interglosa বা Glosa, Interlingua ইত্যাদি। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ওটো ইয়েসপারসনের চিন্তার ফসল ছিল Novial কৃত্রিম ভাষা, যেটি আবার গড়ে উঠেছিল

Esperanto, Ido ও Occidental-এর নানান বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে। কিন্তু এই ভাষাগুলি কোনোটাই ছাপ ফেলতে পারেনি জনমানসে এবং দ্রুতই হারিয়ে যায়। তেমনই কর্ণাটকের সিমোসা জেলায় সাত্তুরে, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার মোহাদ, মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার পটিয়াতে, রাজস্থানের বুন্দি জেলার কাপেরনে, রাজস্থানের বাঁশওয়ারা জেলায় খাডা এবং গানোডায়, উত্তর প্রদেশের বাগপাট জেলায় বাওয়ালিতে, ওড়িশার কেন্দুঝড় জেলায় শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম সহ আরও কিছু প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন গ্রামে প্রায় ১৪ হাজার ১৩৫ জন (ভারতের ২০০১ আদমশুমারি অনুযায়ী) মানুষদের মাতৃভাষা সংস্কৃত। যদিও ২০১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা নির্দিষ্ট হয়েছে। "Sudharma" নামে সংস্কৃতে একটি দৈনিক সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয় শুনেছি), নিউট্রাল, নোবিতল ইত্যাদি — এর সবকটিই ক্ষয়িষ্ণু বা মৃত ভাষা। আমি মনে করি স্বাভাবিক ভাষাগুলি হল বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালাম, হিন্দি, শবর, করফু, খড়িয়া, মুণ্ডারি, সাঁওতালি, ভোজপুরি, মৈথিলি ইত্যাদি — এই সবকটি ভাষাই চলমান বা জীবন্ত ভাষা। এই ভাষাগুলি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উন্নত হয়েছে এবং হচ্ছে। ভাষার কোনো ফাদার-মাদার নেই। ছেলেপুলেও নেই। থাকতে পারে না। পণ্ডিতগণ বললেন বাংলা-হিন্দি-ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাগুলি নাকি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বংশের নব্য ভাষা। নব্য ভাষা? বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া, মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষাগুলি নব্য ভাষা? মোটেই নব্য নয়, ভারতে সংস্কৃত এবং উর্দু ছাড়া সবই প্রাচীন ভাষা। অপরদিকে সংস্কৃত এবং পরে উর্দু ভাষাই নব্য ভাষা। এই ভাষাগুলি তৈরি করা হয়েছে, কৃত্রিমভাবে। স্বাভাবিক ভাষাগুলি থেকে বেছে বেছে শব্দ চয়ন করে এই ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। "ধৃতরাষ্ট্র" নামটা শব্দ হিসাবে মারাঠি হলেও ওড়িয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে ব্যক্তিনাম হিসাবে খুবই প্রচলন আছে। প্রচলন আছে নাম হিসাবে, শব্দ হিসাবে নয়। শব্দটির বিশিষ্টার্থ হচ্ছে — জন্মের পর থেকে যে অন্ধ বা জন্মান্ধ। অন্য কোনো অর্থ শব্দটির নেই। শব্দটি এক্কেবারেই সংস্কৃত নয়, মারাঠি। নির্ভেজাল মারাঠি শব্দ শকুনি, শূর্পনখা, হিড়িম্বা — সংস্কৃত বেমালুম গিলে খেয়েছে। "প্রজাপতি" শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রচলন আছে। বাচ্যার্থে নয়, প্রচলন আছে বিশিষ্টার্থে। "প্রজাপতি" শব্দটি গুজরাটি ভাষাতেও প্রচলন আছে। প্রচলন আছে রাজস্থানের বাগড়ি ভাষাতেও। "রামায়ণ", "মহাভারত" শব্দ-দুটি মূলত মারাঠি হলেও অর্থবহ শব্দ হিসাবে মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার প্রচলন আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। মারাঠি ভাষায় "মহাভারত" শব্দের অর্থ "খুব ধুমধাম"। মারাঠি "রামায়ণ"-এর অর্থ "বিরক্তিকর গল্প" (Tedious Yarn)। আসলে মারাঠি ও গুজরাটি ছাড়া আর কোনো ভাষায় নাম দুটোর কোনো ব্যঞ্জনা নেই, তাৎপর্যও নেই। খাঁটি বাংলা শব্দ যেমন সংস্কৃত ভাষাটিতে প্রবেশ করানো হয়েছে, তেমনই খুব সুচারুভাবে খাঁটি ওড়িয়া, খাঁটি মারাঠি, খাঁটি গুজরাটি, খাঁটি হিন্দিও। বাকি

নেই ইংরেজি সহ অন্যান্য বিদেশি ভাষাও। জার্মান, পোর্তুগিজ, বুলগেরীয়, লাতিন, গ্রিক, আরবি, ফারসি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার শব্দও সংস্কৃত ভাষায় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পণ্ডিতি কৌশলে কোথাও শব্দগুলির অর্থ পালটে, কোথাও-বা একই অর্থ বহাল রাখা হয়েছে। হাজার হাজার কিসিমের ভাষার শব্দ গুঁজে গুঁজে দেবভাষার কলেবর।

ঋগবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ — এগুলিও মারাঠি শব্দ। অথর্ববেদ-এর 'অথর্ব' অংশটির যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরুক্ত নামক শব্দব্যুৎপত্তি তত্ত্বের বইয়ে দেওয়া আছে, তা থেকে বোঝা যায় 'অথর্ব' অংশটি খাঁটি বাংলা ভাষা। মারাঠি সামবেদ শব্দটির অর্থ 'একটি মারাঠি উপভাষা'। পর্জন্য, উপনিষদ শব্দটিও খাঁটি মারাঠি। সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষ করে বেদগুলিতে এত মারাঠি শব্দের ছড়াছড়ি কেন! কেন তার উত্তর অবশ্যই পাওয়া যায় একটু চোখ-কান খোলা রাখলে। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে হিন্দুত্ববাদের উন্মাদনা দেখলেই বোঝা যায় তথাকথিত সনাতন ধর্মের আঁতুরঘর এই রাজ্য-দুটি। সারা দেশের কোনো রাজ্যে এমন উন্মাদনা একদমই দেখা যায় না।

অন্যদিকে বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া, মারাঠি, গুজরাটি ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে আদানপ্রদানের মাধ্যমে। লক্ষ করুন বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া ভাষাগুলির মধ্যে উচ্চারণগত, অর্থগত এমনকি বর্ণগত বিরাট সাদৃশ্য। বৃহৎ বঙ্গের সময়কালে এই তিনটি রাজ্যের নৈকট্যই এহেন সাদৃশ্যের কারণ। একইরকমভাবে তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালাম — এই দক্ষিণী ভাষাগুলিও ব্যাপক সমৃদ্ধ। এদের ভাষাতেও উচ্চারণগত-অর্থগত-বর্ণগত একে-অপরের প্রচুর সাদৃশ্য। মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ভাষাগুলির মধ্যে উচ্চারণগত-অর্থগত-বর্ণগত একে-অপরের প্রচুর মিল। সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আদানপ্রদান-সংমিশ্রণের ফলেই এই সাদৃশ্য। এগুলি সন্দেহাতীতভাবে জীবন্ত ভাষা, তাই এখনও সেই প্রক্রিয়া সমানে চলছে। ভাষাগুলি তিল তিল করে প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে সংস্কৃত "ভাষা-নির্মাণ-চক্র" অনেকদিন হল নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। যাঁরা সংস্কৃত ভাষাটি তৈরি করেছিলেন তাঁরা এখন আর জীবিত নেই। কারখানার মালিক নেই, কারখানার শ্রমিক নেই, উৎপাদন নেই, উৎপাদনের উন্নয়নও নেই। সেই কারণে ভাষাটিও রুদ্ধ হয়ে গেছে। নতুন করে আর কোনো সংযোজন হয় না। স্থবির হয়ে শুধু মন্ত্রশাস্ত্রেই বেঁচে থাকা ভট্ট-কোরামিনের দৌলতে। বহিরাগতরা বহিরাগতদের প্রয়োজনে এবং সংস্কারের প্রয়োজনেই সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি করেছিল, ধর্মতত্ত্ব এবং শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেও। তাই আমরা সংস্কৃত যুগ বলে একটি পৃথক যুগ কল্পনা করতে পারি না। প্রাকৃতের পূর্বে ছিল প্রাচীন প্রাকৃত। যা ছিল মূলত অনার্য প্রভাবজাত। প্রাচীন ভারত বলতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ-সংবলিত একটি সুবৃহৎ ভূখণ্ড (প্রাচীনকালের মানুষ এই অখণ্ড ভারত ভূখণ্ডকেই তো সমগ্র পৃথিবীরূপে কল্পনা করতেন)। শতশত স্বতন্ত্র দেশের শতশত স্বতন্ত্র শাসক ছিল, কোনো কেন্দ্রীয় শাসক বা নিয়ন্ত্রক ছিল না। বহিরাগতদের একটি গোষ্ঠী যাঁরা ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত, তাঁরা তাঁদের এবং

শাসক তথা ক্ষত্রিয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সংস্কৃত ভাষাকে দেবতাদের মুখের ভাষা বলে প্রচার করতে শুরু করেছিল। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ এবং রাজাগণ ঈশ্বরেরই নামান্তর সেটারও প্রচার চলল। ওঁরা তো "মনুসংহিতা"-টা এমনি-এমনি লেখেননি! পড়ে দেখুন - (১) "উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যেষ্ঠ্যাদব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ। / সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।" (১/৯৩) অর্থাৎ, "(ব্রহ্মার) উত্তমাঙ্গ বা মুখ থেকে উৎপন্ন বলে (বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে) জ্যেষ্ঠ বলে বেদ ধারণ হেতু ধর্মত ব্রাহ্মণ এই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু।" (২) "উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী। /স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" (১/৯৮) অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণের দেহই ধর্মের সনাতন মূর্তি। তিনি ধর্মের জন্য জাত এবং মোক্ষলাভের যোগ্য পাত্র।" (৩) "স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙক্তে স্বয়ং বস্তে স্বয়ং দদাতি চ।/আনৃশংস্যাদব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ।" (১/১০১) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নিজের অন্নই ভক্ষণ করেন, নিজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্য দান করেন। অন্য লোকেরা যা ভোগ করে, তা ব্রাহ্মণের দয়া হেতু করে।" এবার দেখি রাজাদের স্থান কোথায়? (১) "অরাজকে হি লোকেঽস্মিন সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।/রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।।/ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।/চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ।।" (৭/৩-৪) অর্থাৎ, "রাজশূন্য এই জগতে চারদিকে ভয়ে (সকলে) প্রচলিত হলে এই সমগ্র (চরাচর জগতের) রক্ষার জন্য ঈশ্বর ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবেরের শাশ্বত অংশ গ্রহণ করে রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন"। অর্থাৎ রাজাও যা, ঈশ্বরও তাই। রাজা মানুষ নয়, মানুষের ঊর্ধ্বে। এহেন ব্রাহ্মণগণ ও রাজাগণ যে কীভাবে অবশিষ্ট বর্ণদের সম্মোহন করে ফেলেছিল, তা বোধহয় আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। অতএব, "এক দেশ, এক ভাষা" কৌশল অবলম্বন করতে চাইল। সবাই যাতে ঈশ্বরের ভাষাকে ধ্রুপদ ভাষা ভেবে সমীহ করে সেজন্য এক শ্রেণির ভাষাতত্ত্ববিদ আসরে নেমে পড়লেন। বললেন—সংস্কৃত হল একটি ঐতিহাসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দেবভাষা। বর্তমানে সংস্কৃত ভারতের ২২টি সরকারি ভাষার অন্যতম এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা। যেমন এখনকার রাজারা হিন্দি ভাষাকে 'এক দেশ, এক ভাষা' হিন্দি করতে চান। চক্রান্ত জারি আছে। হিন্দি আগ্রাসন চলছে ফল্গুনদীর ধারার মতো।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত পাণিনির ব্যাকরণে সংস্কৃত ভাষার প্রামাণ্যরূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে লাতিন বা প্রাচীন গ্রিক ভাষার যে স্থান, বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষার সেই স্থান। ভারতীয় উপমহাদেশ, বিশেষত ভারত ও নেপালের অধিকাংশ আধুনিক ভাষাই এই ভাষার দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন পণ্ডিতগণ।

সংস্কৃতের প্রাক-ধ্রুপদি রূপটি বৈদিক সংস্কৃত নামে পরিচিত। এই ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা এবং সংস্কৃতের প্রাচীনতম রূপ। এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শনটি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ রচিত। এই কারণে ঋগ্বৈদিক সংস্কৃত হল প্রাচীনতম ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলির

অন্যতম এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের (ইংরেজি ও অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা যে পরিবারের সদস্য) আদিতম সদস্য ভাষাগুলির অন্যতম।

ভাষাটিকে ব্যাখা করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ আরও বলেন — সংস্কৃত ক্রিয়াবিশেষণ 'সংস্কৃত' কথাটির আক্ষরিক অর্থ "সংযুক্ত করা", "উন্নত ও সম্পূর্ণ আকারপ্রাপ্ত", "পরিমার্জিত" বা "সুপ্রসারিত"। শব্দটি 'সংস্কার' ধাতু থেকে উৎসারিত; যার অর্থ "সংযুক্ত করা, রচনা করা, ব্যবস্থাপনা করা ও প্রস্তুত করা"। 'সং' শব্দের অর্থ "সমরূপ" এবং "(স্)কার" শব্দের অর্থ "প্রস্তুত করা"। এই ভাষাটিকে সংস্কৃত বা পরিমার্জিত ভাষা মনে করা হয়। এই কারণে এই ভাষা একটি "পবিত্র" ও "অভিজাত" ভাষা। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত উদ্দেশ্য লোকপ্রচলিত প্রাকৃত (প্রাকৃতিক, শিল্পগুণবর্জিত, স্বাভাবিক ও সাধারণ) ভাষার পরিবর্তে এই ভাষা ব্যবহৃত হত। এই ভাষাকে "দেবভাষা" বলা হত; কারণ প্রচলিত মিথ অনুযায়ী এই ভাষা ছিল "দেবগণ ও উপদেবতাগণের ভাষা"।

তাহলে এই সংস্কৃত ভাষাটার ইতিহাস কী? ইতিহাস তো একটা থাকা উচিত, তাই না? আছে বইকি। পড়ুন, পণ্ডিতগণ কী বলছেন — সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের ইন্দো-ইরানীয় উপপরিবারের সদস্য। এই ভাষার নিকটতম প্রাচীন আত্মীয় হল ইরানীয় আদি পারসিক ও আবেস্তান ভাষাদুটি। বৃহত্তর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন বৈশিষ্ট্যগুলি সাতেম ভাষাসমূহ (বিশেষত স্লাভিক ও বাল্টিক ভাষা) এবং গ্রিক ভাষার অনুরূপ।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে গিয়ে গবেষকগণ একটি অনুপ্রবেশ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বর্তমানে যে ভাষাটি সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে, তার আদি ভাষাভাষীগণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। এই তত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ বাল্টিক ও স্লাভিক ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অ-ইন্দো-ইউরোপীয় ফিনো-আগরিক ভাষাসমূহের সঙ্গে শব্দভাণ্ডার আদানপ্রদান, এবং উদ্ভিদ ও জীবজগতের নামসংক্রান্ত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রামাণ্য শব্দগুলিকে তুলে ধরা হয়।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীনতম প্রামাণ্য (?) রচনা হল হিন্দু ঋগ্বেদ (যদিও শুরুতে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটি রচিত হয়নি, কারণ তখন পর্যন্ত "হিন্দু" শব্দটিরই সৃষ্টি হয়নি, কারণ "হিন্দু" কোনো ধর্মের নাম ছিল না, ছিল একটি জাতির পরিচয় হিসাবেই বিদিত) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্য থেকে শেষভাগের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়কার কোনো লিখিত নথি পাওয়া যায় না। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গ্রন্থের মৌখিক প্রচলনটি বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, এই জাতীয় গ্রন্থগুলির সঠিক উচ্চারণকে ধর্মীয় কারণেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত।

ঋগ্বেদ থেকে পাণিনি (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার বিকাশ লক্ষিত হয় সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে। এই সময় থেকে এই ভাষার মর্যাদা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, এবং এর সঠিক উচ্চারণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি এই ভাষার বিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সঠিক উচ্চারণ কি সম্ভব? নমুনা দেখুন—

"তত্র বীরভটপটলোত্তরঙ্গতুরঙ্গকুঞ্জরমকরভীষণসকলরিপুগণকটকজলনিধিমথনমন্দরায়মাণসমু-দ্দণ্ডভুজদণ্ডঃ, পুরংদরপুরাংগণবনবিহরণপরায়ণগীর্বাণতরুগণিকাগণজেগীয়মানয়াতিমানয়া শরদিন্দুকুন্দঘনসারনীহারহারমৃণালমরালসুরগজনীরক্ষীরগিরিশাট্টহাসকৈলাশকাশমূর্ত্যা-রচিতদিগন্তরালপূর্ত্যাকীর্ত্যাভীতঃ, সরভিতঃ...." (দশকুমারচরিতম্/দণ্ডী/পর্বপীঠিকা/প্রথমোচ্ছ্বাস)।

শুধু দাঁত নয়, হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার জোগাড়! কোনো ভাষা সাবলীল না-হলে প্রাঞ্জল না-হলে সে ভাষার মৃত্যু অনিবার্য। শুধুমাত্র পণ্ডিতদের প্রয়োজনের জন্যই কোনো ভাষা বেঁচে থাকতে পারে না। ভাষা হতে হবে সাধারণ মানুষের মনের ভাষা, মননের ভাষা, ভাব প্রকাশের ভাষা, চিন্তার ভাষা, আনন্দের ভাষা।

পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী" প্রাচীনতম (?) সংস্কৃত ব্যাকরণ, যা আজও অন্য ভাষার ব্যাকরণ হিসাবে বর্তমান রয়েছে। এটি মূলত একটি প্রামাণ্য ব্যাকরণ। এটি বর্ণনামূলক নয়, নির্দেশমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ। যদিও পাণিনির সময় বেদের কয়েকটি অপ্রচলিত হয়ে পড়া কয়েকটি বাক্যবন্ধের বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

সেযুগে "সংস্কৃত" শব্দটির দ্বারা অন্যান্য ভাষা থেকে পৃথক একটি ভাষাকে বোঝাত না, বরং বোঝাত একটি পরিমার্জিত রীতিকে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত উচ্চসমাজে স্থান পাওয়া যেত। সাধারণত উচ্চবর্ণের মধ্যেই পাণিনির ব্যাকরণ তথা সংস্কৃত ভাষার চর্চা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ছিল বিদ্যাচর্চার ভাষা। লোকসাধারণে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও সমাজে প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য, কথ্য প্রাকৃত ভাষা থেকেই পরবর্তীকালের আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

এত কিছুর পরেও প্রায় শ্মশানযাত্রা! কথ্য সংস্কৃত সংক্রান্ত একাধিক সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা যায়, কথ্য (যতটা-না কথ্য, তার চেয়ে বেশি লেখ্য, তাই না?) সংস্কৃত সীমাবদ্ধ এবং এর বিবর্তন ঘটে না। ২০০১ সালে সমাজবৈজ্ঞানিক পোলক এক জার্নালে লিখেছেন — "Both died slowly, and earliest as a vehicle of literary expression, while much longer retaining significance for learned discourse with its universalist claims. Both were subject to priodic renewals or forced rebirths, sometimes in connection with a politics of translocal aspiration... At the same time... both came to be ever more exclusively associated

with narrow forms of religion and priestcraft, despite centuries of a secular aesthetic."

বেদের বেদি বানিয়ে ভারতবাসীদের চার ভাগে করা হল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — এই চারটি ভাগে বিভক্ত করে বলা হল, কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের অবশ্য-কর্তব্য হল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। এই অধিকার থেকে বাকিদের বঞ্চিত করা হল। কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হল শাস্ত্রপাঠ, যা সংস্কৃতে রচিত। সফট টার্গেট করা হল অশিক্ষিত, কুৎসিত-দর্শন তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রদের। পরবর্তীতে সময়ের ব্যবধানে 'পুরাণ' রচনা করিয়ে এই এদেরকেই চিহ্নিত করে দেওয়া হল অসুর, দৈত্য, রাক্ষস ইত্যাদি পরিচয়ে, অতএব এরা নিধনযোগ্য। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা যেহেতু একমাত্র ব্রাহ্মণদের অধিকার, সেই কারণে সংস্কৃত শিক্ষা, সংস্কৃত চর্চা মায় সংস্কৃত অভিসম্পাতের অধিকার ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কুক্ষিগত হয়ে থাকল। কথায় কথায় ক্রোধ, কথায় কথায় অভিশাপ — তাঁদের খুশি করতে পারলে আশীর্বাদও মিলত, আর তা দেওয়া হত সংস্কৃত ভাষাতেই। ফলে সংস্কৃত ভাষা বহিরাগত বা আর্যদের তৈরি করা ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মণদের সম্পত্তিতে পর্যবসিত হল। সংস্কৃত ভাষাকে মহিমান্বিত করতে প্রথমে "ব্যাস" গোষ্ঠী এবং তারও পরে অন্যরাও আসরে নেমে পড়লেন। রামায়ণ-মহাভারত-মনুসংহিতা যেমন লেখা হয়েছে, তেমনই লেখা হল ১৮টি মহাপুরাণ এবং ১৮টি উপপুরাণও। এর পিছন পিছন সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে এলেন কৌটিল্য-চাণক্য, কালিদাস, অভিনন্দ, রত্নাকর, পাণিনি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি, ভোজ, ভরদ্বাজ, হলায়ুধ, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধভট্ট, রুদ্রধর, পশুপতি, বাৎস্যায়ন, কোক্কাচার্য, জ্যোতির্মল্ল, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ অসংখ্য সংস্কৃত-পালক। এরা প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ এবং কোনো-না-কোনো রাজার তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাজাকে খুশি করতে এই দুর্বোধ্য সংস্কৃত-ভাষাচর্চা করতেন। সংস্কৃত তাই শুধু ব্রাহ্মণদেরই ভাষা, সাধারণের ভাষা নয়। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই ভাষা কঠোরতার সঙ্গে চর্চা চলত। চর্চা বলতে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষা এবং সারা পৃথিবীর বাছা বাছা ভাষা থেকে শব্দ আত্মসাৎ করে সংস্কৃত ভাষাকে সৃষ্টি, পরিপূর্ণতা দেওয়া এবং সমৃদ্ধ করা। সেই কারণেই সংস্কৃত ভাষার ভিতর পৃথিবীর সব ভাষারই উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ভাষাটির শব্দরূপের কিছুটা লাতিন, কিছুটা মারাঠি, কিছুটা গুজরাটি, কিছুটা লিথুয়ানীয়। সেই 'আত্মসাৎ' ব্যাপারটাকে আড়াল করতেই পণ্ডিতগণ বলতে থাকেন সংস্কৃত ভাষা ভারতের সব ভাষার জননী, কেউ কেউ আবার এককাঠি উপরে উঠে বলেন সংস্কৃত পৃথিবীর সব ভাষার জননী।

দেবী দুর্গা বা কাত্যায়নীর যা কিছু শক্তি বা যা-কিছু বাগাড়ম্বর-লম্ফঝম্ফ সবই ধার করা, সামান্যতমও নিজস্ব নয়। তা সত্ত্বেও দেবী দুর্গা ভক্তি সহকারে পূজিত হন, তেমনিভাবে কাত্যায়নীর প্রতিরূপ সংস্কৃত ভাষা সকলের জননী সেজে পূজিত হয়। এ ব্যাপারে পরে

আরও বিস্তারিত আলোচনা করব সম্ভব হলে। একদা যে অধ্যবসায় নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাচর্চা চলত, তা পরবর্তীতে সেই অধ্যবসায়ের অভাবে হারিয়ে ভোঁ! সংস্কৃত এখন শুধুমাত্র বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পুজো-পার্বণের মন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যগুলি যদি ব্রাহ্মণগণ রচনা করতে প্রয়াসী না হত তাহলে সংস্কৃত ভাষাটির কথা কেউ জানতেই পারতেন না। সংস্কৃত ভাষা কোনোদিন সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। সংস্কৃত ভাষাকে সম্বল করে দাপটের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম হল ভারতের মাটিতে। উপরন্তু সংস্কৃত ভাষাটিকে আঁকড়ে ধরে টিকে আছে হিন্দুধর্ম, ওই সংস্কৃত ভাষা ও মাহাত্ম্যের মধ্যেই হিন্দুধর্মের প্রাণভোমরায় জিয়নকাঠি-মরণকাঠি। একসময় যা কায়েম হল, কালের বিবর্তনে তা রক্ষা করা সম্ভব হল না। শাসক ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ মুখ থুবড়ে পড়ল বিদেশি শাসক মুসলিম (সুলতান, মোগল, পাঠান ইত্যাদি), মোঙ্গল, শক, হুন, ফরাসি, ব্রিটিশদের সামনে। অবশ্য পরে এই ব্রিটিশরাই ব্রাহ্মণদের উদ্ধারকার্যে নেমেছিলেন নানাভাবে, নানা কৌশলে।

যা বলছিলাম, কিছুদিনের মধ্যে সংস্কৃতের সেই সম্মোহনী জাদু চলে গেল। অর্ধমৃত হল ব্রাহ্মণ্যনীতি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ, আর চিরকালের মতো কোমাচ্ছন্ন হল সংস্কৃত ভাষা। এখন আমরা যেই ব্রাহ্মণদের আমাদের চারপাশে দেখি যাঁরা পৈতে ঝুলিয়ে এ-বাড়ি ও বাড়ি দৌড়ে বেড়ায় তাঁদের বেশিরভাগই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নয়, এরা এক-একটা হাঁসজারু বা বকচ্ছপ। এরা না-জানে সংস্কৃত, না-জানে সংস্কৃতি।

এই হল আমাদের শিকড়, শিকড়ের সংস্কৃত, শিকড়ের সংস্কৃতি।

যেভাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে অস্বীকার করে সংস্কৃত ভাষা আমাদেরকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল, ঠিক সেইভাবেই সংস্কৃত ভাষাকে ধুয়েমুছে ইংরেজি ভাষাও ৩০০ বছরের ব্রিটিশশাসনে সুপোক্তভাবে কায়েম হয়ে আছে। পার্থক্য একটাই, ইংরেজি ভাষা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, তাই কাজের ভাষা হয়ে উঠল। সংস্কৃত ভাষা শুধুই মন্ত্রের ভাষা হয়ে থাকল, যা ব্যাবহারিক জীবনে কোনো কাজে আসে না। যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ নেই তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

ফটফট করে কেউ ইংরেজি বললে আম-বাঙালি তথা তামাম হিন্দুগণ যেমন তার দিকে সমীহ করে তাকায়, একদা সংস্কৃত ভাষাটিরও ছিল সেইরকম দাপট। সংস্কৃত-বলা পণ্ডিতের কদর ছিল সর্বত্র। অবশ্য সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার মাঝখানের এক দীর্ঘ সময়ে আরবি ও ফারসি ভাষার কদর হয়েছিল মুসলিম-আগ্রাসনের ফলে। ব্রিটিশরা ভারতে উপনিবেশ করতে এসে সংস্কৃত চর্চা শেষ, আরবি-ফারসি শেষ — চর্চা চলল শুধুই ইংরেজি ভাষার। আজও নিদারুণভাবে অব্যাহত। একটা ধন্য ধন্য ব্যাপার!

আমি কর্মসূত্রে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠান

উচ্চমাধ্যমিক সহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের সংস্কৃত সহায়ক বই প্রকাশ করেন বলে সেখান থেকে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা হল, সেটি বলি — পাঁচজন সংস্কৃত শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় দিয়ে বলা হল, অধ্যায়টি নমুনা হিসাবে প্রশ্নোত্তর লিখে জমা দিন। যাঁর পাণ্ডুলিপি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হবে তিনিই সম্পূর্ণ সহায়ক বইটি লিখবেন। দিন সাতেকের মধ্যে পাঁচজনের পাঁচটি পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে গেল। পাণ্ডুলিপিগুলি নিরীক্ষণ করতে গিয়ে উলটে পড়ার জোগাড়! ঢপের পণ্ডিত সব! পাঁচজনের পাঁচরকম অর্থের অধ্যায়। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ভিন্ন, শব্দার্থ ভিন্ন, ব্যুৎপত্তি ভিন্ন, কারকবিভক্তি ভিন্ন, ব্যাসবাক্যসহ সমাস ভিন্ন। ওরেব্বাস! এই সব শিক্ষকেরা কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকতা করছেন।

তবে এটা ঠিক, সংস্কৃত পড়াতে সংস্কৃত জানার প্রয়োজন নেই। এমনকি পড়তেও সংস্কৃত জানার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষায় পূর্ণমান পেতে শুধু ভালোভাবে মুখস্থ করে গেলেই হবে। কখনও কোনোদিন শুনেছেন নাকি কোনো ভাষার পরীক্ষা অন্য কোনো ভাষায় দেওয়া যায়? আপনি কি কোনোদিন ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা বাংলায় দিয়েছেন? বাংলা ভাষার পরীক্ষা কি হিন্দি বা ইংরেজি ভাষায় দেওয়া যায়? সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষা কিন্তু বাংলা ভাষায় দেওয়া যায়, দিতে হয়। নমুনা পেশ করব? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের নাট্যাংশের একটি প্রশ্ন দেখুন : "নাট্যাংশে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে, তার একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।" পরীক্ষা সংস্কৃত ভাষার, পরীক্ষকের প্রশ্ন বাংলা ভাষায়। উত্তরও অবশ্য খাঁটি বাংলা ভাষাতেই দিতে হয়। এখানেই শেষ নয়, পুরো পরীক্ষাটাই বাংলাটাই দিতে হয়, এমনকি বাংলা থেকে সংস্কৃত অথবা ইংরেজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের প্রশ্নও বাংলা অক্ষরের আধারে সংস্কৃত উচ্চারণে। অ্যাঁ? আজ্ঞে হ্যাঁ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮ সালের উচ্চমাধ্যমিকের সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর করো প্রশ্নের (খ) দাগের প্রশ্নটি এখানে তুলে দিলাম উত্তরসহ।

প্রশ্ন ঃ A king named Bindusara was reigning in Pataliputra. A son was born to him. His name was Susima. At that time a Brahmin lived in the city of Champa. He had a daughter who was beautiful and worth looking. The Brahmin went to Pataliputra along with his daughter.

উত্তর ঃ পাটলিপুত্রে বিন্দুসার নাম্না রাজা রাজত্বম্ অকরোৎ। তস্য একঃ পুত্রঃ জাতঃ। তস্য নাম সুসীমঃ আসীৎ। তস্মিমেব কালে চম্পানগর্য্যাং কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ অবসৎ। তস্য একা সুন্দরী দর্শনীয়া কন্যা আসীৎ। ব্রাহ্মণঃ তাং কন্যাং নীত্বা। পাটলিপুত্রং গতবান্।

তো এই হল সংস্কৃত, সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা চর্চা! একাদশ, দ্বাদশ, পার্ট ওয়ান, পার্ট টু, পার্ট থ্রি — এই হল টানা পাঁচ বছরের সংস্কৃত ভাষার অ্যাকাডেমিক চর্চা।

সংস্কৃত এবং ইংরেজি উভয় ভাষার গঠনই কর্তা ক্রিয়া কর্ম — 'কক্রিক আই ইট রাইস' বাংলা ভাষার বাক্যের গঠন অধিকাংশ সময়ই কর্তা কর্ম ক্রিয়া ককক্রি বলা যায়। অর্থাৎ 'আমি ভাত খাই' বাক্য গঠনের এত বড়ো প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও জোর করে বাংলাকে সংস্কৃত অনুগামী বানানোর প্রচেষ্টায় গত ২০০ বছরে কেউই আসলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে মনোনিবেশ করেননি। এখন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্বতন আর্যবাদী ভাষাতাত্ত্বিক যাঁরা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতকে সংযুক্ত করে সেখান থেকে বাংলাকে এনে বাংলাকে বিশাল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার অংশভুক্ত করতে চাইছেন তাদের জন্য দুঃখজনক বাস্তবতা হল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করতে হলে এটা মেনে নিতে হবে ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের তুলনায় প্রাচীন হল বাংলা। কিংবা সংস্কৃত এই উপমহাদেশে এসে বাংলার পূর্বপুরুষ যে ভাষা তার কাছে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। এবং এভাবেই সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত ভাষা।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করার পর তাদের সঙ্গে কিছু মিশনারিও আসতে থাকেন খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁদের স্থানীয় মানুষের ভাষা শেখার প্রয়োজন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তারা সংস্কৃত ভাষা শিখতে গিয়ে লক্ষ করলেন যে সংস্কৃতের সঙ্গে লাতিন ও গ্রিক ভাষার প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তবে ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ও আইনবিদ (jurist) স্যার উইলিয়াম জোনস্ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে সঠিকভাবে উল্লেখ করেন যে, গ্রিক ও লাতিন উভয় ভাষাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ও পরবর্তীকালে প্রায়-মৃত ভাষা সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। পরে জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ ফন্সাঞ্জ বপ ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কর্মকারকের সংস্থানের তুলনার উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক, লাতিন, জার্মান ও ইরানি ভাষার সম্পর্ক দেখান। ডেনমার্কের ভাষাতত্ত্ববিদ রাসমুস রাস্ক ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ভাষার সঙ্গে লাতিন, গ্রিক, স্লাভিক ও বাল্টিক ভাষার মিল দেখান। এরপর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের বড়োজন জ্যাকব গ্রিম ভাষাতত্ত্বের উপর আরও কাজ করেন। ভাষাতত্ত্বের এই ধারায় আরও কাজ করেন অগাস্ট শ্লেইশার, কার্ল ব্রুগম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। ব্যাকরণসর্বস্ব লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির পিছনে যেসব নেপথ্য কারিগর ছিলেন তাঁদের কেউই প্রাচীন যুগের ছিলেন না বলে অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। লাতিন এবং সংস্কৃত এই দুই ভাষাতেই লেখা গ্রন্থগুলি প্রায় সবই উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কেন? কেন আঠারো শতকে একটিও সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায়নি? ছাপাখানা আবিষ্কার হয়নি?

ভারতবর্ষের প্রায়-মৃত ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক ও লাতিন সহ ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার মিলের উপর ভিত্তি করে ইউরোপের পণ্ডিতরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামে ভাষাতত্ত্বের একটি শাখা তৈরি করলেন। একটি তালিকায় বিষয়টি দেখানো হল ঃ

বাংলা — আমি অর্থে সংস্কৃত — অহম, গ্রিক — এগো (ego), লাতিন — এগো(ego),

গথিক — ইক (ik) জার্মান — ইখ (Ich), আবেস্তান বা প্রাচীন ইরানীয় — আযেম (azem) ইংরেজি — আই (I)।

বাংলা — মানব বা মানুষ অর্থে সংস্কৃত — মনু, মানব, মনুষ্য, ডাচ — ম্যান (man), জার্মান — মান (mann), প্রাচীন ইংরেজি — ম্যান ((mann), ইংরেজি — ম্যান (man)।

বাংলা — পিতা, সংস্কৃত — পিতৃ, গ্রিক — পতের (pater), লাতিন — পতের (pater) জার্মান — ফাটার (vater), প্রাচীন ইংরেজি — ফয়েডার (foeder), ইংরেজি — ফাদার (father)।

বাংলা — মাতা বা মা সংস্কৃত মাতৃ, ডাচ — মোয়েডার (moeder), লাতিন — মতের (moter) জার্মান — মুটার (mutter), প্রাচীন ইংরেজি — মোডোর (modor), ইংরেজি — মাদার (mother)।

বাংলা — ভাই বা ভ্রাতা, সংস্কৃত — ভ্রাতৃ, লাতিন — ফ্রাতের (frater) জার্মান — ব্রুডার (bruder) আবেস্তান — ব্রাতার (brater), ইংরেজি — ব্রাদার (brother)।

বাংলা — কন্যা বা দুহিতা, সংস্কৃত — দুহিতৃ, জার্মান — টখটার (tochter) , প্রাচীন ইংরেজি — ডোহটর (dohtor), ইংরেজি — ডটার (daughter)।

বাংলা — এক, সংস্কৃত — এক, আবেস্তান — অয়েব, (aeva) ফারসি — যক, গ্রিক — ওইস (ois) , লাতিন — অয়েকুস (aequu-s), ফরাসি — আঁ (un), ইংরেজি — ওয়ান (one)।

বাংলা — দুই, সংস্কৃত — দ্বি, গ্রিক — দুও (duo), গথিক — টোয়াই (twai), প্রাচীন ইংরেজি — টোয়া (twa), ফরাসি — দো (deux), ইংরেজি — টু (two)।

বাংলা — তিন, সংস্কৃত — ত্রি, গথিক — থ্রেইস (threis), জার্মান — দ্রাই (drei), লাতিন — ত্রেস (tres), ত্রিয়া (tria), গ্রিক — ত্রেইস (treis), ত্রিয়া (tria), ইংরেজি — থ্রি (three)।

বাংলা — ছয়, সংস্কৃত — ষষ্, জার্মান — জেক্স (sechs), লাতিন — সেক্স (sex), গ্রিক — হেক্স (hex), প্রাচীন ইংরেজি — সিয়েক্স (siex), ফরাসি — সিস্ (six), ইংরেজি — সিক্স (six)।

বাংলা — সাত, সংস্কৃত — সপ্ত, গ্রিক — হপ্ত (hapta), জার্মান — জিবেন (sieben), প্রাচীন ইংরেজি — সিয়েফন (seafon), ফরাসি — সেৎ (sept), ইংরেজি — সেভন (seven)।

বাংলা — আট, সংস্কৃত — অষ্ট, জার্মান — আখত (acht)।

বাংলা — নয়, সংস্কৃত — নবম, লাতিন — নভেম (novem), প্রাচীন ইংরেজি — নিগন (nigon), ফরাসি — নফ (neuf), ইংরেজি — নাইন (nine)।

বাংলা — দশ, সংস্কৃত — দশম, জার্মান — সেন (zehn), লাতিন — দেসেম (decem), গ্রিক — দেকা (deka), ফরাসি — দিস (dix), ইংরেজি — টেন (ten)।

বাংলা — শত, সংস্কৃত — শতম, আবেস্তান — সতম, লাতিন — সেন্টাম (centum)।

বাংলা — বিধবা, সংস্কৃত — বিধবা, লাতিন — ভিদুয়া (vidua), ইংরেজি — উইডো (widow)।

বাংলা — বীর, সংস্কৃত — বীর, গ্রিক — হেরস (heros), লাতিন — ভির (vir), ইংরেজি — হিরো (hero)।

বাংলা — সম্মুখস্থ, সংস্কৃত — পুরস্, গ্রিক ও লাতিন — প্রো (pro), জার্মান — ফোর (fore)।

বাংলা — আগুন, সংস্কৃত — অগ্নি, লাতিন — ইগনিস (ignis), ইংরেজি — আগ্নেয় ইগনিঅ্যাস (igneous) এবং প্রজ্বলিত করা বা হওয়া অর্থে ইগনাইট (ignite)।

বাংলা — গোরু, সংস্কৃত — গো বা গৌস্, জার্মান — কু (kuh), ইংরেজি — কাউ (cow)।

বাংলা — দুয়ার বা দরজা, সংস্কৃত — দ্বার, জার্মান — ট্যুর্ (tiir), ইংরেজি — ডুওর (door)। এও বাহ্য।

দেখুন, খাঁটি ইংরেজি শব্দের আদলে কীভাবে বৈদিক শব্দ তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ : advocate = অধিবক্তৃ, ambergris = অম্বর, to ascend = অভিস্কন্দ, crash = ক্রক্ষ, floating = প্লুতি, nave = নভ্য, offer = আভর ইত্যাদি। তথাকথিত বৈদিক সংস্কৃতে খাঁটি ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি।

কৃত্তিবাসের (তখনও ওঝা হননি) বাংলা 'রামায়ণ' এবং কাশীরাম দাসের বাংলা 'মহাভারত' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের তখনও পর্যন্ত জন্ম হয়নি বলে কেউ কেউ মনে করেন। মানে বাপের আগে ছেলে জন্মে গেছে! সেকি !!! দেখে নিই। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের 'শ্রীমদভগবদগীতা' অংশটুকু ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত ছাপা অক্ষরে প্রথম প্রকাশ শুরু হয় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ করা গ্রন্থটির শেষতম খণ্ডটির প্রকাশের সময় ছিল ১৮৫০। অপরদিকে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণের প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। বাকি খণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাহলে কী দাঁড়াল? সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ এবং মহাভারত পূর্ণ কলেবরে প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৫০, ১৮৭৫। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রকাশিত হওয়ার ৪৬ বছর পর সংস্কৃত মহাভারত এবং ৭২ বছর পরে সংস্কৃত রামায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল? কিন্তু কেন? তার কারণ মনে হয় জীবন্ত তথা চলমান ভাষায় লেখা এক ব্যাপার, অন্যদিকে কৃত্রিম ভাষায় লেখা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়! কারণ তখন পর্যন্ত ভাষাটি পণ্ডিতদের সড়োগড়ো হয়নি। ভাষাটি মোটামুটি রপ্ত হওয়ার পর লেখালেখির যজ্ঞ শুরু। সেই সময়ে এক লপ্তে প্রচুর কাব্য, নাটক লেখা শেষ করা হয়েছিল। আর ওগুলি যে অ্যান্টিক, তা বোঝানোর জন্য প্রমাণ হিসাবে প্রত্যেকটি গ্রন্থের দু-চার-পাঁচ পাতা করে পুথিও লিখে রাখা হল। ওই দু-চার-পাঁচ পাতাই সই। কোনো প্রাচীন (?) গ্রন্থেরই পূর্ণাঙ্গ পুথি পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থগুলির পূর্ণ-কলেবর পুথি সত্যিই কি কেউ দেখেছেন? কাঁচা সংস্কৃতে লেখা কঠোপনিষদ রামমোহন রায়ের বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষার তর্জমাসহ ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ ছিল উল্লিখিত কঠোপনিষদ।

তবে এত কর্মকাণ্ডের পর লাভের মধ্যে যা পেলাম, তা হল একটা সুসংগঠিত ব্যাকরণ। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আগে বাংলা ভাষা সহ অন্য কোনো ভাষায়

ব্যাকরণ ছিল না। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ, আরবি-ফারসি এবং অন্যান্য শব্দের পরিমাণ ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এবং মূলত বাংলা ভাষায় মুণ্ডা, দ্রাবিড় ভাষায় শব্দের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। সাঁওতালদের ভাষার শব্দ এবং বাংলা ভাষার শব্দের প্রাচীন উৎস একই। এমন কী, যদিও আমরা আমাদের ব্যাকরণকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি, তবে অদ্যাবধি ভাষাতাত্ত্বিকদের আক্ষেপ বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচিত হয়নি। বাংলা ভাষার গদ্যের উদ্ভবকালে এর গায়ে সংস্কৃত দুহিতার ছাপ লেগে যাওয়ায় আর কেউই আগ্রহী হয়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি। বাংলা ভাষার গঠন এবং সংস্কৃত ভাষার গঠনের ভিন্নতাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে বিভিন্ন শব্দের সাংস্কৃতিক উৎস দেখিয়ে এই প্রবণতার শুরু হয়েছিল।

আমাদের বর্তমান যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রয়েছে তা মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ। এর প্রধান কারণ হল প্রথম দিককার যেসব বাংলা ব্যাকরণগুলি রচিত হয়েছে তার কোনোটিই বাঙালির লিখিত ছিল না। রচয়িতাগণ পাণিনীয় ব্যাকরণিক ধারাকে গ্রহণ করেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, যা বাংলা ভাষার জন্মের অনেক আগে রচিত। সুনীতিকুমার কিংবা ড. মোহম্মদ শহিদুল্লাহও এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সংস্কৃত বৈদিক ভাষা থেকে উদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষা কোনো সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। সংস্কৃতের মতো এর প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণও স্পষ্ট নয়। সংস্কৃত লিপি থেকেও বাংলা লিপির রয়েছে বেশ পার্থক্য। সুতরাং, সংস্কৃত ব্যাকরণকে বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়ায় উচ্চরণসহ বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতের দুহিতা তা এক শ্রেণির ভাষাবিদ তথা পণ্ডিতগণ শুরু থেকেই বলে আসছিলেন। অবশ্য দুষ্টু লোকেরা বলে এই মত প্রচারের অন্তরালে সুগভীর রাজনৈতিক-সামাজিক উদ্দেশ্য ও তজ্জনিত তৎপরতা কাজ করেছে।

পাণিনি সংস্কৃত ভাষাকে সুসংঘবদ্ধ করতে এবং মস্তিষ্কে ধারণ করতে একটি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যা অনস্বীকার্য। যদিও পাণিনির অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের গন্ধ আছে — তা সত্ত্বেও অষ্টাধ্যায়ীর কথা বলা প্রয়োজন। সূত্র ছাড়া যেমন অঙ্ক কষা যায় না, তেমনই ব্যাকরণ ছাড়া ভাষা সংরক্ষণ করা যায় না। সেই মহান তাগিদেই ভারতের প্রথম ভাষাচর্চার ব্যাকরণ রচনা, যা সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ তো বটেই, তবে তা ইংরেজি ভাষায় রচিত হল। তার মানে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা চলছিল প্রায় ৫২ বছর ধরে! ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-র ইংরেজি অনুবাদ। অথচ সংস্কৃত ভাষায় 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। সেকি, এখানেও তো দেখছি বাপের আগে ব্যাটার জন্ম! কী করে হয়? জালিয়াতি! পণ্ডিত এবং ভাষাবিদদের কু-কৌশলে সব ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে গেছে।

লক্ষ করলে বুঝবেন সংস্কৃত পণ্ডিতরা সবাই পুরুষ, নারী নয়। কারণ পণ্ডিতগণ বলছেন, সংস্কৃত ভাষা নারীরা উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাই তারা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতেন। সেকি, পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানেরা তাহলে কীভাবে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত? সংস্কৃত কি পিতৃভাষা, মাতৃভাষা নয়? তা আবার হয় নাকি! নিজের ভাষায় কথা বলতে ব্যাকরণ লাগে নাকি? জিহ্বা আড়ষ্ট থাকে? জন্মের প্রথম দিন থেকে যে ভাষা শুনছি সে ভাষায় উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় কখনও? সংস্কৃত ভাষা সত্যিই যদি প্রাচীনকালে মুখের ভাষা হিসাবে প্রচলিত থাকত, তাহলে ওই ভাষার সব ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা নারীপুরুষনির্বিশেষে সকলের আয়ত্তের মধ্যেই থাকত। কারণ ভাষায় প্রচলিত ধ্বনি-একক যত জটিলই হোক-না-কেন সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের সকলেই উচ্চারণ করতে পারে। ভাষায় প্রচলিত সব ধ্বনি-একক সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের সকলেই শৈশবে শিখে নেয়। তবে আমরা বাঙালিরা মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ উচ্চারণ করার যতই চেষ্টা করি না-কেন, দন্ত্য-ন এবং তালব্য-শ ছাড়া আর কিছুই আমাদের স্বরযন্ত্র থেকে বেরবে না। কারণ ওসব ধ্বনি-একক বাংলায় প্রচলিত নেই। অনুস্বারের উচ্চারণ বাঙালিরা ঙ্ কিংবা ঙ-এর মতোই করবে। গুজরাতি অনুস্বারের উচ্চারণ নকল করে আমরা কেউ 'সিংহ'-কে 'সীঁহ' বলব না। ভাষায় প্রচলিত ধ্বনির উচ্চারণের স্পষ্টতার কথা বিচার করলে বলতেই হয় এ ব্যাপারে নারীজাতির মানুষই পুরুষজাতির থেকে এগিয়ে আছেন। তাদের উচ্চারণ পুরুষজাতির চাইতে অনেক বেশি স্পষ্ট। আর এ কথাটা সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জিহ্বার কিংবা স্বরযন্ত্রের আড়ষ্টতা বা জড়তা পুরুষদের চাইতে মেয়েদের অনেক কম, এটা বলাই বাহল্য। তাহলে মেয়েরা উচ্চারণগত কারণে সংস্কৃত বলতে পারতেন না বা পারেন না এ কথা ধোপে টেকে না।

আমাদের বৃহৎ কলেবরে একটি বাংলা থেকে বাংলা অভিধান আছে। এই বইটি কতজন শিক্ষিত বাঙালির ঘরে পাওয়া যাবে তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ আছে। আর থাকলেও কতজন সেটা খুলে দেখার প্রয়োজন মনে করেন সেটাও ভাবার আছে। আমার আলোচ্য বিষয় এটা নয়—আমার আলোচ্য বিষয় এই বংলা অভিধান অনেকটা অংশ জুড়ে সংস্কৃত শব্দের উপস্থিতি। সেই শব্দগুলি, যা কোনোদিন কখনোই বাঙালিরা লেখেনওনি, বলেনওনি। আগামীদিনেও ব্যবহৃত হবে না। এগুলি জোর করে বাংলা ভাষায় ঢোকানোর কু-প্রয়াস। বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষারই দুহিতা, সেটা প্রমাণ করতেই এত কর্মকাণ্ড। আসুন, কিছু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা থেকে ছেঁকে নিয়ে দেখে নিই ঃ অংশহর = অংশ অপহরণ করে যে, নন্দ্য = আনন্দের যোগ্য, নদ্ধ = বদ্ধ, দদ্রু = চর্মরোগবিশেষ, অলর্ক = ক্ষিপ্ত কুকুর, অলক্ত = আলতা, উৎক = উদ্বিগ্ন, কর্তুকাম = করতে ইচ্ছুক,

সীবন = সেলাই, সিসৃক্ষা = সৃষ্টি করার ইচ্ছা, সক্তু = ছাতু, সংহৃত = সঞ্চিত, রণৎ = শব্দায়মান, পিন্ধা = পরিধান করা, পিত্র্য = পৈতৃক, নিবসন = পরিধেয় বস্ত্র, সঙ্ঘৃষ্ট = বিবদমান, স্থগন = লুকিয়ে রাখা, হর্যক্ষ = সিংহ, রূঢ়ি = উৎপত্তি, শিংশপা = শিশুগাছ, শাতকুম্ভ = সোনা বা স্বর্ণ, শাতন = ছেদন, শ্বাদল = কচি ঘাসে ঢাকা জমি ইত্যাদি এরকম হাজার হাজার শব্দাবলি বাংলা অভিধানে জঙ্গল হয়ে আছে — যা কোনো হোমেও লাগে না, যজ্ঞেও লাগে না। কিন্তু শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে পড়তে সংস্কৃত ভাষার জুড়ি নেই!

সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও ভারতের আরও ২১টি প্রধান ভাষা তো ছিল, যে ভাষাগুলিতে বেশিরভাগ মানুষই ভাব-বিনিময় করে। এখন প্রশ্ন হল মৃত ভাষায় লেখা পুথির সীমাহীন ভাণ্ডার, অথচ জীবন্ত ভাষায় রচিত সাহিত্যের পুথি তেমন একটা পাওয়া যায়নি। কেন? ভাষাবিদগণ নীরব কেন? নাকি শুধুই গড্ডলিকা প্রবাহ! সব পণ্ডিত কি সংস্কৃত ভাষাতেই ছিল। অন্য ভাষাভাষীর মানুষদের মধ্য থেকে একটাও পণ্ডিত পাওয়া গেল না কেন? অথচ লক্ষ করুন, অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীশংকরাচার্য (আদি) যে-কটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার সবকটিই সংস্কৃত ভাষায়, অথচ শ্রীশংকরাচার্য কেরলের এর্নাকুলামের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও একটি গ্রন্থও মাতৃভাষা মালয়ালমে লেখেননি। কেন? অথচ শ্রীশংকরাচার্যের প্রভাবে মালয়ালাম ভাষায় তিনটি সুস্পষ্ট রীতি চোখে পড়বে — (১) সংস্কৃতানুগ, (২) তামিল প্রভাবপুষ্ট, (৩) তামিল প্রভাববর্জিত খাঁটি মালয়ালাম। মালয়ালাম লিপি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতোই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত এবং এই ভাষায় যাবতীয় সংস্কৃত বর্ণমালা প্রচলিত। তাহলে মালয়ালাম ভাষায় কীভাবে সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটল? কেনই-বা ঘটল? সংস্কৃত ভাষা মালয়ালাম ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, নাকি গভীর মুনসিয়ানার সঙ্গে মালয়ালাম ভাষা থেকে বর্ণমালা-শব্দমালা চয়ন করে সংস্কৃত ভাষায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল! আসল ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল আর কি জানা যাবে কোনোদিন?

পরিশেষে স্পষ্ট করে বলতে চাই, সংস্কৃত ভাষাও সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিকদের নিরন্তর চর্চার ফলেই পরিপুষ্ট লাভ করেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। ছান্দস ভাষাই সংস্কৃত ভাষার আতুর ঘর, যে ভাষায় বেদ রচনা করা হয়েছে। পণ্ডিতরা যাই-ই বলুন, সংস্কৃত ভাষা ভারতের আর পাঁচটা ভাষার মতো মানুষের মুখে মুখে সমৃদ্ধ হয়নি, আগেই বলেছি সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত ভাষা সাবালক হয়েছে। পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কারের পর সংস্কৃত ভাষার পরিপূর্ণতা লাভ। অন্য ক্ষেত্রে সমস্ত ভাষাই হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষাগুলি আজও টিকে আছে। বাংলা ভাষাও তেমনি একটা ভাষা, যে ভাষা তিল তিল করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং টিকে আছে। যেসব ভাষা বিবর্তনে শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল সেরকম আবার অনেক ভাষা নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে। যেসব পণ্ডিতগণ বলেন,

সংস্কৃত ভাষা ভারতের মায় পৃথিবীর সব ভাষার জননী। তাঁদের কাছে আমার বিনম্র প্রশ্ন, সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র ভারতের সমগ্র মানুষ কি ভাষাহীন ছিল, বোবা ছিল?

প্রসঙ্গত বলা যায়, ভাষা কখনও ভাষার জন্ম দিতে পারে না। ভাষার কোনো ক্রোমোজম নেই — ভাষার ডিম্বাণু-শুক্রাণু নেই — তাই দেহ-সম্ভোগের মাধ্যমে নতুন ভাষার জন্ম হতে পারে না। ভাষা কয়লার মতো খনিজ পদার্থ নয় যে উপজাত দ্রব্য হিসাবে কয়লা থেকে ন্যাপথলিন, আলকাতরা, ফেনল, স্যাকারিন, বেঞ্জল, পাইরিডিন, পিচের মতো ভাষার জন্ম হবে! ভাষা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে মাত্র। তাই সব ভাষার ভিতর ভাষার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তার মানে এই নয় যে কোনো ভাষা কোনো ভাষার মা, বাবা, জ্যাঠা, মামা, পিসি। ভাষার কখনো মা, বাবা, জ্যাঠা, মামা, পিসি হতে পারে না — ভাষা স্বয়ম্ভু। অর্থাৎ ভাষা স্থানীয়ভাবে ক্রমে ক্রমে অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট লাভ করে। এক-একটা ভাষা এইভাবেই মাথা তুলে দাঁড়ায়, যে ভাষা তা পারে না সেই ভাষা অচিরেই বিলুপ্ত বা প্রায়-বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক শ্রেণির মতলববাজ স্বঘোষিত পণ্ডিত দাবি করেন — (১) সংস্কৃত দেবতার মুখ-নিঃসৃত ভাষা, (২) সংস্কৃত সব ভাষার মা। হাজার বছর ধরে এই মিথ্যা আজ মহামারির আকার নিয়েছে। হায়, আমরা মুখ বুজে মেনে নিলাম বিনা যুদ্ধে! প্রশ্ন করলাম না। সর্বোপরি আমি বলতে চাই, সংস্কৃত ভাষাকে যিনি বা যাঁরাই সৃষ্টি করুন না-কেন তাঁদের প্রণাম। প্রণাম এই কারণে যে, এমন ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ, মধুর মিষ্টি ভাষা পৃথিবীর আর কোনো ভাষাতে পাওয়া যায়! আমি চাই সংস্কৃত আরও প্রচার ও প্রসার হোক চর্চার মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতই হোক ভারতের ভাষা, ভারতীয় ভাষা, জাতীয় ভাষা — কখনোই হিন্দি নয়।

তথ্যসূত্র ঃ (১) Indian Constitution Art.344(1) & Art.345, (২) Sanskrit is second official language in Uttarakhand – The Hindustan Times, (৩) Pollock (2001:415), (৪) বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি — উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, (৫) বাংলা উইকিপিডিয়া, (৬) মিথ্যাময় ইতিবৃত্ত — শ্রীবিবস্বান আর্য, (৭) ভাষার ইতিবৃত্ত — সুকুমার সেন, (৮) ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (৯) ভাষতত্ত্ব — রামেশ্বর শ, (১০) রামায়ণম্ — বাল্মীকি, (১১) মহাভারতম — বেদব্যাস, (১২) ভাষাতত্ত্ব — ডা. রফিকুল ইসলাম, (১৩) তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান — হুমায়ুন আজাদ, (১৪) ভাষাশিক্ষা ও ভাষাবিজ্ঞান পরিচিতি — হুমায়ুন আজাদ (১৫) দশকুমারচরিতম্ — দণ্ডী, (১৬) বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব — নীহাররঞ্জন রায়, (১৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — মাহবুবুল আলম, (১৮) ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার — আতিউর রহমান, (১৯) গুগল।

ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং আমাদের ভারতীয় সমাজ

"যিনি পাপ পঙ্কিল দুরতিক্রম্য মোহপূর্ণ সংসারাবর্ত মুক্ত হয়েছেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। হিন্দুদের বিশ্বাস জাতি দ্বারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ অধিকারী হয় অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হলে ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম কিংবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত হতে হবে। জন্ম নয়, কর্মের দ্বারাই চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ হয়।"

ব্রাহ্মণ কে বা কারা? ব্রাহ্মণ কেন? ব্রাহ্মণ্যবাদই-বা কী?—এরকম হাজারো প্রশ্ন। আমরা সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে "ব্রাহ্মণ" শব্দটির অস্তিত্ব জানতে পারি। একটি বেদের অংশ ব্রাহ্মণ (যা ব্রাহ্মণসাহিত্য হিসাবে পরিচিত), অন্যটি বর্ণাশ্রমের প্রথম সারির বর্ণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হল হিন্দু শ্রুতিশাস্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থরাজি। এগুলি বেদের ভাষ্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলির মূল উপজীব্য যজ্ঞের সঠিক অনুষ্ঠানপদ্ধতি। প্রত্যেকটি বেদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ রয়েছে। ষোড়শ মহাজনপদের সমসাময়িককালে মোট কতগুলি ব্রাহ্মণ প্রচলিত ছিল তা জানা যায় না। মোট ১৯টি পূর্ণাকার ব্রাহ্মণ অদ্যাবধি বিদ্যমান ঃ এগুলির মধ্যে দুটি ঋগ্বেদ, ছয়টি যজুর্বেদ, দশটি সামবেদ ও একটি অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও কয়েকটি সংরক্ষিত খণ্ডগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগুলির আকার বিভিন্ন প্রকারের। শতপথ ব্রাহ্মণ "সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট" গ্রন্থের পাঁচ খণ্ড জুড়ে বিধৃত হয়েছে; আবার বংশ ব্রাহ্মণের দৈর্ঘ্য মাত্র এক পৃষ্ঠা। বেদোত্তর যুগের হিন্দু দর্শন, প্রাক-বেদান্ত সাহিত্য, আইন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ব্যাকরণ (পাণিনি) কর্মযোগ, চতুরাশ্রম প্রথা ইত্যাদির বিকাশে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোনো কোনো ব্রাহ্মণের অংশগুলি বা উপনিষদের মর্যাদাপ্রাপ্ত। ব্রাহ্মণের ভাষা বৈদিক সংস্কৃত থেকে পৃথক। এই ভাষা সংহিতা (বেদের মন্ত্রভাগ) অংশের ভাষার তুলনায় নবীন, তবে এর অধিকাংশই সূত্র সাহিত্যের ভাষার তুলনায় প্রবীণ। ব্রাহ্মণগুলি লৌহযুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব নবম, অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে রচিত। কয়েকটি নবীন ব্রাহ্মণ (যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ) সূত্র সাহিত্যের সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত। ঐতিহাসিকভাবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলির রচনাকাল পরবর্তী বৈদিক যুগের

উপজাতীয় রাজ্যগুলির ষোড়শ মহাজনপদ রূপে উত্তরণের কাল। বৈদিক মন্ত্রের নানাপ্রকারের ব্যাখ্যাসহ বেদের যে অংশে যাগযজ্ঞাদির বিবরণ পাওয়া যায় তাকেই ব্রাহ্মণ সাহিত্য বলে। অন্যভাবে বললে মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের অংশ হল ব্রাহ্মণ (অন্যটি সংহিতা)।

ব্রাহ্মণ শব্দটি 'ব্রহ্মণ' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ গূঢ়শক্তিসম্পন্ন শব্দ। বলবর্ধক এবং আরোগ্যকর মন্ত্রগুলি যাঁরা উচ্চারণ করতেন তাদের ব্রহ্ম বলা হত। ব্রহ্ম-উক্তির যোগফল হল ব্রাহ্মণ সাহিত্য। অর্থাৎ পুরোহিত ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ সংক্রান্ত বিভিন্ন উক্তি যেখানে লিপিবদ্ধ আছে তার নাম ব্রাহ্মণ। কারোর মতে বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এই গ্রন্থ ব্রাহ্মণ সাহিত্য। এবার চতুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলি জেনে নিতে পারি — (১) ঋগ্বেদের ঐতরেয় এবং কৌষিতকী (বা সাংখ্যায়ন) ব্রাহ্মণ, (২) সামবেদের পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ, সামবিধান, আর্ষেয়, দৈবত, ছান্দোগ্য, সংহিতোপনিষৎ, বংশ, শাট্যায়ন, জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ, (৩) কৃষ্ণযজুর্বেদে তৈতিরীয় এবং শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, (৪) অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত আপস্তম্ব বেদের ব্রাহ্মণভাগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন প্রধানত ছয়টি বিষয় ব্রাহ্মণে আলোচনা করা হয়েছে — **(১) বিধি ঃ** বিশেষ বিশেষ যজ্ঞধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে বিধি বলে। **(২) অর্থবাদ ঃ** বেদমন্ত্রের অর্থ এবং বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে ব্রাহ্মণগুলিতে যে ব্যাখা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দর্শনগত, ব্যাকরণগত এবং ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে। **(৩) নিন্দা ঃ** বিরোধী মতের সমালোচনা তার খণ্ডন ও পরিহারকে বলে নিন্দা। **(৪) প্রশংসা ঃ** ব্রাহ্মণগুলিতে কোনো কোনো ক্রিয়ার অনুমোদনের জন্য সেগুলির স্তুতি বা প্রশংসা করা হয়েছে। **(৫) পুরাকল্প ঃ** অতি প্রাচীনকালে যেসব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে বা দেবতাগণের (?) অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদির যেসব কাহিনি ব্রাহ্মণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে সেইসব বৃত্তান্ত পুরাকল্পের মধ্যে পড়ে। **(৬) পরকৃতি ঃ** যজ্ঞকর্মে অভিজ্ঞ খ্যাতনামা পুরোহিতগণের কীর্তি, বিখ্যাত রাজাদের যাগযজ্ঞ, দান, দক্ষিণা প্রভৃতি বিবরণই প্রকৃতি।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যগুলিও লক্ষণীয়। দেখা যাক — (১) ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে হোতা, যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে অধ্বর্যু, সামবেদের ব্রাহ্মণে উদগাতার করণীয় বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (২) ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অধিকাংশ বিষয় গদ্যে লেখা। (৩) ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে। কিছু কিছু বৈদিক ভাষা ব্যাখ্যা এবং বিশেষ বিশেষ বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। (৫) ব্রাহ্মণের অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে পরবর্তীকালে দর্শন, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বীজ নিহিত ছিল। (৬) প্রতিটি ব্রাহ্মণে বিভিন্ন যজ্ঞের খুঁটিনাটি বর্ণনার সঙ্গে যজ্ঞকর্মে পুরোহিতের প্রাধান্যই বর্ণিত। এখন প্রশ্ন ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা কি কিছু আছে? প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা আছে কি না সেটা আপনারাই বিচার করুন। আমি শুধু উল্লেখ করব — (১) যদি সমাজচিত্রটা দেখি, তাহলে দেখব বৈদিক ভারতের জাতিভেদ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব, প্রত্যেক বর্ণের জীবিকা, শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহসংস্কার, কৃষিবাণিজ্য, খাদ্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। (২) ঐতিহাসিক মূল্যের দিকটা যদি দেখি, তাহলে দেখব ভারতের পরবর্তীকালের ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। (৩) আখ্যানভাগের দিকটা যদি বলি, তা

অবশ্য যারপরনাই রোমাঞ্চকর এবং বহুমাত্রিক। যেমন — (ক) শতপথ ব্রাহ্মণের পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনি (১১.৫.১), (খ) মনুমৎস্যকথা (১.৮.১), (গ) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেপ আখ্যানে (৭/১৩-১৮) (৪) নীতিবোধ শিক্ষাও পাওয়া যায়। যেমন — (ক) শতপথ ব্রাহ্মণের নীতিবোধে বিশেষত যৌন সম্পর্কিত নীতির আভাস পাই। সেখানে এক ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষে অপর ব্যক্তির সহবাস পাপজনক বিবেচিত হত। (খ) আমরা হরিশ্চন্দ্রপুর রোহিতের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের মুখে শুনি চরিষ্ণু মানবজীবনের এগিয়ে চলার মন্ত্র - "চরৈবেতি" অর্থাৎ "চল চল"। (৫) ব্রাহ্মণ সাহিত্য বহুমুখী সভ্যতা ও কৃষ্টির আকর বলে পরিগণিত হয়েছে। এতে আমরা পাই নৃত্যবাদ্যাদি, ললিতকলা, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, অপরাধশাস্ত্র, নৌবিদ্যা, পশুপক্ষীও ভেষজবিজ্ঞান প্রভৃতি। (৬) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্র-ভরদ্বাজের কাহিনিতে (৩/১০) ব্রহ্মচর্যের মহিমা কীর্তন বর্ণিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ কে? 'ছন্দোদেব' আখ্যানে দেখতে পাই, এক কামান্ধ ব্রাহ্মণপত্নী আর নাপিতের যৌনমিলনে জন্ম নেওয়া পুত্র মতঙ্গ যখন বনের এক নিষাদ-সর্দারকে বলে ওঠে, "ঠিকঠাক ব্রাহ্মণত্ব না-পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই করব না। নিষাদ-সর্দার বিরক্ত হয়ে বলল, "ব্রাহ্মণ হলে কি তোমার একটি লেজ গজাবে? সব মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মত্ব আছে। ব্রহ্ম মানে কি জানো?" শিক্ষিত মতঙ্গ বলল — 'না'। প্রান্তজ উপজাতির এই নিষাদ-সর্দার বলে ওঠে — "ব্রহ্ম মানে হল 'আনন্দ'। আনন্দ সবার ভিতরেই থাকে। তাকে খুঁজে নিতে হয় জীবনযাপনে।"

উপনিষদের এমন সহজ ব্যাখ্যা এক নিষাদ-সর্দারের মুখে! চমকে উঠলেন নাকি? আবার দেখুন মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। / ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ"। অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সৃষ্টি করলেন। ব্রাহ্মণ হল হিন্দু বর্ণচতুষ্টয়ের প্রথম এবং উচ্চতম বর্ণ। হিন্দুধর্মানুসারে এই বর্ণজাত ব্যক্তিগণই সমাজে শিক্ষক, আধ্যাত্মিক গুরু, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিধানকর্তার ভূমিকা পালন করার অধিকারপ্রাপ্ত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি মনে করেন, "সেই চরম সম্মানের জায়গাটা তাঁদের নির্ভুল বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাহাত্ম্য থেকেও আসেনি, যাগযজ্ঞের আড়ম্বরে একটা মহান গভীরতা তৈরি করে সমাজকে ম্যাজিক দেখিয়েও এই সম্মান আসেনি। এই সম্মান এবং এই ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষের সর্বোত্তম শিক্ষালাভের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল এবং সেই শিক্ষাও এসেছে ত্যাগ-বৈরাগ্য-তপস্যার চরম অনুশীলন থেকে"। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিগণ বিপ্র (অর্থাৎ জ্ঞানী) এবং দ্বিজ (অর্থাৎ দু-বার জাত) হিসাবেও অভিহিত হয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ শব্দটা এসেছে ব্রহ্ম থেকে। এক অর্থে, যার রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান সেই ব্রাহ্মণ। বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চেপে বসার আগে মন্ত্র রচনা করে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন যে কেউ। এমনকি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণরা উপাসনার দায়িত্ব ছেড়ে বেছে নিতে পারত অন্য যে-কোনো পেশাও। মহাভারতের বশিষ্ঠ তীর্থ, অর্ধকাল তীর্থ, বিশ্বামিত্র নামক তীর্থস্থানে গেলে ব্রাহ্মণ হতে পারে যে কেউ। পুরাণ মতেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হলেই কেবল ব্রাহ্মণত্ব অর্জিত হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নব্বই সংখ্যক পুরুষসূক্তের বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণের জন্ম পুরুষের

(স্রষ্টার) মুখ থেকে। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় করেছিলেন, পরে কর্মানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কেউ হয় ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ-বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, যিনি কাম-ক্রোধ-মোহ ত্যাগ করেছেন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, জন্মানুসারে নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য জন্মসূত্রে বর্ণ নির্ধারণ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নানা শ্রেণিভেদ আছে। অনেকের মতে এই শ্রেণির সংখ্যা ২০০০। এক সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই ৪৬৯টি শাখা আছে। শ্রেণি অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। বাংলায় আচার্য বা গণক এবং শাকদীপি ব্রাহ্মণেরা পতিত বলে গণ্য হয়। নিম্নবর্ণের পৌরোহিত্য করে বলে বর্ণ ব্রাহ্মণরাও পতিত। তেমনি অগ্রদানী, ভাট ও পিরালি ব্রাহ্মণরাও সমাজে হীন। বাংলার বাইরে মন্দিরের পূজারী হওয়ায় তামিল ও কর্ণাট ব্রাহ্মণরা সমাজে অপাঙক্তেয়। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, এঁরা কেরলের ব্রাহ্মণ। নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাংলার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। তাদের খুব কম সংখ্যকই আর্য বংশোদ্ভূত। তারা চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকে বাংলায় আসেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে পাল আমলে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং যাগযজ্ঞ ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের পতিত ও শূদ্রে পরিণত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। মধ্যযুগীয় সমাজে ব্রাহ্মণরা সকল বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে জল গ্রহণ করত না। তিলি, তাঁতি, মালাকার প্রভৃতি মাত্র নয়টি সম্প্রদায়ের হাত থেকে জলগ্রহণের রীতি চালু ছিল। ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে — (১) ব্রাহ্মণ গুরু এবং সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য, (২) তারা অপর জাতির কর্তব্য নির্ধারণ করবে, (৩) রাজা সকলের প্রভু কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভু নয়, (৪) বেত্রাঘাত, বন্ধন, অর্থদণ্ড, নির্বাসন, বাকদণ্ড এবং পরিত্যাগ — এই ছয় প্রকারের সাজা ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাবে না, (৫) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা করমুক্ত, (৬) তাদের ঘরে গুপ্তধন পাওয়া গেলেও রাজা তার সবটাই গ্রহণ করতে পারবে না, (৭) আগে যাওয়ার জন্য তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে, (৮) অন্য বর্ণের তুলনায় ব্রাহ্মণরা লঘুদণ্ড পাবে, (৯) তাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা যাবে না, (১০) তারা মৃতাশৌচ পালন করবে দশদিন, (১১) তারা সুদ গ্রহণ করতে পারবে না, (১২) আপদকালে তারা বৈশ্যদের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে প্রভৃতি। পূজার্চনাসহ হিন্দুদের যে-কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা ব্রাহ্মণদের একটি সাধারণ পেশা। তবে শিক্ষাদীক্ষা, ব্যাবসাবাণিজ্য, রাজনীতি, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তারা অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য।

সাধারণত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সুশিক্ষিত পণ্ডিত হয়ে থাকেন এবং কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। কলহন বিরচিত "রাজতরঙ্গিণী"-র শ্লোকানুসারে ব্রাহ্মণগণ মূলত পঞ্চ-গৌড় এবং পঞ্চ-দ্রাবিড় — এই দুই ভাগে বিভক্ত। কলহন কর্তৃক রচিত শ্লোকটি উল্লেখ করা হল ঃ কর্ণাটকাশ্চ তৈলঙ্গা দ্রাবিড়া মহারাষ্ট্রকাঃ, গুর্জরাশ্চেতি পঞ্চৈব দ্রাবিড়া বিন্ধ্যদক্ষিণে।।/ সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া উৎকলামৈথিলাঃ, পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যেস্যাত্তরবাসিনঃ।। ব্রাহ্মণের মর্যাদাই-বা কতটা — এ ব্যাপারে "মনুসংহিতা"-য় মনু

পরিষ্কারভাবে বলেছেন — (১) "ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।/ বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।" (১/৯৬) অর্থাৎ, সৃষ্ট (স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে) প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। (২) "উৎরত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তিধর্মস্য শাশ্বতী।/স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।" (১/৯৮) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের দেহই ধর্মের সনাতন মূর্তি। তিনি ধর্মের জন্য জাত এবং মোক্ষলাভের যোগ্য পাত্র। (৩) "ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।/ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।।" (১/৯৯) অর্থাৎ, জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভু হন। (৪) "সর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিৎজ্জগতীগতম। / শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি"।। (১/১০০) অর্থাৎ, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেই সব ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হেতু ব্রাহ্মণ এই সবই পাওয়ার যোগ্য। (৫) "স্বমেব ব্রাহ্মণ্যে ভুঙতে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ। / আনৃশংস্যাদব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ।।" (১/১০১) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নিজের অন্নই ভক্ষণ করেন, নিজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্য দান করেন। অন্য লোকেরা যা ভোগ করে, তা ব্রাহ্মণের দয়া হেতু করে। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। কথিত হয় যে, কর্ণাট থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এনে সেন রাজারা যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় 'পঞ্চরত্ন' নামে পরিচিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত কবি ছিলেন। সেযুগের কবি-শাস্ত্রকারদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ; রাজপদোপজীবী ব্রাহ্মণ কর্মচারীর সংখ্যাও কম ছিল না। এ সময় সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা সমাজের বিধান দিতে থাকে। বল্লালসেন রাজ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্দ্য (বন্দ্যোপাধ্যায়), চট্ট (চট্টোপাধ্যায়), মুখটী (মুখোপাধ্যায়), ঘোষাল, পুততুণ্ড, গাঙ্গুলি (গঙ্গোপাধ্যায়), কাঞ্জীলাল ও কুন্দলাল হচ্ছে মুখ্য কুলীন। আর রাঢ়ী, গুড়, মহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডী, পিপ্পলাই, গড়গড়ি, ঘণ্টাশ্বরী, কেশরকণা দিমসাই, হাড়, পিতমুণ্ডী ও দীর্ঘতি গৌণ কুলীন হিসেবে পরিগণিত। কিংবদন্তি অনুযায়ী বল্লালসেনের আমলে কুলীন বলে স্বীকৃত হয় লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র, সান্যাল ও ভাদুড়ী — এই পাঁচটি গোত্র। বৌদ্ধমতে, ব্রাহ্মণ বলতে অনাসক্ত, রজঃমুক্ত, লোভ-দ্বেষ-মোহবিহীন এবং ব্রতপরায়ণ, শীলবান, বীতৃষ্ণ, সংযত ও অন্তিম দেহধারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন। যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের প্রতি অসংশ্লিষ্ট, অল্পেচ্ছু ও আলয়বিহীন তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধের জন্মের পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মণেরা তাদের নিজ মাহাত্ম্য প্রচারছলে জাতি অভিমান প্রকাশ করত মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে তেবিজ্জের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কেবল ত্রিবেদ জ্ঞাত হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য অসমার্থক তর্ক ও বেদ, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ভাবনা করা দরকার। যাঁরা এরূপ ভাবনার অধিকারী হয়ে অনাসক্ত নিষ্কলুষ, রজঃমুক্ত, লোভ-দ্বেষ-মোহবিহীন হয় এবং যিনি পাপ পঙ্কিল দুরতিক্রম্য মোহপূর্ণ সংসারাবর্ত মুক্ত হয়েছেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। হিন্দুদের বিশ্বাস জাতি দ্বারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ অধিকারী হয় অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হলে ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম কিংবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত হতে হবে।

কিন্তু বুদ্ধ মতে, ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম কিংবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত হয়ে পাপ মল ত্যাগ না করলে তাঁকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যাবে না, তাঁকে কেবল ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করা যায়। বংশগৌরব অথবা উচ্চ বংশে জন্ম লাভ করেও শীল গুণে বিভূষিত না-হলে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। বহুলোক নীচু কুলে জন্মগ্রহণ করেও শীলাচার সম্পন্ন হয়ে পরিশ্রমের দ্বারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বর্গে গমন করতে পারে। তাই বুদ্ধ বলেছেন, জন্মের দ্বারা কেউ চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ হয়। যিনি বন্ধনমুক্ত কৃতঃকৃত্য অনাশ্রব, কামচিন্তা বিরহিত তিনিই তৃষ্ণামুক্ত ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য। ব্রাহ্মণ ধ্যানী, একক বিচরণশীল, বস্তুকাম ও ক্লেশকাম পরিহার করে চলেন। যিনি সর্ব সংযোজন ছিন্ন করে ভয়মুক্ত, অনাসক্ত, শৃংখলামুক্ত তিনিই তৃষ্ণাক্ষয়ী ব্রাহ্মণ — ক্রোধপূর্ণ, জটধারী, অজিনচর্ম পরিহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের যোগ্য হতে পারে না। যিনি ছোট-বড় সর্বপ্রকার অদত্ত গ্রহণে বিরত, যাঁহার কোনো প্রকার তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই যিনি সংশয়মুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণেরা অভিমান বা অহংকার করে নিজের গৌরব করে বলত তারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাতি অভিমান ব্রাহ্মণের কাজ নয়। কারণ জাতি হিসেবে মানুষ সঙ্গে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। তৎকালীন মানব জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রের পদচিহ্ন একই ধরনের। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চঞ্চু প্রভৃতি পার্থক্য আছে। কিন্তু মানুষ মানুষে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। বুদ্ধ মতে, যে-কোনো ব্যক্তি সৎকর্ম করলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। সৎভাব ও কৃচ্ছসাধনের দ্বারা যে-কোনো লোক ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেন। বনের প্রাণীরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। ঠিক তেমনি প্রকৃত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ধ্যানপরায়ণ হলে শোভা পায় এবং অনাসক্ত, নিষ্কলুষ, রজঃযুক্ত লোভ-দ্বেষ-মোহবিহীন হয়। অবশ্য ২০০২ সালের ৫ অক্টোবর দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়টির কথাটি স্মর্তব্য। কেরালার আলাঙ্গাদ গ্রামের শিবমন্দিরে জন্মের ভিত্তিতে অব্রাহ্মণ এক ব্যক্তিকে পুরোহিত করা নিয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি এস রাজেন্দ্র ও ডুরাই স্বামীর বেঞ্চ রায় দেয় যে যে-কোনো মন্দিরে যে-কোনো মন্দিরে যে-কোনো বর্ণ বা গোত্রের মানুষ পূজারী হতে পারবেন। কোর্ট আরও আদেশ দেয় যে "শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে অনভিজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন অযোগ্য জন্মসূত্রে কোনো ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করতে বা মন্দিরের পূজারী হতে পারবে না। সেখানে বলা হয় যে, "বেদপাঠ, শাস্ত্রজ্ঞান যে-কোনো সাধারণ হিন্দুর থাকলেই সে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ হতে পারবেন। ভারতের সকল হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে।" পবিত্র বেদ অনুযায়ী যে-কোনো কেউ-ই যদি শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে জ্ঞানী হতে পারে তবে সে যজ্ঞ করতে সক্ষম। পবিত্র বেদের বর্ণাশ্রম কর্ম ও গুণভিত্তিক, জন্মভিত্তিক নয়। আর তাই-ই আইন করে প্রতিষ্ঠিত করল দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট। আর এই রায়ের মাধ্যমে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মূর্খদের বর্ণপ্রথার দর্প চূর্ণ হল, বিজয় লাভ করল পৃথিবীর কোটি কোটি তথাকথিত দলিত, পদহত, শূদ্র সনাতন ধর্মালম্বী মহৎ প্রাণগণ।

শাস্ত্র বলছে ব্রাহ্মণ-ঘরে জন্মালেই কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যায় না, যেমন মুসলমান-ঘরে জন্মালেই

কেউ মুসলমান হয় না। বিশেষ নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেমন মুসলমান হতে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার জন্য বেশ কিছু নিয়ম করার বিধান দিয়েছে শাস্ত্র। বল্লালচরিত্র ধৃত পূর্ব খণ্ডের ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে — "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।/বেদ পাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।।" অর্থাৎ, "জন্মমাত্রেই সবাই শূদ্র। সংস্কারে দ্বিজ পদবাচ্য হয়। বেদ পাঠেই বিপ্র হন এবং ব্রহ্মকে জানলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য"। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত দশ প্রকার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। যার একটি হল **চূড়াকর্ম**। চূড়াকর্ম বা চূড়াকরণ শ্রুতির বিধান অনুসারে ধর্মলাভের জন্য দ্বিজজাতিগণের (ব্রাহ্মণ) উচিত এবং আবশ্যিক কর্ম। 'চূড়া' মানে শিখা বা টিকি। মনুর মতে শিশুর চূড়াকরণ বা প্রথম কেশচ্ছেদন/মস্তকমুণ্ডনের অনুষ্ঠান দুই সময়ে করা যায়। শিশুর এক বছর বয়সে বা তিন বছর বয়সে, এ বিষয়ে কোনো কঠোর বিধান নেই। কিন্তু "কুমারা বিশিখা ইব" এই বেদবচন অনুসারে চূড়াকরণ অবশ্য কর্তব্য। এই সংস্কারে শিখা বা টিকি রেখে মাথার অবশিষ্ট চুল কেটে ফেলা হয়, একে চৌলকর্মও বলে। এরপরের সংস্কারটি হল **উপনয়ন**, একেই পৈতে বা পইতা গ্রহণের অনুষ্ঠান বলে। 'উপ' মানে নিকটে বা কাছে এবং 'নয়ন' মানে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ বেদ শিক্ষার জন্য বালককে আচার্যের কাছে নিয়ে যাওয়ার অনুষ্ঠান। এটি হল দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রারম্ভিক সংস্কার, এতে উপবীত বা যজ্ঞসূত্র ধারণ করতে হয়। বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণদের আট বছর বয়সে, ক্ষত্রিয়দের এগারো বছর বয়সে এবং বৈশ্যদের দ্বাদশ বছর বয়সে উপনয়ন কর্তব্য। অবশ্য উপনয়নের ঊর্ধ্বসীমা ব্রাহ্মণের ষোলো বছর, ক্ষত্রিয়দের বাইশ বছর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বছর নিদান আছে। শূদ্রের উপবীত ধারণের কোনো অধিকার নেই। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের উপবীত ধারণের অধিকার দেওয়া হলেও আসলে উপবীত ধারণের অধিকারটা ব্রাহ্মণগণই পরে আত্মস্যাৎ করে নিয়েছিল। কারণ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারোরই পূজা-পার্বণ করার অধিকার ছিল না, যাঁরা পূজা-পার্বণ করার অধিকার কায়েম করলেন, তাঁদেরই পৈতে ধারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ল, কারণ পূজা-পার্বণে পৈতার ভূমিকা সংযোজন করা হল। শাস্ত্রে আরও বলা হল ষোলো বছরে ব্রাহ্মণদের, বাইশ বছরে ক্ষত্রিয়দের এবং চব্বিশ বছরে যদি উপনয়ন সংস্কার না-হলে তাঁরা ব্রাত্য পরিগণিত হবে। ব্রাত্যদের আচার-অনুষ্ঠানে কোনো অধিকার থাকে না। তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের অধ্যয়ন সংক্রান্ত এবং বৈবাহিক কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। তবে হ্যাঁ, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করলে তবেই সমাজে তারা স্থান পায়। এইসব কথা অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে বলা হয়েছে। আর-একটি সংস্কার হল **কেশান্ত সংস্কার**। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে প্রচলিত এই প্রাচীন সংস্কারে উপনয়নের শেষ ঊর্ধ্বসীমায় চুল কাটা ও দাড়ি কামানোর অনুষ্ঠানই কেশান্ত সংস্কার। এই অনুষ্ঠানে গোরু দান করা হয় বলে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১/১৮) একে গোদান বলা হয়েছে।

উপরে যে সংস্কারগুলি আলোচনা করা হল সেগুলি ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্তব্য। এবার আমরা দেখে নেব ব্রাহ্মণগণের কর্ম-বিভাজনের কারণে শ্রেণি-বিভাজন কীরকম — **(১) আচার্য ঃ** মনুর মতে যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন করিয়ে তাকে কল্প (যজ্ঞবিদ্যা) ও রহস্য (উপনিষদ) সহ বেদ অধ্যয়ন করান তাকে আচার্য বলা হয় (যেমন — ভট্টাচার্য = ভট্ট + আচার্য)। কল্প ও

রহস্যবিদ্যা না জানলে বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হবে না। তবে আগে শিষ্যকে উপনয়নের সময় সাবিত্রীমন্ত্র তার কানে কানে পড়বেন। ফলে সেই শিষ্যের দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্তি ঘটবে। তখন সে বেদাধ্যয়ন করার অধিকার পাবেন। প্রায় সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে এই কথা উল্লেখ আছে। **(২) উপাধ্যায় ঃ** মনুর মতে যে ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্য বেদের অংশমাত্র বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান তিনিই উপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় = বন্দ্য + উপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় = মুখ + উপাধ্যায় ইত্যাদি)। সমগ্র বেদ নয়, বেদের অংশ যেমন — সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতির যে-কোনো একটি। আর বেদাঙ্গ যেমন — শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ, কল্প প্রভৃতি। উপাধ্যায়ও শিক্ষক, তবে আচার্যের থেকে কিছু পার্থক্য আছে। উপাধ্যায় অর্থের বিনিময়ে বেদের অংশ বা বেদাঙ্গ পড়ান। কিন্তু আচার্য কোনোরকম দক্ষিণা গ্রহণ করবেন না। তাই উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য মান্যতর। **(৩) গুরু ঃ** মনুর মতে যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে গর্ভাধান কর্ম সম্পাদন করেন এবং অন্নের দ্বারা প্রতিপালন করেন সেই ব্রাহ্মণ গুরু হিসাবে পরিগণিত হন। এখানে 'নিষেক' শব্দের দ্বারা দশবিধ সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, দশটি সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধান অন্যতম। ভবিষ্যতের বা হবু পিতাই তাঁর পত্নীর জন্য এই সংস্কার সম্পাদন করেন। পিতাই অন্নের দ্বারা সন্তানদের প্রতিপালন করেন, ফলে পিতাই প্রকৃতপক্ষে গুরু। **(৪) ঋত্বিক ঃ** কোনো ব্যক্তি যাঁকে যজ্ঞের জন্য বরণ নেওয়ার তিনি ওই ব্যক্তির জন্য অগ্ন্যাধান, অর্থাৎ যজ্ঞকালে মন্ত্রসহকারে অগ্নি উৎপাদন ও স্থাপন, পাকযজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সম্পাদন করেন তাঁকে ঋত্বিক বলে। আচার্য প্রভৃতির মতো ঋত্বিকও যে সম্মানীয় তা দেখানোর জন্যই এই পদ। বৈদিক যজ্ঞে ঋত্বিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকে যে ঋত্বিকদের কথা বলা হয়েছে তিনি শুধু বৈদিক নন, স্মার্ত বা লৌকিক ক্রিয়াকর্মও সম্পাদন করেন। **গায়ত্রী মন্ত্র ঃ** যিনি যেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণে উন্নীত হলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি প্রণব বা ওংকার এবং গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার অর্জন করলেন। উপনয়ন প্রাপ্ত ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে মনু প্রণব বা ওংকার কথাটি ৭৬ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন, বেদপাঠের আগে ও পরে বেদপাঠার্থী শিষ্য প্রণব বা ওংকার উচ্চারণ করলে মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা আসে। ওংকারহীন পাঠ কোনো কাজে আসে না। প্রণব বা ওংকারে আছে তিনটি অক্ষর — 'অ', 'উ', 'ম' — তিনটি অক্ষর মিলে উচ্চারণ হয় "ওঁ" — উচ্চারণ করলে 'অউম' হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের তিনটি প্রয়োজনীয় বিভাগ আছে, সেগুলি হল — (ক) প্রণব বা ওংকার, (খ) ব্যাহৃতি এবং (গ) সাবিত্রী ঋক্। ব্যাহৃতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল — উক্তি, কথন, উচ্চারণ, বি-আ-হৃ + ক্তিন্ = ব্যাহৃতি। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ — এগুলি গায়ত্রী মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সাবিত্রী বচন, এগুলিকে ব্যাহৃতি বলে। অনেকে ব্যাহৃতি মানে শব্দ (WORD) বা স্থান বলেছেন। তিনটি ব্যাহৃতি-র মধ্যে 'ভুঃ' হল পৃথিবীলোক, অগ্নিদেবতা, ঋগ্বেদ ও প্রাণবায়ুস্বরূপ। 'ভুবঃ' হল অন্তরিক্ষলোক, বায়ুদেবতা, সাম ও অপানস্বরূপ। 'স্বঃ' হল দ্যুলোক, আদিত্যদেবতা, যজুঃ ও ব্যানবায়ুস্বরূপ। যেহেতু বেদ অধ্যয়নের আগে প্রণব, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী বা গায়ত্রী মন্ত্রপাঠ করতে হয়, সেহেতু এগুলিকে বেদের মুখ বা প্রবেশদ্বার বলা হয়েছে। ঋকের দেবতা সবিতা, কিন্তু মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত। তাই সাধারণভাবে একে গায়ত্রী মন্ত্র বলা হয়। সাবিত্রী শব্দের দ্বারা গায়ত্রীকেই

বোঝায়। সাবিত্রী হল ত্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র ব্রহ্মা ঋক্, সাম, যজুঃ — এই তিনটি বেদ থেকে গায়ত্রীর তিনটি পাদ — (ক) তৎসবিতুর্বরেণ্যং, (খ) ভর্গো দেবস্য ধীমহি, (গ) ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। অর্থাৎ প্রকাশমান (দেব) সবিতার সেই বরেণ্য তেজঃ (ভর্গ) আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ওংকার (অ = ব্রহ্মা, উ = বিষ্ণু, ম = মহেশ্বর) এবং গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার অব্রাহ্মণদের নেই, এ অধিকার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণগণের। অবশ্য শাস্ত্রানুযায়ী বর্তমানে 'ব্রাহ্মণ' বলে যদি কোনো অস্তিত্ব থাকে! বেদ পাঠ তো দূরের কথা — ঋক, সাম, যজুঃ বা সাম বেদ বেশিরভাগ ব্রাহ্মণগণ চোখেই দেখেননি। আর ব্রহ্মজ্ঞান? দেড় টাকা নিয়ে উপবীত বা পইতে পরে নিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায় না। শাস্ত্রকার রঘুনন্দন বলেছেন - "বিপ্রাঃশূদ্র সমাচারাঃ ভবিষ্যন্তি কলিযুগে"। অর্থাৎ, "ভবিষ্যতে কলিযুগে বিপ্র এবং শূদ্র সবাই সমান আচার সম্পন্ন হবে।" তবে 'ওঁ' শব্দের পরিবর্তে অব্রাহ্মণগণকে সহজ মন্ত্র 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করার ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারতে কোন্ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকতেন সেটা একবার দেখে নেব। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত দেশরূপে ব্রহ্মাবর্তের কথা বলা হয়েছে। (১) সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী — এই দুটি দেবনির্মিত পবিত্র নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ **ব্রহ্মাবর্ত** বলে পরিচিত ছিল। এই স্থান ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে কথিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অধিক সংখ্যায় এই স্থানে বাস করতেন। এই ব্রহ্মাবর্তের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আচার-আচরণই মনু সদাচার বলেছেন। (২) মনু কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন — এই চারটি প্রদেশকে **ব্রহ্মর্ষিদেশ** বলা হয়েছে। উৎকর্ষের বিচারে ব্রহ্মাবর্তের পরেই ব্রহ্মর্ষিদেশ। ব্রহ্মর্ষিদেশের ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে দক্ষ। তাই এঁদের কাছ থেকে অন্যান্য দেশের লোকেরা যথার্থ আচার-আচরণ শিক্ষা করবে। (৩) মনু বলেন, যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবত বাস করে অর্থাৎ যেখানে এইরকম মৃগ জোর করে অন্য জায়গা থেকে আনা হয় না বা এখানে কেউ কারোকে হিংসা করে না বলে কৃষ্ণসার মৃগ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়, সেই দেশকে **যজ্ঞীয় দেশ** বলে।

এবার দেখব উত্তরীয়, মেখলা, উপবীত, দণ্ড, ভিক্ষা প্রার্থনা সহ বর্ণভেদে (শূদ্র ব্যতীত) কার কেমন (বিভাজন) হওয়া আবশ্যক।

উত্তরীয় ঃ ব্রহ্মচারীর উত্তরীয় বা ঊর্ধ্ববসন হবে ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণমৃগের, ক্ষত্রিয়দের রুরু হরিণের এবং বৈশ্যদের ছাগের চামড়ায় তৈরি হবে। তেমনই অধোবসন যথাক্রমে শণ, রেশম এবং পশমের তৈরি বস্ত্র পরিধান করবে। **মেখলা ঃ** ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মেঘলা (কোমরবন্ধ) হবে মুথা ঘাসের তৈরি, ত্রিগুণিত, সমান ও চিক্কণ। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর মেখলা হবে মুথাইঘাসে তৈরি এবং ধনুকের গুণের মতো। বৈশ্য ব্রহ্মচারীর মেখলা হবে শণসূত্রে নির্মিত এবং ত্রিগুণিত (তিনটি সমান মোটা সুতোয় প্রস্তুত)। **উপবীত ঃ** ব্রহ্মচারীর উপবীত (পইতা) বাম কাঁধের উপর থেকে ডানদিকে ঝোলানো থাকবে এবং তিনটি সুতোর গোছায় তিন গোছা সুতোয় তৈরি হবে। অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে সুতোর উপাদান হবে যথাক্রমে

কার্পাস, শণ ও পশম। অপরদিকে শরীরের যাজ্ঞাপবীতের অবস্থান অনুসারে ব্রাহ্মণদের তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে — (১) ব্রাহ্মণের উপবীত বাম কাঁধের উপর থেকে ডান হাতের নীচ পর্যন্ত ঝোলানো থাকলে তাঁকে উপবীতি বলে। কখন? দৈব কার্য ও যাগযজ্ঞাদির সময় ব্যবহার হয়। (২) ডান কাঁধ থেকে বাম হাতের নীচ পর্যন্ত উপবীত থাকলে প্রাচীনাবীতী বলে। কখন? পিতৃকার্যে বা শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার হয়। (৩) উপবীত গলায় হারের মতো লম্বমান থাকলে নিবীতী বলে। কখন? মনুষ্য কার্যের বা প্রাত্যহিক কাজের সময় ব্যবহার হয়। **দণ্ড ঃ** উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীকে দণ্ড ধারণ করতে হয়। ব্রাহ্মণের দণ্ড হবে তার চুল পর্যন্ত লম্বা এবং বেল বা পলাশ কাঠের তৈরি। ক্ষত্রিয়দের দণ্ড হবে তার কপাল পর্যন্ত লম্বা এবং বট বা খয়ের কাঠের তৈরি। বৈশ্য ব্রহ্মচারীর দণ্ড হবে তার নাক পর্যন্ত লম্বা এবং পীলু বা ডুমুর কাঠের তৈরি। দণ্ডগুলি হবে সরল, অক্ষত, সুদর্শন, বল্কলযুক্ত এবং অগ্নিতে অদগ্ধ। **ভিক্ষা প্রার্থনা ঃ** উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী দণ্ডধারণ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করে প্রথমে সে মা, বোন কিংবা মাসি অথবা এঁদের অভাবে যে তাকে অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করবেন না এমন ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারী যথাক্রমে প্রার্থনা বাক্যে প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে "ভবৎ" শব্দ গঠিত সম্বোধন পদ ব্যবহার করে ভিক্ষা প্রার্থনা করবে।

হিন্দুসমাজে চতুর্বর্ণের সম্মান কাদের কোথায় দেখে নেব ছোট্টো করে। ধন, বন্ধু, বয়স, কর্ম ও বিদ্যা — এই পাঁচটি হল মান্যস্থান। "বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।/ এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্ যদুত্তরম।।" (মনুসংহিতা ২/১৩৬)— এই পাঁচটির মধ্যে আগেরটির চেয়ে পরেরটি বেশি সম্মানযুক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য — এই তিন বর্ণের অন্তর্গত কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ধন প্রভৃতি পাঁচটির আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তবে তিনি সকলের সম্মানের যোগ্য হবেন। কিন্তু শূদ্রের ক্ষেত্রে নব্বই বছরের বেশি বয়স হলে তিনিও সম্মানের যোগ্য হবেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যার জন্য, ক্ষত্রিয় বীরত্বের জন্য, বৈশ্য ধনসম্পদের জন্য এবং শূদ্র বয়সে বড়ো হলেই শ্রেষ্ঠ হবেন। বুঝুন ! শূদ্রের শুধু বয়সেই সম্মান, তাও আবার নব্বইয়ের অধিক হতে হবে। অর্থাৎ ধন, বন্ধু, কর্ম এবং বিদ্যার কোনো অধিকার নেই, অর্জন করলেও স্বীকৃতি নেই। মনুসংহিতায় মনুবাবু বলছেন, শূদ্রকে শিষ্য করবে না এবং শূদ্রের শিষ্য হবে না (মনুসংহিতা - ৩/১৫৬)। সে কারণেই দ্রোণ কর্তৃক নিষাদপুত্র একলব্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হারিয়ে তুণ্ড হয়ে যেতে হয়, সে কারণেই রামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র শম্বুককে অকারণে (তপস্যা করার অপরাধে!) মৃত্যুবরণ করতে হয়। এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয়, কেন-না এটা মনুসংহিতার মনুর নির্দেশ — "নাবি স্পষ্ট মধীয়ীত ন শূদ্র জন সন্নিধ্য। / ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রাহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ।" অবশ্য এক শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা একটা প্রচার চালিয়ে থাকেন। ভাবটা এমন যেন তাঁরা কত উদার! কী বললেন? বললেন — শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের মতো কাজে পারদর্শী হয় তবে তাকে ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করা যাবে। কার্যে তার কোনো প্রমাণ আছে নাকি? বিশ্বামিত্রের কথা বলবেন নিশ্চয়? প্রথমত বিশ্বামিত্র শূদ্রপুত্র নয়, ক্ষত্রিয়। দ্বিতীয়ত ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্রকে ক্ষমতায় রুখতে না-পারার কারণে ব্রাহ্মণগণ বাধ্য হয়েই ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিয়েছিলেন। যে ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতা রচনা করে "সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ

।/ কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাব কর্ত্তয়েৎ" (অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর অধম জাতি যদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করে তবে রাজা তার কটিদেশে গরম লোহার দাগ দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন অথবা যেন না মরে এমনভাবে তার পাছা কেটে দেবে) বলেন সেই ব্রাহ্মণগণ মঙ্গালদায়ক আর কী করতে পারে! অব্রাহ্মণ শিক্ষকতা করলেও সে অব্রাহ্মণই থাকে, তাকে কেউ ব্রাহ্মণ বলে অতিরিক্ত সম্মান করে না। কারণ "মনুস্মৃতি" নিদান দিয়ে দিয়েছেন—(১) ১০ বছরের ব্রাহ্মণ এবং ১০০ বছরের এক ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক যদি পিতা-পুত্র হয়, তাহলে এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হচ্ছে পিতা। (২) একজন ব্রাহ্মণের গৃহে কোনো ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রকে অতিথি বলা যাবে না। একজন ব্রাহ্মণের গৃহে শুধু ব্রাহ্মণেরই অতিথি হওয়ার অধিকার আছে। (৩) একজন ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত মনে একজন শূদ্রের জিনিস নিয়ে নিতে পারে, কারণ শূদ্রের নিজের বলে কিছুই নেই ইত্যাদি। মনুসংহিতায় শ্রীমান মনু বলছেন, কারা কাদের পিতা ব্রাহ্মণ হলেও কে ব্রাহ্মণ নয়। যিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়েও আচার-আচরণে ব্রাহ্মণ নন, তাঁরা ব্রাহ্মণব্রুব হিসাবে পরিগণিত হবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের কোনো বালকের উপনয়নের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ষোলো, বাইশ এবং চব্বিশ বছর অতিক্রম করে গেলেও যদি তার উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত না-হয় সে ব্রাত্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই ব্রাত্যদের কোনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাজন, অধ্যাপনা প্রভৃতি বেদসম্বন্ধ ছিল না এবং সংশ্লিষ্ট বর্ণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য শাস্ত্র বলছে মূর্খ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের অধম। অতএব সাধু সাবধান! মূর্খ ব্রাহ্মণগণ দূর হঠো। নারায়ণ-শিলা স্পর্শ করবেন না।

তাহলে এই যে এত এত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হল কিংবা সৃষ্টি করা হল ভারতে, তাতে কার কী কাজে লাগল, তারাই-বা কী করল সমাজে, কী রাখল সমাজে? "মনুসংহিতা"-য় মনু ব্রাহ্মণদের জন্য বললেন — "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।/দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।।" (১/৮৮) অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের জন্য সৃষ্টি করলেন অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ।

ব্রাহ্মণগণের আর্শ্চযজনক এবং অদ্বিতীয় আবিষ্কার ঈশ্বর বা দেবতা বা ভগবান। এটাই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র পুঁজি বা মূলধন। এবং ঈশ্বরকে সামনে রেখে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, আত্মা, ইহকাল, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে সংযোজন করে দিলেন। সাধারণ মানুষের মনে কোনো অদৃশ্য শক্তির ধারণাটা ছিলই, সেই সভ্যতার ঊষাকাল থেকে। কীভাবে এই ধারণা জন্মালো? বিধ্বংসী ঝড়, অনর্গল ভারী বর্ষণ, কড়কড়িয়ে মরণ বজ্রপাত, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলকানি, নিথর মৃত-শরীর, দাবানল, প্লাবনই মানুষের মনে দানা বেঁধেছে কোনো অদৃশ্য শক্তির। প্রাকৃতজনের দেবদেবীদের উৎপত্তিস্থল ভীতি। তাই মনসা, চণ্ডী, শিব, ষষ্ঠি ইত্যাদি দেবদেবীদের জন্ম। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে উন্নাসিক ব্রাহ্মণরা নীচু শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে মেলবন্ধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। তাই বৈদিক দেবদেবীদের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীদের একটা মনগড়া যোগ কল্পনা করে সংস্কৃত ছেড়ে লৌকিক ভাষায় মন্ত্র রচনায় মনোনিবেশ করেন।

দক্ষিণ রায়, বনদেবী, মারাংবুরু, ভাদু, টুসু, ইতু, মনসা, ওলাউঠা প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণও পেলাম কালে কালে, বিভিন্ন সময়ে। বেদের যুগে অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্রও লৌকিক দেবতা।

এমনকি বেদের যুগের আগেও পশুপতি (যা পরে ব্রাহ্মণগণ আত্মসাৎ করে শিব তথা মহেশ্বরে রূপান্তরিত করে নেয়) লৌকিক দেবতা। লক্ষ করুন, এই দেবতারা ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট দেবদেবী নয়, সাধারণের আত্মীয়। সংস্কৃত মন্ত্র নেই, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নেই। এই দেবতারা শান্ত, নরম, সন্তানসম, আদরের। ব্রাহ্মণদের দেবতারা ক্ষতিকর, হিংস্র, ত্রাস সৃষ্টিকারী, অসহিষ্ণু, কামুক, কামার্ত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছিদ্র অন্বেষক — দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের নামে খুনোখুনি করে। এরা নরকের ভয় দেখায়, স্বর্গের লোভ দেখায়।

এ ছাড়া মানুষ যা যা করতে অক্ষম, ঈশ্বরের মধ্যে সেই গুণগুলিই আরোপিত হয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট যে মানুষের দুর্বলতা এবং অসহায়তাই ঈশ্বরের আঁতুরঘর। লক্ষ করুন, এইসব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি সবই উপরের শূন্য থেকে মানে আকাশ থেকেই পতন হয়। অর্থাৎ এইসব অঘটনের ধারণা হল স্রষ্টা আকাশেই থাকেন এবং অবশ্যই নিরাকার। সে কথা লিপিবদ্ধ হল হিন্দুদের প্রধান এবং একমাত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে। বেদে আমরা ঈশ্বরের নিরাকার রূপই পাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঈশ্বর এক। বেদে বর্ণিত বেশিরভাগ দেবতাকল্পই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেবতা (অগ্নি আগুনের দেবতা, বরুণ বৃষ্টির দেবতা, ইন্দ্র বজ্রের দেবতা ইত্যাদি।) এবং এরা বেদের যুগে কেউ পুজো পেলেও পুরাণোত্তর যুগে ব্রাত্য হয়েছে। সে কথায় পরে আসছি। আগে দেখে নেব বেদে বর্ণিত দেবতাদের।

শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪.৫) যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শাকল্যকে বলছেন — "দেব ৩৩টি যা পরমেশ্বরের প্রকাশক। ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি। শতপথ ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে — বিদগ্ধ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞেস করলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য দেব (শক্তি) কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ৩৩টি। তখন শাকল্য আবার বললেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য দেব কয়টি? তখন তিনি আবার বললেন ৬টি। শাকল্য আবার বললেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য দেব কয়টি? তখন যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন ৩টি। আবার শাকল্য জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন দুইটি। তখন শাকল্য আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য দেব কয়টি? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন দেড়টি। শাকল্য আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য দেব কয়টি? তখন তিনি বললেন একটি! তখন শাকল্য জিজ্ঞেস করলেন, এই ৩৩টি দেব কী?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ৮ বসু যা হল অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্র, নক্ষত্র, ১১ রুদ্র যা হল প্রাণ (নিঃশ্বাস), অপান (প্রশ্বাস), ব্যন, সমান, উদাম, নাগ, কুর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা, ১২ আদিত্য হল ১২ মাস, ইন্দ্র, প্রজাপতি অর্থাৎ মোট ৩৩টি। ইন্দ্র হল বিদ্যুৎ আর প্রজাপতি হল যজ্ঞ (যে-কোনো শুভ কর্ম)। তখন শাকল্য আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ৬টা দেব কী কী? তখন তিনি উত্তর দেন — অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুঃ। তখন তিনি বললেন, তাহলে ৩টি দেব কী? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তিনলোক (ভ্যু, দ্যু, অন্তরিক্ষ)। তারপর শাকল্য আবার বললেন,সেই দুইটি দেব কী কী? খাদ্য এবং প্রাণ — উত্তর দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তখন আবার বললেন শাকল্য জিজ্ঞেস করলেন, সেই দেড়টি কী? তখন যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন যিনি প্রবাহিত হন। তখন শাকল্য বললেন সেই এক এবং অদ্বিতীয় যিনি প্রবাহিত হন তাঁকে আপনি কীভাবে দেড় বললেন? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন

যখন তা প্রবাহিত হয় তখনই সবকিছু উৎপন্ন হতে শুরু করে। তাহলে কে সেই এক? প্রাণ! হ্যাঁ প্রাণ (পরমাত্মা) সেই এক এবং অদ্বিতীয় দেব যাকে সবাই 'তৎ' বলে জানে।"

অসাধারণ এই শৈল্পিক ও গভীর দার্শনিক কথোপকথন ব্যাখ্যা করছে সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম থেকে সবকিছু উৎপন্ন হতে শুরু করে। একে একে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ভ্যু, দ্যু এবং অন্তীরিক্ষলোক, বিদ্যুৎশক্তি সবকিছুই তার থেকে তৈরি হয় যাদেরকে ৩৩টি ভাগে ভাগ করা হয় এবং এদেরকে বলা হয় দেব অর্থাৎ শক্তি। আর দিন শেষে শক্তি একটাই যা থেকে সকল কিছু আপাতশক্তিপ্রাপ্ত হয়। আর এই শক্তিই এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মা।

কী বুঝলেন? পাঠক আপনি যাই-ই বুঝুন, অবশেষে ব্রাহ্মণগণ বুঝলেন বেদের দেবতাদের খাটিয়ে ধান্ধাপানি করা এক্কেবারেই অসম্ভব। অতএব বিকল্প পথের খোঁজে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক রচিত হল ১৮টি মহাপুরাণ, ১৮টি উপপুরাণ এবং অবশ্যই মনুসংহিতা। এই গ্রন্থগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ক্ষত্রিয়-ইতিহাস সংরক্ষণ, ব্রাহ্মণগণের চরম আধিপত্য বিস্তার এবং অবশ্যই রগরগে আদিরসাত্মক ভরপুর কাহিনি। (ঈশ্বরিক নয়, মানবিক বৈশিষ্ট্যের সবকটি দোষগুণই প্রকট হয়েছে কাহিনির পরতে পরতে। মানবজাতির সবরকম অবদমিত ইচ্ছা পুরাণগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।) সেই থেকেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের গাঁটছড়া। অর্থাৎ রাজনীতি আর ধর্মের সহবাস আদিকাল থেকেই। একে অপরের পরিপূরক। একেই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ধর্ম ছাড়া রাজনীতি অচল, রাজনীতি ছাড়া ধর্ম অচল। পতাকার রং যাই-ই হোক, ধর্মই তাঁদের তুরুপের তাস।

বেদ এবং উপনিষদে একেশ্বরবাদ বর্ণিত হলেও পুরাণে যেন দেবতাদের মিছিল চলতে লাগল। কাড়ি কাড়ি দেবতা। দেবতার দেবতা এবং তার দেবতার তস্য দেবতা। গৌণ দেবতা এবং মুখ্য দেবতা। প্রধান দেবতা এবং অপ্রধান দেবতা। দেবতারা কী ভয়ানক এবং একই সঙ্গে কত করুণাময় সেটা বোঝাতে আমদানি করা হল দৈত্য, দানব, রাক্ষস-খোক্ষস, অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অবশ্য সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ত্রিমূর্তিবাদ, অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। ক্রমশ হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্ম ছেড়ে পুরাণভিত্তিক ধর্ম হয়ে উঠল। সারা ভারতে হিন্দুগণের পূজার্চনা, ব্রত, নিয়ম সবকিছুই পুরাণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল। বৈদিক অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র দেবতার পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি ঈশ্বরগণ প্রতিষ্ঠা পেল। চিন্ময়ী উপাসনা মৃন্ময়ী মূর্তিতে চলার জন্য পুরাণেই ব্যবস্থা হল। হিন্দুধর্মে প্রবেশ ঘটল বহুত্ববাদিতার স্বরূপ পৌত্তলিকতার। এই পৌত্তলিকতা এবং পুরাণ-কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করে কায়েম হল ব্রাহ্মণ্যবাদ।

ব্রাহ্মণগণের দ্বিতীয় মহার্ঘ আবিষ্কার হল সংস্কৃত ভাষা। এই সেই ভাষা যা দেবভাষা তথা দেবনাগরী বলে তকমা পেল। অর্থাৎ এ ভাষায় দেবতারা কথা বলেন—দেবতারা কথা বলেন, তাই ব্রাহ্মণগণ সেই ভাষায় কথা বলেন। অতএব দেবতাগণই ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণই ঈশ্বর বা দেবতা। ৩৬টি পুরাণ, একটি মনুসংহিতা এবং বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত অনুসরণে শত-সহস্র সাহিত্য লিখিত হল সংস্কৃত ভাষায়। এমন ভাষা, যা নিজেরাই লিখলেন, নিজেরাই পড়লেন, নিজেরাই বুঝলেন।

ব্রাহ্মণগণের তৃতীয় আবিষ্কার আত্মা, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, জন্মান্তর, কর্মফলের ধারণা ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণগণের চতুর্থ আবিষ্কার অভিসম্পাত এবং আশীর্বাদ ইত্যাদি।

একদা ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে কী অগ্নি নিঃসৃত হইত? এমন কথা অবশ্য অনেককে বুক ফুলিয়ে বলতে শুনেছি — "আগে ব্রাহ্মণদের মুখ দিয়ে আগুন বেরুত"। কী মনে হয় পাঠকবন্ধু? উঁহু, ব্রাহ্মণদের মুখ দিয়ে আগুন কোনোদিন নিঃসৃত হত না, এগুলি ব্রাহ্মণদের ভয়-সঞ্চারের কৌশল — গল্পকথা। মুখ দিয়ে যা বেরত, তা হল অভিসম্পাত। সাধারণের মনে ভীতি সঞ্চার করতে কথায় কথায় অভিশাপ আর ক্রোধ বর্ষণ হত। এই অগ্নিরূপ অভিসম্পাতই ব্রাহ্মণের প্রতি ভীতির কারণ। পুরাণগুলি পরতে পরতে ব্রাহ্মণগণ কখন অভিশাপ দেন এবং কী অভিশাপ দেন এবং অভিশাপের ফলে কী পরিণতি হয় সেই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। দুর্বাশার অভিশাপে দুষ্যন্তের স্ত্রী শকুন্তলাকে ভুলে যাওয়া, ভরতমুনির অভিশাপে অপ্সরা উর্বশীর পৃথিবীতে পতন, এমনকি সব অসুর-দৈত্যরাই অভিশাপের পরিণাম ভোগ এবং অবশেষে মুক্তি — ইত্যাদি হাজারো সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কাহিনি। শুধু পুরাণই নয়, প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে ব্রাহ্মণের রোষে কী পরিণাম হতে পারে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস বিরচিত "রঘুবংশম"-এ দেখছি পূজ্য ব্যক্তিদের (পড়ুন ব্রাহ্মণদের) কোনোভাবেই অসম্মান করা উচিত নয়। পূজনীয় ব্যক্তির পূজার্চনায় বিঘ্ন ঘটলে শ্রেয়লাভের নানা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। প্রাচীন ভারতে রাজাদের মধ্যে নিমি, নহুষ প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হওয়া সত্ত্বেও পূজনীয় ব্রাহ্মণদের অপমান করার জন্য তাঁরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাচ্চা ব্রাহ্মণ পূজনীয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও পূজনীয়। পুরাণগুলি পাঠ করলেই স্পষ্ট হয় ব্রাহ্মণগণ মোটেই ষড়রিপুমুক্ত ছিলেন না; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য — সবই বিদ্যমান ছিল। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মায় আগ বাড়িয়ে ব্রাহ্মণ বাল্মীকি অভিসম্পাত করলেন শিকারি নিষাদকে (ব্যাধ)। প্রণয়মিলনে মত্ত এক ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষটিকে তীরবিদ্ধ করে জনৈক ব্যাধ হত্যা করে। পুরুষ সঙ্গীর মৃত্যুশোকে নারী ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপ আকাশ-বাতাস মুখরিত হল। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বাল্মীকির মনে হল শিকারি নিষাদ অত্যন্ত গর্হিত এবং নিষ্ঠুর কাজ করেছে। তখন তাঁর মুখ থেকে স্বভাবসিদ্ধ আচরণে শাপবাণী তীব্র গরলের মতো নির্গত হল — "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ/যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্"। অর্থাৎ, ক্রৌঞ্চযুগলের থেকে প্রেমবিবশ একটি পাখিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা সে যে পাপকর্ম করেছে তার ফলে সেই ব্যাধ চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। কোনোদিন সুখৈশ্বর্য, গৌরব, প্রতিপত্তি কোনোরকম প্রতিষ্ঠা সে পাবে না, অর্থাৎ সে নির্বংশ থাকবে। ওঃ ভাবা যায় না। 'রামায়ণম্' নামক একটি মহাকাব্য শুরুই হল অভিসম্পাত দিয়ে। এই সেই 'রামায়ণম্', যা পবিত্র — যেখানে এক উচ্চজাতি তথা ব্রাহ্মণ দ্বারা অভিসম্পাত বর্ষিত হল এক অন্তজ্য ব্যাধের জীবনে। এটিই বোধহয় সর্বকালের বিখ্যাত অভিসম্পাত।

মজার ব্যাপার হল পুরাণ-মহাভারতের ক্ষত্রিয়গণ কেউ যৌনক্ষম, কেউ-বা জন্মদানে অক্ষম। অক্ষম পুরুষে ছড়াছড়ি। বীর্যহীন পুরুষের কাহিনি। অথচ ব্রাহ্মণগণ দেখুন কেমন বীর্য বিতরণে সক্রিয়! ব্রাহ্মণগণ ঘোষণা দিলেন "পুত্রার্থে ভার্যা"। বললেন, অপুত্রক রাজার মুখ দেখা

অশুভ। রাজাগণও সন্তান নয়, পুত্রলাভের জন্য অস্থির। বিচিত্রবীর্য, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, দশরথ, দিলীপ প্রমুখ অসংখ্য ক্ষত্রিয় রাজাগণ অপুত্রক ছিলেন। ব্রাহ্মণদের শয্যাসুখেই তাঁরা পুত্রবান হলেন। কীভাবে? সবার কথা এখানে আলোচনা করার পরিসর নেই। কালিদাস বিরচিত মহাকাব্য "রঘুবংশম্" থেকে অমিত পরাক্রমশালী বীর রাজা দিলীপের অপুত্রক হওয়ার থেকে পুত্রবান পুরাণকথা শুনব।

সন্তানলাভের উপায় অন্বেষণের জন্য রথে চড়ে এক সন্ধ্যায় সমবেত হয়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র গুরু বশিষ্ঠ এবং গুরুপত্নী অরুন্ধতীর চরণ বন্দনা করেন। এরপর পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর রাজা দিলীপ আসল কথাটি বলে ফেললেন। বললেন, রাজ্ঞী সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্র না-হওয়ায় অনন্ত রত্নপ্রসবিনী বিশাল পৃথিবীও তাঁকে সুখদান করছে না। তাঁর পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় ভুগছেন। তাই কুলগুরু বশিষ্ঠ যেন তাঁর পিতৃঋণ মোচনের জন্য সন্তানলাভের ব্যবস্থা করে দেন। ব্রাহ্মণ শিরোমণি বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বললেন, সেবার দ্বারা নন্দিনীকে (স্বর্গের কামধেনু, বশিষ্ঠের হোমধেনু) প্রসন্ন করলে দিলীপের পুত্রলাভের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। কেমন সেই সেবা? অভ্যাস দ্বারা যেভাবে বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে হয়, সেইভাবে ফলমূলাদি (বন্যবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা) আহার করে ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা এবং সর্বদা অনুগমনের মধ্য দিয়ে নন্দিনীকে প্রসন্ন করতে হবে। অর্থাৎ নন্দিনী প্রস্থান করলে রাজাও প্রস্থান করবে, সে অবস্থান করলে রাজাও অবস্থান করবেন। নন্দিনী জলপান করলে রাজাও জলপান করবেন। তপোবনের সীমান্ত পর্যন্ত নন্দিনীকে অনুসরণ করতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। নন্দিনী চরতে চরতে এমনভাবে প্রতিদিনই সীমান্ত অতিক্রম করে এবং রাজাও বশিষ্ঠের কুঠির ত্যাগ করে বহুদূর চলে আসে। সেইসময় এই অবকাশে সুদক্ষিণার সঙ্গে বশিষ্ঠের সম্ভোগ-সুখ বিনিময় হতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে পুত্রলাভের আশীর্বাদ। সুদক্ষিণা গর্ভবতী হলেন। বাকিটা অনুমেয়।

পুরাণে উল্লেখ্য ছিল ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব বর্ণের মানুষ শংকর, তারাই শুধু আদি অবিমিশ্র রক্তধারার আর্য এবং সেই কারণেই তারা শ্রেষ্ঠতম। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছিল রাজাদের পুরোহিতদের সহায়তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এমন কি রাজার পক্ষে সঠিক পথে চলার নিমিত্ত পুরোহিতদের প্রয়োজন। পুরোহিত ক্ষত্রিয়ের আত্মা, কারণ পুরোহিত ব্যতীত রাজার অন্ন দেবতারা গ্রহণ করে না কিনা! অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়রা শাসক সম্প্রদায় হলেও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেই রাজ্যশাসন করতে থাকবে। শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহ, অগস্ত্য নামক ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় ঐন্দ্রধনু, খড়্গ, অক্ষয় বাণ, তূর্ণী দ্বারা ক্ষত্রিয় ভগবান (?) শ্রীমান রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রায় চোদ্দো হাজার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের (যাঁদেরকে রামায়ণে রাক্ষস-খোক্ষস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে) নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন। "রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ" (রামায়ণম্-বালকাণ্ডম্ — প্রথম সর্গ, ৪৯তম শ্লোক)। প্রাচীনকালে রাজারা সজ্ঞানেই ব্রাহ্মণদের কখনও ঘাটতে যাননি, কারণ শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের কাছে ব্রাহ্মণরা ঈশ্বর এবং ধর্মের নামে নিজেদের চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার অনেক আগে থেকেই। তাই রাজারা ব্রাহ্মণদের তোশামোদ করেই প্রজাদের শাসন-শোষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে চাইতেন। রামায়ণের রামচন্দ্রের বনবাস হয়েছিল দশরথ কর্তৃক কৈকয়ীর কথা রাখতে, যুদ্ধ করতে নয়। বনবাসে গিয়ে কতিপয় ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় ব্রাহ্মণদের স্বার্থে হাজার হাজার আদিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন, যার পরিণতি লঙ্কাযুদ্ধ। দক্ষিণ ভারত আর উত্তর ভারতের লড়াই।

ঠিক এই সময়েই ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কীর্তন-গাঁথা রচনায় মনোযোগ দেন। তাতেও যখন কাজ হচ্ছিল না তখন তারা কর্মফল, পুনর্জন্ম, আত্মা-পরমাত্মা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি তত্ত্ব রচনাতে মনোনিবেশ করেন। পার্থিব ব্রাহ্মণ হত্যাকে 'ব্রহ্ম হত্যা পাপ' নামে স্বর্গীয় পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আরও কঠোর করা হল ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্যবাদী প্রকল্পের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

আসলে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মটি আদতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম। বেদ বা বৈদিক আশ্রিত নয়, পুরাণ বা পৌরাণিক আশ্রিত। অনেক বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণদের মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম হয়ে গেল। এ এমন এক মতবাদ, যা মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ শূদ্রদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করল। শুধু শূদ্রদের কেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদেরও কব্জা করে ফেলেছিল এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গণ। ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রশিক্ষাও তাঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন জটিল কৌশলে। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রগুরু হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এমনকি রাজকার্য পরিচালনাতেও ক্ষত্রিয়দের অভিভাবক এই ব্রাহ্মণই। বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, বশিষ্ঠ প্রমুখ ক্ষত্রিয়দের গুরু ছিলেন। আর তাই বশিষ্ঠের নির্দেশেই ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র শূদ্র-তপস্বী শম্বুককে নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বহুবার চেষ্টা করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। পারেনি। যতবারই চেষ্টা করেছে ততবারই ব্রাহ্মণগণ নির্মমভাবে শাস্তিবিধান করেছেন। ব্রাহ্মণ পরশুরামের কথা মনে পড়ছে? ইনি পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। মানে ক্ষত্রিয়দের ধরে কচু-কাটা করেছিলেন।

অপরদিকে ক্ষত্রিয়-সন্তান বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত জনসাধারণের উপর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল অপ্রতিরোধ্য। ধর্মচিন্তাকে সুসংবদ্ধ করতে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখতে তৈরি করেছিলেন উপাসনালয় এবং এর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল উপাসক বা পুরোহিত সম্প্রদায়। প্রাচীন ভারতে উপাসকদের মনোনীত করতে হত। ক্রমশ এই উপাসক বা পুরোহিতদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই সুবাদে তারা হস্তগত করে ফেলেন উপাসনা পদ্ধতি প্রণয়নের অধিকারও। যাদের কাজ ছিল বিশ্বাসীদের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রথার জন্ম দিয়ে ঈশ্বর এবং তার কল্পিত অনুচরদের তুষ্টি বিধানের পাশাপাশি নিজেদের তুষ্টি এবং পুষ্টিসাধন। উপাসনার নেতৃত্ব দিতে উপাসক বা পুরোহিতরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছিলেন সেটি হচ্ছে দৈবশক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্যরচনা সৃষ্টি, যাকে বলা হয় "মন্ত্র"। প্রথমদিকে বৈদিক ধর্মগুরুরা ছিলেন মন্ত্র রচয়িতা। এরপর মূলত ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রকাররা সনাতন ধর্মের সাংগঠনিক রূপ দেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালীরা শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে আঁতাত করে চতুর্বর্ণ প্রথার জন্ম দেন। এই বর্ণপ্রথার বর্ণপ্রধান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ব্রাহ্মণগণ এবং স্বাভাবিকভাবেই উপাসনার জন্য মন্ত্র-স্তোত্র-স্তব রচনা করার ক্ষমতা অধিকার করেন। সম্ভবত ব্রাহ্মণরাই একমাত্র পূজারী শ্রেণি যারা জন্ম সূত্রে এই অধিকার পান (যদিও এ ব্যাপারটি অশাস্ত্রীয়)। অবশ্য শুরুর দিকে ব্রাহ্মণরা উত্তরাধিকার সূত্রে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। এজন্য বিশেষ গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। বর্ণপ্রথা পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সনাতন ধর্ম চেপে বসার আগে মন্ত্র রচনা করে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন যে কেউ। এমনকি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণরা উপাসনার দায়িত্ব ছেড়ে বেছে নিতে পারত অন্য যে-কোনো পেশাও।

সমাজের সুবিধাবাদী মন্ত্র-রচয়িতা ব্রাহ্মণরা খুব সহজেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন ধর্মীয় কাজ

মায় ঈশ্বরের উপাসনা কর্মটি একাধারে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব প্রাধান্য বিস্তারে একটি শক্তিশালী নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে এবং এই চিন্তাসূত্রে ক্রমশ শাসক এবং মন্ত্র-রচয়িতা সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থের তাগিদে তৈরি করতে থাকে উপাসনা প্রকল্প। মগধীয় যুগ এবং মৌর্য যুগ — এসময়ই ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর দাবি করে শাস্ত্র রচনা শুরু করেন। এরপর আবিষ্কার করা হল বারো-মাসে তেরো পার্বণ — সারা বছর, প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কর্তৃক মানুষকে স্বর্গে পৌঁছে দেওয়ার এইরকম বিশাল এবং সফল ইন্ডাস্ট্রি পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই!

একদা ব্রাহ্মণগণ সবচেয়ে বেশি লাভবান হতেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ হত। কেমন ছিল সেই সেকালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান? তার আগে জেনে নিই হিন্দুদের আদি বা মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়ে কী নির্দেশ দিয়েছেন প্রাচীন প্রাজ্ঞগণ। বৈদিক সংস্কারে মৃতের শেষকৃত্য সমাপনে যে মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় তা পৌরাণিক নিয়ম অর্থাৎ হিন্দুদের বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম বা মন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈদিক নিয়মে মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে দুই থেকে তিনদিন লাগে। মানুষ মারা গেলে তাকে দাহ করার নাম "অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া"। 'অন্ত্যা' অর্থে অন্তিম, চরম বা সর্বশেষ এবং 'ইষ্টি' অর্থে যজ্ঞ, শুভকর্ম বা সংস্কারকে বোঝায়। বৈদিক পণ্ডিত শ্রীমদ্ দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর রচিত "সংস্কার বিধি"-তে বলেছেন, "এখানে 'ইষ্টি' বলিতে যজ্ঞ বা শুভকর্ম বোঝায় বলিয়া অন্ত্যেষ্টি কর্মে পুণ্যই হইয়া থাকে। ইহাতে পাপ বা অশৌচ হইলে ইহার নাম 'ইষ্টি' হইত না। 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দ স্বয়ং ঘোষণা করিতেছে যে, মৃতদেহ দাহ করাই পুণ্যের কাজ"। বড়ো জোর, স্বামী দয়ানন্দ বলেছেন, শব দাহান্তে যে গৃহে মৃত্যু হয়েছে সেই গৃহ মার্জন, লেপন ও প্রক্ষালন করে বিশুদ্ধ করে নেওয়া যেতে পারে। এমনকি স্বস্তি বাচন ও শান্তি প্রকরণাদি মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করা যেতে পারে। কিন্তু পুরাণগুলির (বিশেষ করে গোরুড়পুরাণ) ছত্রে ছত্রে যজমানদের নিঙড়ে কামানোর ফরমান। সবৎস্য গোরু দান, ভূমিদান, স্বর্ণদান, ষোড়শদান (১৬টি দ্রব্য — ভূমি বা ভূমিমূল্য, আসন, শয্যা, অন্ন, বস্ত্র, গোরু, জল, প্রদীপ, তাম্বুল, ছত্র বা ছাতা, গন্ধ, মাল্য বা মালা, ফল, পাদুকা, সোনা, রুপো। এগুলি দান করলে মৃত ব্যক্তি ৯৬০ হাজার বছর স্বর্গে সুখে কাল কাটাতে পারবে। মৃতের আত্মীয়গণ যত ভালো ভালো দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করতে পারেন তত ভালো দ্রব্যাদি মৃত ব্যক্তি স্বর্গে পাবেন।), মৃতের পছন্দের জিনিসপত্র, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি কঠোর বিধান। সার্মথ্য থাক-বা-থাক, প্রয়োজনে ভিক্ষা করে এসবের আয়োজন করতে হবে। এইসব ব্রাহ্মণগণ মৃত আত্মীয়দের স্বর্গে পাঠানোর বাহানায় সমগ্র হিন্দুজাতিকে ভিখিরি করে ছেড়েছে অবিলম্বে এই ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটুক।

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বুঝলেন বেদ অনুসরণ করলে ব্যাপক কোনো ফায়দা হবে না। অথচ মৃতের পরিবারের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে ব্যাপক ফায়দা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যু একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়। কোন্ পরিবার না-চায় তাঁর মৃত সদস্য স্বর্গসুখ পাক? অতএব মৃত সদস্যের স্বর্গের সমস্ত রকম সুখ দেওয়ার সবরকম ব্যবস্থার বিধি সৃষ্টি করতে হবে। অতঃপর ব্রাহ্মণগণ পুরাণের মতো গ্রন্থগুলি রচনার কাজে হাত দিলেন। রচিত হল ১৮টি পুরাণ এবং ১৮টি উপপুরাণ নামক আকর গ্রন্থ। এই পুরাণগুলির পাতায়

পাতায় বর্ণিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ বিষয়ক ভয়ংকর সব বক্তৃতা এবং স্ববিরোধী নিয়ম-বিধি-বিধান। এই পুরাণগুলিই হল ব্রাহ্মণ্যবাদের রক্ষাকবচ। ব্রাহ্মণ্যবাদের আলোচনায় পরে আসছি। এখন ফিরে যাই শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গে। নিয়ম করলেন শোকার্ত পরিবারের কাছ থেকে কীভাবে কতটা চুষে খাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে চার্বাক সম্প্রদায়ের বাণী মনে পড়ছে — বেদ ভণ্ড, ধূর্ত, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রচনা। জীবিকা অর্জনের স্বার্থে তাঁরা স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ঈশ্বর, কর্মবাদ, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, আত্মা ইত্যাদি মিথ্যা অলৌকিক ধারণা প্রচার করে সাধারণ অসহায় মানুষদের যাগযজ্ঞ অসহায় মানুষদের যাগযজ্ঞ বাধ্য করে। হাজার হাজার বছর আগে চার্বাক সম্প্রদায় যে সত্য অবলোকন করলেন হাজার হাজার পরেও আমরা সভ্য-শিক্ষিত মানুষজন তা অনুধাবন করতে পারলাম না। রহস্যটা কী?

নিয়ামক — হ্যাঁ, সেই নিয়ামকের মিশনে পৌঁছে যেতে ব্রাহ্মণরা কুলশ্রেষ্ঠের মর্যাদাটি দখল করে নেয়। তারা রচনা করতে থাকে দুর্বোধ্য সব মন্ত্রাদি, বেছে নেন সংস্কৃত ভাষার মতো দুর্বোধ্য এবং অপ্রচলিত কৃত্রিম ভাষা। যে ভাষা ওরা ছাড়া কেউ বুঝত না, বোঝার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সমাজের মাঝে প্রধান হয়ে উঠার জন্য এটিই ছিল অমোঘ হাতিয়ার। মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক মোহ দিয়ে তারা ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মন্ত্রকে ঈশ্বরের বাণী বলে প্রচার করতে থাকেন এবং সমাজের প্রায় সবার সমর্থনে আসন গেঁড়ে বসেন সমাজের শিখরে। সেখান থেকে যাতে কোনোভাবেই প্রত্যাবর্তন না-করতে হয় সেইজন্য দ্বিতীয় কুলশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা রাজা-শাসকদের সঙ্গে বেজায় কূটনীতিক সদ্ভাব অব্যাহত রাখা হত। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের পিঠ চাপড়াতেন, ক্ষত্রিয়ের সপক্ষে কাব্য-মহাকাব্য লিখতেন। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের পিঠ চাপড়াতেন, প্রশংসা করতেন, উপাধি দিতেন, অর্ধেক রাজ্য দিতেন ইত্যাদি — এভাবেই ধীরে ধীরে আম-আদমিদের অভিশাপ-আশীর্বাদের ভয়-ভরসা প্রদর্শন করে গড়ে তোলা হয়েছিল সনাতন ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ, যা আরও অনেক পরে হিন্দধর্ম হিসাবে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে ক্ষত্রিয়রা শাসক সম্প্রদায় হলেও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেই রাজ্যশাসন করবে — এই হল অদৃষ্ট, নিয়তি। তৎকালীন (তৎকালীন কেন, আজও শাসকগণ ধর্মীয় মাতব্বরদের অত্যন্ত সমীহ করে চলেন) রাজারা সজ্ঞানেই ব্রাহ্মণদের কখনও ঘাটতে যাননি। কারণ যে বিপুল 'শাস্ত্র' রচনা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের কাছে ব্রাহ্মণরা ঈশ্বর এবং ধর্মের নামে নিজেদের চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার অনেক আগে থেকেই। তাই রাজারা ব্রাহ্মণদের তোশামোদ করেই প্রজাদের শাসন-শোষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে চাইতেন। চাউর করে দেওয়া হল ব্রাহ্মণ হত্যা করলে বেহ্মদত্যি হয়। বলা হল ৮৪ লক্ষ যোনি ভেদ করে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। ইতিহাসবিদ এবং পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, মৌর্যযুগে ধর্ম এবং ধর্মীয় কাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিরোধ্য। রাজ-দরবার এবং আইন-আদালত সর্বত্র প্রধান উপদেষ্ঠা হওয়ার কারণে এবং সব শ্রেণির কাছ থেকে দানদাক্ষিণ্য পেয়ে এক বিশাল বিত্তশালী শ্রেণিতে পরিণত হয় ব্রাহ্মণগণ। অনেকে আবার সরাসরি রাজকর্মও নির্বাহ করতেন। একসময় মগধ এবং মৌর্য রাজ্যগুলিতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অরক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের চিন্তাগত দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

পুরাণ মতেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হলেই কেবল ব্রাহ্মণত্ব অর্জিত হয়। তারপরও সনাতন ধর্ম যুগ যুগ ধরে চতুর্বর্ণভেদ টিকে ছিল প্রায় হাজার বছর ব্যাপী। তবে ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় চাতুরি কার্যকারিতা হারাতে থাকে উনিশ শতকের শেষের দিকে। ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে উদ্ভূত কয়েকটি কদাচার-কুৎসিত সংস্কারের পর থেকেই এই অবরোহণের শুরু। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের সংস্কার আন্দোলনে এবং ব্রিটিশশাসকদের হস্তক্ষেপে ব্রাহ্মণরা ক্ষমতা হারাতে শুরু করেন। এই শতকেই দেবদাসী প্রথার আইনানুগ অবসান, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহের প্রচলন, কৌলীন্য প্রথার বিলোপ, ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন এবং ছুৎমার্গের বাড়াবাড়ি অনেকটা কমে আসা থেকে ব্রাহ্মণদের খর্বতা শুরু হয়েছিল। কেন ব্রাহ্মণদের এরকম খর্বতা শুরু হয়েছিল? কেন ব্রাহ্মণদের সম্মান নষ্ট হতে শুরু করল?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধে লিখছেন, "ব্রাহ্মণও যখন আপন কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন কেবল গায়ের জোরে পরলোকের ভয় দেখাইয়া সমাজের উচ্চতম আসনে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। কোনো সম্মান বিনামূল্যের নহে। যথেচ্ছ কাজ করিয়া সম্মান রাখা যায় না।" অপরদিকে প্রাজ্ঞ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী একটি প্রবন্ধে বলেছেন — "ত্যাগ-বৈরাগ্য-কৃচ্ছ্রতা নেই, ঋজুতা নেই, তপস্যা নেই, অথচ অর্থগৃধ্নুতা আছে, আত্মম্ভরিতা আছে, মাতব্বরি আছে, ভয় দেখানো আছে, এমন ব্রাহ্মণ্য সামাজিক মানুষের সম্মান লাভ করতে পারে না। .....প্রথাগত ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে, জন্মব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে অথবা ব্রাহ্মণ্য-প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং গুপ্ত সমালোচনা কিন্তু অনেকদিনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মধ্যেই হয়েছিল। শুধুমাত্র শুষ্ক আচার দেখিয়ে, গুরুর গৌরব দেখিয়ে, পিতার গৌরব দেখিয়ে অধস্তন বর্ণকে অপমান করার একটা আদত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মধ্যে এমনভাবে নিহিত হয়ে গিয়েছিল যে, গৌরবযুক্ত পিতামাতার পুত্র-কন্যারা এবং অনুপযুক্ত শিষ্যরাও সমাজভুক্ত অধর বর্ণকে কথায় কথায় অপমান করে বসত।

একদা ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রবৃত্তি যেমন ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে উজ্জীবিত থাকতেন, ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যও ক্ষত্রিয়ের দয়া-দাক্ষিণ্য-উপঢৌকন-উপাধি প্রাপ্তের নির্ভর ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দুই বর্ণই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক — সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম। অবশ্য কালের নিয়মে একদিন কার্তবীর্য বললেন, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের আশ্রয় করে আছেন, এটা ঠিক। কিন্তু কোনোভাবেই ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের আশ্রয় করে নেই — "ব্রাহ্মণাঃ সংশ্রিতাঃ ক্ষত্রং ন ক্ষত্রং ব্রাহ্মণাশ্রিতম"।

অথচ ভাবুন ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় রাজনীতি থেকে উদ্ভূত প্রভাব প্রবল বাধাগ্রস্ত হয়েছিল সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে। এ পর্বে 'ভক্তিবাদ' আন্দোলন গড়ে উঠে গোটা ভারতবর্ষে। ভক্তিবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেন ব্রাহ্মণদের বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। এতে ধ্বনিত হয় সামাজিক প্রতিবাদের সুর। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির সঙ্গে শেষপর্যন্ত টিকতে না-পারলেও 'ভক্তিবাদ' আন্দোলনই সনাতন ভক্তদের মনে জন্ম দেয় বর্ণবাদ এবং বর্ণশ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের আগ্রাসনে-

আক্রমণে-অত্যাচারে বারবার বিপন্ন বিপর্যস্ত হয়েছে সনাতন ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা হিন্দুধর্ম। ব্রাহ্মণগণ বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে ধর্মীয় অনুশাসনগুলিকে আরও কঠোর থেকে কঠোরতম করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করেছে। ব্রাহ্মণগণের অমানবিক বিধানে জর্জরিত হয়ে তথাকথিত নীচুতলার মানুষগুলো দলে দলে কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান, কেউ বৌদ্ধ হয়ে গেছেন। দলে দলে। কখনো শুনিনি অন্য কোনো ধর্মের মানুষ হিন্দুধর্মকে ভালোবেসে হিন্দু ধর্মাচরণ করছে। খানখান হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ, কঠোরতার কারণেই। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। পরবর্তীকালে কেরলিয়ান ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য (আদি) নরমে-গরমে একবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন ভারতে ব্রাহ্মণ্যশাসন কায়েম করতে। এ ছাড়া বিভেদনীতির মাধ্যমে ক্ষত্রিয়শক্তিকে দুর্বল করে তোলেন। ফলে অতি সহজেই মুসলমান শক্তি ভারতে দ্রুত প্রসার লাভ করে। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে এবং সহায়তায় মুসলমান শাসকদের পরাভূত করে ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বেনিয়া-নেতা গান্ধিজীকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভারতের শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে প্রয়াসী হন। সেই বিষয়টি ব্রিটিশপুঙ্গবগণ আন্দাজ করতে পেরে তার সদ্ব্যবহার করেছিল। দ্বিজাতি-তত্ত্বের আঁতুরঘর এখান থেকেই। মোদ্দা কথা, ব্রাহ্মণ্যবাদের জাঁতাকলে পড়ে হিন্দুধর্ম আজ বিপন্ন, বিপর্যস্ত, ছিন্নভিন্ন। প্রাচীন যুগ থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। জন্ম নিয়েছে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্মের মতো অসংখ্য বিকল্প ধর্মবাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্পৃশ্যতা এবং প্রাণীহত্যা অমানবিক নিদানকে হাতিয়ার করে ব্রাহ্মণ্যবাদকে নিকেশ করতে সামনে এগিয়ে এল বৌদ্ধধর্ম। বিশেষ করে ভারতবর্ষের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুশাসনের নামে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে দলে দলে বৌদ্ধধর্মে চলে আসতে থাকলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণবাদের পুরোধারা কখনো বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানালেন, কখনো-বা কৌশল অবলম্বন করে বৌদ্ধদের ভারত থেকেই প্রায় উৎখাত করে দিলেন। এই বৌদ্ধদের ঠান্ডা করতে ডাণ্ডা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেরলের ব্রাহ্মণ শংকরাচার্য এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো-শাগরেদরা। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য-সন্ত্রাস চালিয়েও বৌদ্ধদের যখন দমানো গেল না তখন কৌশলে ঘোষণা করে দেওয়া হল বৌদ্ধধর্মও যা, হিন্দুধর্মও তাই। কারণ ভগবান বুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশমাবতারের এক অবতার (যথাক্রমে মৎস্যাবতার, কূর্মাবতার, বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার, বামনাবতার, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃষ্ণাবতার, বুদ্ধদেব, কল্কি)। এরপর বেশ কিছুকাল ভালোই কাটছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুশাসন। শুরু হয়ে গেল সুদূর আরব থেকে মুসলিমদের ভারতে আগমন এবং আগ্রাসন। একে একে হিন্দুরাজাদের পরাস্ত এবং সিংহাসনচ্যুত করে মুসলিম শাসন। তারপর সুদীর্ঘ ৭০০ বছর ব্রাহ্মণ্যবাদ কোণঠাসা। চরম অবক্ষয় দৃশ্যমান হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদকে অস্বীকার করা শুরু হল গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। অন্ত্যজ শ্রেণি তো বটে, উচ্চবর্ণের অনেক মানুষও ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হতে থাকল। আরবি-ফারসি ভাষা শিখতে বাধ্য হল। মধ্যযুগের শিক্ষার ইতিহাসে মক্তব-মাদ্রাসা অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষারই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এরপর ভারতবর্ষে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তেই থাকল। দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় শক্তি হয়ে উঠল। এরই মধ্যে ভারতবর্ষে পোর্তুগিজ, ফরাসি, ব্রিটিশদের বণিকরূপে আবির্ভূত হয়ে অবশেষে হাতে উঠে এল শাসকের দণ্ড। শুরু

হয়ে গেল নতুন অধ্যায় — ব্রিটিশ শাসন। সেই সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে পীড়িত বাড়িয়ে মুসলিম বিরোধিতায় পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে ব্রিটিশদের ইন্ধন জোগানো। দ্বিজাতি-তত্ত্ব খাঁড়া করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আমাদের সাধের স্বাধীন ভারত, ধর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদ আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। শত বিভক্ত হয়েই রইল। আমি মনে করি এই ব্রাহ্মণ্যবাদকে উৎখাত না-করলে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে না।

ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে বদনামগুলি সর্বজনবিদিত, সেগুলি কি অনর্থক?—(১) লাখ টাকার ব্রাহ্মণ ভিখারি। (২) খাদ্য-লোভী ব্রাহ্মণ। এ কথাগুলি ব্রাহ্মণদের কতটা সম্মান প্রদর্শন করে! যজমানদের বাড়িতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের হামলা-হামলি করাই লাখ টাকার ভিখারি প্রতিপন্ন হয়। কিছু সুবিধাবাদী ধান্ধাবাজ ব্রাহ্মণ রাজানুগত্য পেয়ে রসে-ঘিয়ে থাকলেও অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের হাল মোটেই ভালো ছিল না। কারণ শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণগণ যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়ে থাকবে, পরের চাকরি করবে না, কৃষিকার্য করবে না এবং রাজবাড়ি বা ধনীদের গৃহে-দপ্তরে খিদমদগারির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করবে না। ব্রাহ্মণ হয়ে অন্য উপায়ে টাকাপয়সা করলে সমাজ নিন্দা করে। সবচেয়ে ঘৃণা করা হত রাজবাড়ির অর্থপুষ্ট ব্রাহ্মণকে। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগণও অন্য পেশায় নিযুক্ত না-হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। পেট বড়ো বালাই। বামনাইগিরির নিকুচি করেছে! অবশেষে মরা পোড়ানোর (ডোমের চাকরি!) চাকরি হলেও আবেদনপত্র প্রেরণ। রিক্সা চালানো, মোট বওয়া, জুতো পালিশ করা — এরকম সব ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে পারলে যজমানরা যেমন খুশি হন, তেমনি ব্রাহ্মণগণও যারপরনাই খুশি হন। সঙ্গে সন্তুষ্টজনক দক্ষিণা তো আছেই। তাই আজও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা-ভরে হলেও কোনো অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণভোজন করানোর রীতি চালু আছে। কেন-না "মুখ না থাকায় প্রেতাত্মা ব্রাহ্মণের মুখে করে যে ভোজন। / ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে প্রেতাত্মা করে যে রোদন।।" "মনুসংহিতার ১/৯৫ নং শ্লোকে যে বিধান আছে, তা দেখব — "যস্যাস্যেন সদাশ্নতিহব্যানি ত্রিদিবৌকনঃ।/ কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভুতমধিকং ততঃ।" অর্থাৎ, বাস্তবিক স্বর্গবাসী দেবগণও যাঁর মুখে হবনীয় দ্রব্য সামগ্রী সবসময় ভোজন করে থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ যাঁর মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে আর কেই-বা আছেন। তাই "তুষ্যন্তি ভোজনৈর্বিপ্রা ময়ূরাঃ ঘনগর্জিতৈঃ" এবং অবশ্যই "নৃত্যন্তি ভোজনৈর্বিপ্রা"।

শাস্ত্রমতে কর্মের ভিত্তিতে চার বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকারীরাই ব্রাহ্মণ। এখনকার সব পুরোহিতকে কে ব্রাহ্মণ বলছেন! আর বললেও কোন্ যুক্তিতে বলছেন? সব ব্রাহ্মণ কিন্তু পুরোহিত নয়। পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ আলাদা ব্যাপার। তবে আপনি যদি কোনো পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেন তবে দেখবেন তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন! আর তাঁরা তাঁদের বর্ণের পরিচয় এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, কারও হাতের অন্নগ্রহণকে পাপ বলে মনে করেন। যা হাস্যকর একটি ব্যাপার! একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে কেউই এই ধরনের ব্যবহার আশা করে না। আগেই বলেছি, জন্মগতভাবে তো কেউ

ব্রাহ্মণ হতে পারে না। এটা শুধুমাত্র একটা পদ বলতে পারেন। যেমন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার — এরকম! যোগ্যতার ভিত্তিতে! রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থগুলিতে লক্ষ করলেই আমরা তা জানতে পারব। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকারী। আমি যতটুকু জানি, কোনো নির্দিষ্ট দু-একটি গ্রন্থ পড়ে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। যাঁরা একটি ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নাম বলতে অক্ষম, তাদের ব্রাহ্মণ বলার যুক্তি কোথায় আমি বুঝি না!

ব্রাহ্মণ্যবাদ মুক্ত একটা সমাজ চাই। পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। পুরোহিতগিরি পেশাকে নির্মূল করতে না-পারলে লোক ঠকানোর ব্যাবসা বন্ধ হবে না। সমাজ থেকে পুরোহিতগিরি বর্জন করতে হবে। পুরোহিতদের প্রত্যাখ্যান করেই বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করা শুরু করতে হবে। সংস্কৃত ভাষার মোহ ত্যাগ করে বাংলায় প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর অবশ্যই শুনবেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ডঃ আম্বেদকরের বক্তব্য এখানে স্মতর্ব্য — "ধূর্ত ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র রচনা করে হিন্দুদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে একেবারে বোকা বানিয়ে ফেলেছে।" অতএব পুরোহিত বর্জন।

এ প্রবন্ধ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয় না এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিগণ প্রচলিত শ্রাদ্ধ না করে শুধুই শ্রদ্ধা জানান, বাকি সব বর্জন করুন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও রচনার দশম খণ্ডে লিখলেন — "মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে যায় এটা কল্পনামাত্র। সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখময় জীবনযাপন করে — এই ধারণা স্বপ্নমাত্র। স্বর্গ ও নরক এসব আদিম ধারণা।" ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আপনার মাতৃভাষায় স্বয়ং তার কাছে প্রার্থনা জানানো যায়। হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে চাইলে অবিলম্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্পত্তি করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের নাম ভাঙিয়ে যাঁরা নানা কিছু করেন, তাঁরা সোচ্চারে বলুন এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন। কী বলবেন? পড়ুন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজ" গ্রন্থে যা বলেছেন — "পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। যেখানেই পুরোহিততন্ত্রের আবির্ভাব, সেখানেই ধর্মের গ্লানি। .....এসো মানুষ হও। প্রথমে দুষ্টু পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও শুধরোবে না। .....আগে তাঁদের নির্মূল করো।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) ভারতীয় জাতি বর্ণ প্রথা — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, (২) ঋকবেদ, (৩) মনুসংহিতা — সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) গরুড়পুরাণ, (৫) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (৬) আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন — কঙ্কর সিংহ (৭) শ্রাদ্ধ ও পরলোক — দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, (৮) বৌদ্ধদর্শন — রাহুল সাংকৃত্যয়ন, (৯) সত্যার্থ প্রকাশ — দয়ানন্দ সরস্বতী, (১০) ব্রাহ্মণ্যবাদ — রণজিৎ কুমার শিকদার, (১১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্র, (১২) ধর্ম্মপদ।

গঙ্গাপুরাণ : পবিত্র অথবা অপবিত্রের গল্পগাথা

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হিন্দু জনজীবন আন্দোলিত হয়ে ওঠে গঙ্গার নাম-মাহাত্ম্যে, গঙ্গা মাহাত্ম্যে। ভারত নদীমাতৃক দেশ। ভারতের বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে নগর, তীর্থস্থান, বাণিজ্যকেন্দ্র প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে বিভিন্ন নদনদীর গুণকীর্তন শোনা যায়। ভারতীয় সমাজের প্রাণসঞ্চার ঘটিয়েছে নদনদী। প্রাচীন নদনদীর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান নদনদীর অবস্থান, সাদৃশ্য, ভুগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাণ, লৌকিক-অলৌকিক, পবিত্র-অপবিত্র, নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্টতা অনুধাবন করলে আমাদের জ্ঞান ও গবেষণা সার্থক হবে।

ভারত ও বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এই নদী জাতীয় নদীও বটে। গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৫২৫ কিলোমিটার — পশ্চিম হিমালয়ে ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে গঙ্গার উৎসস্থল। দক্ষিণ ও পূর্বে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে। জলপ্রবাহের ক্ষমতা অনুসারে গঙ্গা বিশ্বের প্রথম কুড়িটি নদীর মধ্যে অন্যতমা। গাঙ্গেয় অববাহিকার জনসংখ্যা ৪০ কোটি এবং জনঘনত্ব ১ হাজার জন। ফলত এটিই বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নদী অববাহিকা। হিন্দুদের কাছে গঙ্গা একটি পবিত্র নদী। তাঁরা গঙ্গাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করেন। গঙ্গার ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। একাধিক পূবর্তন প্রাদেশিক ও সাম্রাজ্যে রাজধানী (কলকাতা, কনৌজ, পাটলিপুত্র, কাশী, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের ও এলাহাবাদ) এই নদীর তীরেই অবস্থিত।

মূল গঙ্গা নদীর উৎসস্থল ভাগীরথী ও অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থল। হিন্দু সংস্কৃতিতে ভাগীরথীকেই গঙ্গার মূল প্রবাহ বলে মনে করা হয়। যদিও অলকানন্দা নদীটি দীর্ঘতর। অলকানন্দার উৎসস্থল নন্দাদেবী, ত্রিশূল ও কামেট শৃঙ্গের বরফ-গলা জল। ভাগীরথীর উৎস গোমুখের গঙ্গোত্রী হিমবাহ (উচ্চতা ১২,৭৬৯ ফুট)। গঙ্গার জলের উৎস অনেকগুলি ছোটো নদী। এগুলির মধ্যে ছয়টি দীর্ঘতম ধারা এবং গঙ্গার সঙ্গে তাদের সঙ্গমস্থলগুলিকে হিন্দুরা পবিত্র মনে করে। এই ছয়টি ধারা হল অলকানন্দা, ধৌলীগঙ্গা, নন্দাকিনী, পিণ্ডার, মন্দাকিনী ও ভাগীরথী। পঞ্চপ্রয়াগ নামে পরিচিত পাঁচটি সঙ্গমস্থলই অলকানন্দার উপর অবস্থিত। এগুলি হল বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ এবং সবশেষে দেবপ্রয়াগ — যেখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলনের ফলে মূল গঙ্গা নদীর জন্ম হয়েছে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৫০ কিলোমিটার। হৃষিকেশের কাছে গঙ্গা হিমালয় ত্যাগ করে তীর্থশহর হরিদ্বারে গাঙ্গেয় সমভূমিতে পড়েছে। হরিদ্বারে একটি বাঁধ গড়ে গঙ্গা খালের মাধ্যমে গঙ্গার জল উত্তরপ্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে জলসেচের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এদিকে গঙ্গার মূলধারাটি হরিদ্বারের আগে সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হলেও হরিদ্বার পেরিয়ে তা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়েছে।

এরপর গঙ্গা কনৌজ, ফারুকাবাদ ও কানপুর শহরের ধার দিয়ে একটি অর্ধ-বৃত্তাকার পথে ৮০০ কিলোমিটার পার হয়েছে। এই পথেই রামগঙ্গা (বার্ষিক জলপ্রবাহ ১৮ হাজার ঘনফুট) গঙ্গায় মিশেছে। এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে যমুনা নদী গঙ্গায় মিশেছে। সঙ্গমস্থলে যমুনার আকার গঙ্গার চেয়েও বড়ো। যমুনা গঙ্গায় ১ লক্ষ ৪ হাজার ঘনফুট জল ঢালে, যা উভয় নদীর যুগ্মপ্রবাহের জলধারার মোট ৫৮.৫%। এখান থেকে গঙ্গা পূর্ববাহিনী নদী। যমুনার পর গঙ্গায় মিশেছে কাইমুর পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদী তমসা (বার্ষিক জলপ্রবাহ ৬ হাজার ৭০০ ঘনফুট)। এরপর মিশেছে দক্ষিণ হিমালয়ে উৎপন্ন নদী গোমতী (বার্ষিক জলপ্রবাহ ৮ হাজার ৩০০ ঘনফুট)। তারপর গঙ্গায় মিশেছে গঙ্গার বৃহত্তম উপনদী ঘর্ঘরা (বার্ষিক জলপ্রবাহ ১ লক্ষ ৬ হাজার)। ঘর্ঘরার পর দক্ষিণ থেকে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে শোন (বার্ষিক জলপ্রবাহ ৩৫ হাজার ঘনফুট), উত্তর থেকে মিশেছে গণ্ডকী (বার্ষিক জলপ্রবাহ ৫৮ হাজার ৪০০ ঘনফুট) ও কোশী (বার্ষিক জলপ্রবাহ ৭৬ হাজার ৫০০ ঘনফুট)। কোশী ঘর্ঘরা ও যমুনার পর গঙ্গার তৃতীয় বৃহত্তম উপনদী।

অপরদিকে এলাহাবাদ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ পর্যন্ত গঙ্গা বারাণসী, পাটনা, গাজিপুর, ভাগলপুর, মির্জাপুর, বালিয়া, বক্সার, সৈয়দপুর ও চুনার শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ভাগলপুরে নদী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বইছে। পাকুরের কাছে গঙ্গার ঘর্ষণক্ষয় শুরু হয়েছে। এরপর গঙ্গার প্রথম শাখানদী ভাগীরথী-হুগলির জন্ম, এই নদীই দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে হয়েছে হুগলি নদী। বাংলাদেশ সীমান্ত পেরোনোর কিছু আগে হুগলি নদীতে ফারাক্কা বাঁধ গড়ে তোলা হয়েছে। এই বাঁধ ও ফিডার খালের মাধ্যমে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে হুগলি নদীকে আপেক্ষিকভাবে পলিমুক্ত রাখা হয়। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমের পর হুগলি নদীর উৎপত্তি। এই নদীর বহু উপনদী রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো উপনদীটি হল দামোদর নদ, অববাহিকার আয়তন ২৫ হাজার ৮২০ কিলোমিটার। হুগলি নদী সাগরদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বাংলাদেশে যমুনা নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত গঙ্গার মূল শাখাটি পদ্মা নামে পরিচিত। আরও দক্ষিণে গিয়ে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখানদী মেঘনার সঙ্গে মিশে মেঘনা নাম ধারণ করে শেষপর্যন্ত বঙ্গোপসাগরেই পড়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা-মেঘনা নদীর মিলিত জলপ্রবাহের চেয়ে একমাত্র আমাজন ও কঙ্গো নদীর জলপ্রবাহের পরিমাণ বেশি। পূর্ণ প্লাবনের ক্ষেত্রে একমাত্র আমাজনই দুই নদীর মধ্যে বৃহত্তর।

জেনে নিতে পারি ভারতের ভূতত্ত্ব অবস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশ ইন্দো-অস্ট্রেলীয় পাতের উপর ভারতীয় পাত নামে একটি ছোটো পাতের উপর অবস্থিত। এর গঠনপ্রক্রিয়া শুরু হয় ৭৫ কোটি বছর আগে দক্ষিণের মহামহাদেশ গণ্ডোয়ানার উত্তরমুখে অভিসরণের সময় থেকেই। এই গঠনপ্রক্রিয়া চলে ৫০ কোটি বছর ধরে। এরপর উপমহাদেশের

পাতটি ইউরেশীয় পাতের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এর ফলে জন্ম হয় বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়ের। এই উত্থানশীল হিমালয়ের ঠিক দক্ষিণে পূর্বের সমুদ্রতলে পাত সঞ্চারণের ফলে একটি বিশাল চ্যুতির সৃষ্টি হয়। এই চ্যুতিটি সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলি এবং গঙ্গার আনীত পলিতে ভরাট হয়ে বর্তমান সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির জন্ম দিয়েছে। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় একটি অগ্রভূমি অববাহিকা। পবিত্র গঙ্গা নদীর জলবিদ্যা, বিশেষত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে বেশ জটিল। তাই নদীর দৈর্ঘ্য, জলধারণ ক্ষমতা ও অববাহিকার আকার ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। নদীর 'গঙ্গা' নামটি হিমালয়ে ভাগীরথী-অলকানন্দার সঙ্গমস্থল থেকে ফারাক্কা বাঁধের কাছে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে নদীর প্রথম শাখানদীর উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। গঙ্গার দৈর্ঘ্য সাধারণত মনে করা হয় ২,৫০০ কিলোমিটার। এইসব ক্ষেত্রে নদীর উৎস ধরা হয় গোমুখে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ভাগীরথী নদীর উৎসস্থলটিকে এবং নদীর মোহানা ধরা হয় বঙ্গোপসাগরে মেঘনার মোহানাটিকে। অন্য মতে, গঙ্গার উৎস ধরা হয় হরিদ্বারে, যেখানে গঙ্গার পার্বত্য প্রবাহটি গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবেশ করেছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেঘনার বদলে শাখানদী হুগলির দৈর্ঘ্যশুদ্ধ গঙ্গার দৈর্ঘ্য মাপা হয়। এই দৈর্ঘ্যটি মেঘনার দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়ো। ভাগীরথীকে উৎস ধরে হুগলিসহ গঙ্গার দৈর্ঘ্য মাপলে মোট দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়ায় ২,৬২০ কিলোমিটার এবং হরিদ্বার থেকে হুগলির মোহানা পর্যন্ত গঙ্গার উৎস দাঁড়ায় ২,১৩৫ কিলোমিটার। অন্য মতে, ভাগীরথীর উৎস থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত গঙ্গার দৈর্ঘ্য মাপা হয়। কারণ এরপর নদীটি পদ্মা নাম নিয়েছে। এই দৈর্ঘ্যটি হল ২,২৪০ কিলোমিটার। একই কারণে, নদীর অববাহিকার আকার সম্পর্কের ভিন্নমত বর্তমান। নেপাল, চিন ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং ভারতের এগারোটি রাজ্য (হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ) ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি জুড়ে এই অববাহিকা অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা বাদে বদ্বীপসহ গাঙ্গেয় অববাহিকার আয়তন প্রায় ১০ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে ৮ লক্ষ ৬১ হাজার কিলোমিটার ভারতে, ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার নেপালে, ৪৬ হাজার কিলোমিটার বাংলাদেশে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার যৌথ অববাহিকার সামগ্রিক আয়তন প্রায় ১৬ লক্ষ কিলোমিটার বা ১৬ লক্ষ ২১ হাজার কিলোমিটার। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ও চিন জুড়ে প্রসারিত হয়ে আছে।

গঙ্গার জলধারণ ক্ষমতা কতটুকু? গঙ্গার জলধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সাধারণত মেঘনার মোহানার কাছে গঙ্গার জলধারণ ক্ষমতা মাপা হয়। এই পরিমাপের ফলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত জলের পরিমাণ জানা যায়। তিন নদীর বার্ষিক গড় জলধারণ ক্ষমতা ১৩ লক্ষ ঘনফুট, কারও মতে ১৫ লক্ষ ঘনফুট। কোনো কোনো মতে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার জলধারণ ক্ষমতা আলাদা আলাদাভাবে

দেখানো হয়। পৃথকভাবে এই তিন নদীর জলধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ঘনফুট, ৭ লক্ষ ঘনফুট ও ১ লক্ষ ৮০ হাজার ঘনফুট। বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে গঙ্গার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ ২৫ লক্ষ ঘনফুটেরও বেশি বলে নথিবদ্ধ হয়েছে। একই স্থানে সর্বনিম্ন জলপ্রবাহ ছিল প্রায় ৬ হাজার ৪০০ ঘনফুট (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে)। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু-ঘটিত বর্ষাকালের দ্বারা গঙ্গার জলচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বর্ষার ৮৪ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে গঙ্গার নিজস্ব জলপ্রবাহও ঋতুনির্ভর। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পরিমাপ অনুসারে শুখা মরসুম ও বর্ষাকালের জলপ্রবাহের অনুপাত ১:৬। এই ঋতুনির্ভর জলপ্রবাহ এই অঞ্চলে ভূমি ও জলসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা সমস্যার জন্মদাতা। ফলে খরা ও বন্যা দুই-ই দেখা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশে — শুখা মুরসুমে খরা ও বর্ষাকালে বন্যা একটি প্রধান সমস্যা।

অনেক বড়ো নদী রয়েছে গঙ্গার বদ্বীপে। এগুলির কোনোটি শাখানদী, কোনোটি-বা উপনদী। বস্তুত এই সব নদনদী সৃষ্টি করে রেখেছে এক জটিল নদীজালিকা। এদের মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বৃহত্তম নদী। দুই নদীই একাধিক শাখানদীতে বিভক্ত হয়েছে, আবার শাখানদীগুলিও পরস্পর মিলিত হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে এই নদীজালিকাগুলিতেও ভৌগোলিক পরিবর্তন দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর আগে গঙ্গার মূল প্রবাহ ছিল ভাগীরথী-হুগলি শাখানদীটিই। পদ্মা ছিল একটি ছোটো শাখানদী মাত্র। তবে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত আদিগঙ্গার মাধ্যমে, আধুনিক হুগলি নদীর পথে নয়। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভাগীরথী-হুগলি ও পদ্মার আকার প্রায় একই হয়ে দাঁড়ায়। ষোড়শ শতাব্দীর পরে পদ্মার আকার বৃদ্ধি পায় এবং তা গঙ্গার মূল প্রবাহপথে পরিণত হয়। অনেকে মনে করেন, ভাগীরথী-হুগলির প্রবাহপথটি ক্রমে ক্রমে পলি পড়ে রুদ্ধ হয়ে যায়। সেইজন্যই গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মার পথে সরে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষদিকে পদ্মাই গঙ্গার মূল প্রবাহপথ হয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গার মূল প্রবাহপথ পদ্মায় সরে যাওয়ার ফলে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পৃথকভাবে বঙ্গোপসাগরে না মিশে একসঙ্গে মিলিত হয়। গঙ্গা ও মেঘনার বর্তমান সঙ্গমস্থলটি দেড়শো বছর আগে গঠন হয়ে গেছে।

আঠারো শতকে শেষদিকে নিম্ন ব্রহ্মপুত্রেরও প্রবাহপথে নাটকীয় বদল এসেছিল, ফলে গঙ্গার সঙ্গে এর সম্পর্কটিই যায় বদলে, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্যা তিস্তা নদীর প্রবাহপথটি ঘুরে যায়। এই নদী আগে গঙ্গা-পদ্মার উপনদী ছিল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের বন্যার পর নদীটি গতিপথ পালটে পূর্বদিকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়ে। ফলে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ দক্ষিণে সরে আসে এবং একটি নতুন নদীপথের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মপুত্রের এই নতুন প্রধান গতিপথটির নাম হয় যমুনা নদী। এটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা-পদ্মায় মিলিত হয়। আগে ব্রহ্মপুত্রের গতি ছিল কিঞ্চিৎ পূর্বমুখী। তা ময়মনসিংহ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে মিশত। বর্তমানে এই নদীপথটি একটি ছোটো শাখানদী

হলেও পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নামে ব্রহ্মপুত্র নামটি অব্যাহত আছে। লাঙ্গলবাঁধে পুরোনো ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সঙ্গমস্থল হিন্দুদের কাছে আজও পবিত্র। এই সঙ্গমের কাছেই ঐতিহাসিক উয়াড়ি-বটেশ্বর অবস্থিত। ভৌগোলিক ব্যাপারটা যতটা সম্ভব আলোচনা করা গেল। কিন্তু গঙ্গার একটা আস্ত ইতিহাস আছে। সে ব্যাপারেও আলোচনা করার লোভ সামলাতে পারছি না।

১৯০০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দ সিন্ধুসভ্যতার অন্তিম হরপ্পা পযায়ে হরপ্পাবাসীরা সিন্ধু উপত্যকা ছেড়ে পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করতে করতে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব পর্যন্ত চলে আসে। যদিও কেউই গঙ্গা পার হয়ে পূর্বতীরে বসতি স্থাপন করেনি। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে হরপ্পা সভ্যতার ভেঙে যাওয়ার সময় থেকে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রটি সিন্ধু উপত্যকা থেকে সরে চলে আসে গাঙ্গেয় অববাহিকায়। গাঙ্গেয় অববাহিকায় অন্তিম হরপ্পা বসতি এবং সমাধিক্ষেত্র এইচ পুরাতাত্ত্বিক সংস্কৃতি, ইন্দো-আর্য জাতি ও বৈদিক যুগের মধ্যে কোনো সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে।

আদি বৈদিক যুগ বা ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা নয়, সিন্ধু ও সরস্বতী নদীই ছিল একমাত্র পবিত্র নদী। কিন্তু পরবর্তী তিন বেদে গঙ্গার উপরের অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাররপর মৌর্য থেকে মুঘল সাম্রাজ্য পর্যন্ত অধিকাংশ ভারতীয় সভ্যতারই প্রাণকেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় সমভূমি। ৩৫০ থেকে ২৯০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে প্রথম যে ইউরোপীয় পর্যটকের রচনায় গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁর নাম মেগাস্থিনিস। তাঁর রচিত 'ইন্ডিকা' বইটিতে বেশ কয়েকবার গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়—"ভারতে অনেক বড়ো ও নৌবহনযোগ্য নদী আছে। এই নদীগুলি উত্তর সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সমতল অঞ্চল বরাবর প্রাবাহিত হয়েছে। অনেকগুলো নদী আবার পরস্পর-পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিত রূপে গঙ্গা নদীতে মিশেছে। গঙ্গা নদী উৎসের কাছে ৩০ স্টেডিয়া চওড়া। গঙ্গা নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গারিডাই দেশের পূর্ব সীমান্তের মহাসাগরে পড়েছে।" এরপর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের (এখন যেটা বাংলাদেশ পরিচিত) মধ্যে গঙ্গার জলবন্টন নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এই বাঁধ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ৪০ হাজার ঘনফুট জল গঙ্গা থেকে ভাগীরথী-হুগলি নদীর পথে ঘুরিয়ে দেওয়া যাতে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষিত হয়। সেই সময় শুখা মরসুমে গঙ্গায় মোট জল থাকত ৫০ হাজার থেকে ৫৫ হাজার ঘনফুট। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শুধুমাত্র ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার ঘনফুট জলই অবশিষ্ট থাকে।

বিবাদের সূত্রপাত হয় পূর্ব পাকিস্তান এ ব্যাপারে আপত্তির কথা জানায়। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি ৩০ বছরের চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তির সারকথা গঙ্গায় যদি ৭০ হাজার ঘনফুটের কম জল প্রবাহিত হয়, তবে ভারত ও বাংলাদেশ ৫০ করে —অর্থাৎ ৩৫ হাজার ঘনফুট জল প্রতি দশদিন অন্তর পাওয়া যাবে। অবশ্য পরের বছরেই ফারাক্কায় জলপ্রবাহ

রেকর্ড পরিমাণে হ্রাস পেল। তার ফলে চুক্তির শর্ত মানা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপরদিকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলাদেশে গঙ্গার জলপ্রবাহের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে কম (৬ হাজার ৫০০ ঘনফুট)। পরের বছরগুলিতে অবশ্য শুখা মরসুমের জলপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে অবশ্য রাজনীতি, কূটনীতি এবং চিন্তাভাবনার স্তরে আছে।

হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জনক আদি শংকরাচার্য তাঁর রচিত "গঙ্গাস্তোত্রম্"-এ গঙ্গার যে মর্মে বর্ণনা করেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা যাক — "সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভুবনতারিণী, তরলতরঙ্গযুক্তা, শংকর-মৌলি-বিহারিণী, নির্মলা, দেবী গঙ্গা, তোমার পাদপদ্মে আমার সুমতি হোক (শ্লোক ১)। ভাগীরথী সুখদায়িনী মা, তোমার জলের মহিমা বেদাদিতে খ্যাত; আমি তোমার মহিমা জানি না; হে কৃপাময়ী, অজ্ঞ আমাকে ত্রাণ করো (শ্লোক ২)। হরির পাদপদ্ম থেকে তরঙ্গাকারে নির্গতা এবং তুষার চন্দ্র ও মুক্তার মতো শুভ্রতরঙ্গাযুক্তা গঙ্গা, আমার দুষ্কর্মের ভার দূর করো এবং কৃপাপূর্বক আমায় ভবসাগর থেকে উদ্ধার করো (শ্লোক ৩)। তোমার নির্মল জল যে পান করেছে সে সর্বশ্রেষ্ঠ ধামপ্রাপ্ত হয়েছে। মা গঙ্গা, যে তোমার ভক্ত তাকে যম নিশ্চয় দেখতে অসমর্থ, সে অমর (শ্লোক ৪)। হে পতিত-উদ্ধারিণী, জাহ্নবী, খণ্ডিত গিরিবরের দ্বারা মণ্ডিত তরঙ্গশালিনী, ভীষ্মজননী, জহ্নুকন্যা, পতিত-নিবারিণী গঙ্গা, তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা (শ্লোক ৫)। পারাবারবিহারিণী, দেববধূগণ কর্তৃক চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকিতা গঙ্গা পৃথিবীতে কল্পলতার মতো ফলদা তোমাকে যে প্রণাম করে সে শোকে পতিত হয় না (শ্লোক ৬)। নরক-নিবারিণী, কলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা কেউ যদি তোমার স্রোতে স্নান করে তবে সে পুনর্বার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না (শ্লোক ৭)। উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টা, পবিত্রতরঙ্গশালিনী, কৃপাকটাক্ষময়ী, ইন্দ্রের মুকুটমণির দ্বারা চরণে প্রণত, সুখপ্রদায়িনী, মঙ্গলপ্রদায়িনী, সেবকের আশ্রয়স্বরূপিণী, জাহ্নবী, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্তা হও (শ্লোক ৮)। ভগবতী, তুমি আমার রোগ শোক পাপ তাপ ও কুমতিকলাপ দূর করো। ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, বসুধার হারস্বরূপা তুমি নিশ্চয় সংসারে আমার একমাত্র গতি (শ্লোক ৯)। স্বর্গের আনন্দবিধায়িনী, পরমানন্দরূপিণী, কাতরজনের বন্দিতা তুমি আমার প্রতি করুণা করো। তোমার তটসমীপে যার বাস তার বৈকুণ্ঠেই নিবাস বলতে হবে (শ্লোক ১০)"।

গঙ্গা প্রসঙ্গে শ্রীশংকরাচার্যের পঞ্চমুখে প্রশংসা। বিশেষণ, বিশেষণ এবং বিশেষণ। গঙ্গা = গম্ + গ (গন্)-ক + স্ত্রীলিঙ্গে আ (টাপ্)। অন্য অর্থে গো-এর অর্থ পৃথিবী। গো + দ্বিতীয়ার একবচনে = গাম্ (পৃথিবীকে)। গম্ + ড কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রীলিঙ্গে = গঙ্গা। গমনার্থে গম্ ধাতু অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি আগমন করেছেন। এহেন গঙ্গার পরিচয় পুরাণ এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিতে একেক জায়গায় একেক রকম কাহিনি পাওয়া যায়। আমি সেই কাহিনিগুলি বলার চেষ্টা করব।

ভগীরথের গঙ্গা ঃ বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে, গঙ্গা বিষ্ণুর চরণযুগল থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বর্গলোকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মাপুরীতে পতিত হয়েছে। সেই গঙ্গাকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিলীপের পুত্র ভগীরথ সগর রাজার ৬০,০০০ (ষাট হাজার) সন্তানকে উদ্ধার করার জন্য পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। ভগীরথ গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব গঙ্গাকে মাথায় ধারণ করতে সম্মত হলে গঙ্গা মৎস্যাদি জলজন্তু সহ গগনমেখলার মতো মহাদেবের ললাটে পতিত হলেন এবং ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হতে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ দেখিয়ে মর্ত্যে নিয়ে আসেন এবং সগর সন্তানদের উদ্ধার করেন।

মৎস্যপুরাণে গঙ্গা ঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর রাজার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হলেন ভগীরথ। তিনি, দিলীপের পুত্র। ভগীরথ অষ্টাবক্রমুনির আশীর্বাদে মাংসপিণ্ডরূপ বিকলাঙ্গ থেকে উত্তম দেহ লাভ করেন। কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য তিনি শিবের তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেন এবং হিমালয়-কন্যা গঙ্গার প্রবল বেগকে ধারণে রাজি করান। গঙ্গা অতিবেগে মহাদেবের মস্তকের উপর পতিত হলে শিব তাঁকে মস্তকে জটার মধ্যে আবদ্ধ করেন। তারপর ভগীরথের অনুরোধে জটা থেকে সাতটি ধারায় ভূতলে অবতরণ করান। গঙ্গার তিনটি প্রবাহ পূর্বদিকে এবং অন্য তিনটি প্রবাহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। আর-একটি প্রবাহ ভগীরথকে অনুসরণ করে চলে। ভগীরথ সেই স্রোতের পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন বলে এই প্রবাহের নাম হয় ভাগীরথী। ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করে গঙ্গার সঙ্গে পাতালে যান। সেখানে গঙ্গা সগর-সন্তানদের ভস্মরাশির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তাঁরা মুক্তিলাভ করে স্বর্গে যান।

জহ্নুর কন্যা জাহ্নবী ঃ জহ্নু অতিশয় তপঃপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। ইনার পিতার নাম সুহোত্র এবং মায়ের নাম কেশিনী। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিয়ে করেন। কাবেরীর গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামে এক পুত্র জন্মায়। জহ্নু সবসময় যজ্ঞাদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাজা ভগীরথ পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থে গঙ্গাকে পাতালে আনয়নকালে মর্ত্যে রাজর্ষি জহ্নু এক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। গঙ্গা জহ্নুর যক্ষভূমি প্লাবিত করে যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য ভাসিয়ে যান। জহ্নু রেগে গিয়ে গঙ্গাকে তপস্যার প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে পান করে ফেলেন। তারপর দেব, গন্ধর্ব, ঋষি ও ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে জহ্নু কান দিয়ে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করে) গঙ্গাকে প্রবাহিত করে মুক্ত করে দেন।

বামনপুরাণে গঙ্গা ঃ মেনকার তিন কন্যা — রাগিণী, কুটিলা এবং কালী। ব্রহ্মা কুটিলাকে শিবতেজ ধারণ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কুটিলা শিবতেজ ধারণের অক্ষমতা জানালে ব্রহ্মা তাঁকে শাপ প্রদান করে বলেন, "তুমি নদী হয়ে মর্ত্যে বয়ে যাও"। এই কুটিলা নদীই কার্তিকের জন্মকালে শিবতেজ ধারণ করে শরবনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। কুটিলা নদীই আজ গঙ্গা নামে পরিচিত।

অন্য আরও শাস্ত্রকাহিনি : (১) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে। তিনি

আবার বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণুর তিন স্ত্রী — লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। সরস্বতী ও গঙ্গার বিবাদে অভিশপ্ত হয়ে দুজনে নদীতে পরিণত হয়। (২) শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গার প্রেমে আকৃষ্ট হলে রাধা রেগে গিয়ে গণ্ডুষে পান করতে উদ্যত হলে গঙ্গা ভয়ে কৃষ্ণের চরণে আশ্রয়ে নেন। পৃথিবী জলশূন্য হলে দেবতাদের স্তবে কৃষ্ণ গঙ্গাকে নখাগ্র থেকে বের করেন। তাই গঙ্গার অপর নাম হল বিষ্ণুপদী। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে বিয়ে করেন। (৩) বিকলাঙ্গ রাগ-রাগিণীকে সুস্থদেহে আনার জন্য নারদের পরামর্শে মহাদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সামনে গান করেন। এতে রাগ-রাগিণী পূর্ণদেহ পায়। বিষ্ণু মহাদেবের সংগীতে দ্রবীভূত হলে ব্রহ্মা তাঁকে তাঁর কমণ্ডলুতে স্থান দেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা। পরে ভগীরথের আমন্ত্রণে মর্ত্যে আসেন। (৪) গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের এক কন্যা। দেবগণের চেষ্টায় তাঁর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়। গঙ্গাকে না-দেখতে পেয়ে শোকাভিভূতা মা মেনকা তাঁকে সলিলরূপিণী হওয়ার অভিশাপ দেন। সেই গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করতে থাকেন। (৫) মহাকাব্য মহাভারত অনুসারে, বশিষ্ট কর্তৃক অভিশপ্ত বসুগণ গঙ্গাকে তাঁদের জননী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। গঙ্গা রাজা শান্তনুকে এই শর্তে পতিত্বে বরণ করেন যে গঙ্গার কোনো কাজে রাজা বাধাস্বরূপ হবেন না। একে একে অষ্টবসুর সাত জন গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মমাত্রেই গঙ্গা তাঁদের জলে নিমজ্জিত করে হত্যা করেন এবং তাঁরা শাপমুক্ত হন। রাজা পূর্বের সাতটি সন্তানকে বাধা না দিলেও অষ্টম সন্তান জন্মের পর শান্তনু গঙ্গাকে বাধা দিতে বাধ্য হন। এই কারণে গঙ্গার অষ্টম সন্তানটি জীবিত রয়ে যান। এই ব্যক্তিই মহাকাব্যের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চরিত্র ভীষ্ম। (৬) বৈষ্ণব মতে, এই গল্পে ইন্দ্রের পরিবর্তে দেখা যায় তাঁর পূর্বতন সহকারী বিষ্ণুকে। এই স্বর্গীয় তরলের নাম, এই মতে, "বিষ্ণুপদী"। বামনে রূপে বিষ্ণু তাঁর একটি পা রেখেছিলেন স্বর্গে। তাঁর নখের আঘাতে স্বর্গে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এই ছিদ্রপথে মুক্তি পায় বিষ্ণুপদী। ধ্রুব বিষ্ণুপদীকে নিয়ে আসেন স্বর্গে। আকাশে বিষ্ণুপদী আকাশগঙ্গা সৃষ্টি করে উপস্থিত হন চন্দ্রে। সেখান থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে তিনি চলে যান মেরুপর্বতের শৃঙ্গে ব্রহ্মলোকে। মেরুপর্বতের শীর্ষে অবস্থিত ব্রহ্মার আসনের পদ্মগুলি থেকে পৃথিবীর মহাদেশগুলির সৃষ্টি হয়। এখান থেকেই বিষ্ণুপদী অলকানন্দার রূপ ধরে একটি মহাদেশে অবতীর্ণা হন এবং ভারতবর্ষে গঙ্গা নামে প্রবেশ করেন। (৭) হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নদীস্তুতি (ঋগ্বেদ ১০।৭৫) অংশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত নদীগুলির তালিকা পাওয়া যায়। গ্রন্থের ৬।৪৫।৩১ অংশে গঙ্গা শব্দটির উল্লেখ আছে, তবে নদী অর্থে কি না সেটি এখানে পরিষ্কার নয়। ঋগ্বেদ ৩।৫৮।৬ অংশে বলা হয়েছে "হে বীরগণ, তোমাদের আদিভূমি, তোমাদের পবিত্র সঙ্গীগণ, তোমাদের ধনসম্পদ সবই জাহ্নবীর তীরে।" সম্ভবত এই স্তোত্রে গঙ্গার কথাই বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ ১।১১৬।১৮-১৯ অংশে জাহ্নবী ও গাঙ্গেয় ডলফিনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিন্দুগণের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত "গঙ্গেব পরমা গতিঃ"। হিন্দুদের একমাত্র গতি — "ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে"। সনাতন হিন্দুধর্মে গঙ্গা আর গঙ্গাভক্তি যেন সমার্থক হয়ে আছে, যুগ যুগ ধরে। অবশ্য এর মূলে আছে ভারতীয় মুনি-ঋষির জীবনে অপরিসীম গঙ্গাভক্তি — "গঙ্গা শরণাগতি"। গঙ্গা নদীকে ভারতীয়গণ দেবীজ্ঞানে পুজো করে — "পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবী গঙ্গে"। উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত সম্পূর্ণ গঙ্গা নদীটিই হিন্দুদের কাছে পবিত্র। সব জায়গাতেই গঙ্গাস্নান হিন্দুদের কাছে একটি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। গঙ্গার জলে হিন্দুরা পূর্বপুরুষদের তর্পণ করে। গঙ্গায় ফুল ও প্রদীপ ভাসায়। এমনকি গঙ্গাস্নান সেরে ঘরে ফেরার সময়েও কিছু পরিমাণ গঙ্গাজল ঘরোয়া ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

হিন্দু পুরাণের সব জায়গাতেই গঙ্গাজলকে পবিত্র বলা হয়েছে। অনেক জায়গায় স্থানীয় নদীগুলিকে "গঙ্গাতুল্য" মনে করা হয়। যেমন, কাবেরী নদীকে বলা হয় "দক্ষিণের গঙ্গা"। গোদাবরী নদীকে মনে করা হয়, ঋষি গৌতম কর্তৃক মধ্যভারতে আনীত গঙ্গা। হিন্দুদের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গঙ্গাকে আহ্বান করা হয়। ভাবা হয়, সকল পবিত্র জলেই গঙ্গা অধিষ্ঠিত। গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার, প্রয়াগ ও বারানসীতে গঙ্গাস্নান হিন্দুদের কাছে বিশেষ পূণ্যকর্ম। গঙ্গার প্রতীকী ও ধর্মীয় গুরুত্ব ভারতে সংশয়বাদীরাও স্বীকার করেন। জওহরলাল নেহরু নিজে ধর্মবিরোধী হলেও তাঁর চিতাভস্মের একমুঠো গঙ্গায় বিসর্জন দিতে বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "গঙ্গা ভারতের নদী। ভারতবাসীর প্রিয়। এই নদীকে ঘিরে রয়েছে কত জাতির কত স্মৃতি, কত আশা ও ভীতি, বিজয়ের কত গান, কত জয়পরাজয়। গঙ্গা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক। কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিত্য বয়ে চলে গঙ্গা। তবু সে রয়েছে সেই গঙ্গাই।"

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিটি হিন্দুরা "গঙ্গাবতরণ" বা গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের স্মরণে বিশেষভাবে উদযাপন করে। এই দিনটিকে "দশহারা" বলে। এই দিনটি গঙ্গাস্নানের জন্য বিশেষভাবে প্রশস্ত। এই দিন গঙ্গাস্নান করলে দশবিধ বা দশ জন্মের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব বলে সুবিদিত। যাঁরা এই দিন গঙ্গায় এসে স্নান করতে পারেন না, তাঁরা তাঁদের বাসস্থানের নিকটবর্তী জলাশয়ে বা নদীতে স্নান করেন। কারণ, হিন্দু বিশ্বাসে এই দিন সকল জলাশয় ও নদী গঙ্গাতুল্য হয়। 'গঙ্গাবতরণ' হিন্দুধর্মের একটি প্রাচীন উপাখ্যান। এই গল্পের নানা পাঠান্তর পাওয়া যায়। বেদে আছে, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বৃত্র নামে এক অসুরকে বধ করেন। তার রক্ত সোমরসের রূপে পৃথিবীতে গড়িয়ে পড়ে।

হিন্দুজীবনে গঙ্গা — স্বর্গের ঠিকানা ঃ প্রিয়জনের মৃত্যু হলে অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। গঙ্গা যেহেতু স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন, তাই তাঁকে মর্ত্য থেকে স্বর্গে উত্তরণের একটি মাধ্যমও মনে করা হয়। শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র গঙ্গায় অস্থি ফেললে তিনি যতই পাপী হোননা-কেন স্বর্গই হবে তাঁর শেষ ঠিকানা। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত

"পুরোহিত দর্পণ" বলছে - "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ এতদাস্থি সম সংখ্যক বর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গাধিকরণকমহিতত্ব কামোইমুকস্য এতান্যস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং নিক্ষিপামি"। অর্থাৎ ... অমুক গোত্রের প্রেত অমুক দেবশর্মার এর যত সংখ্যক অস্থি তত সহস্র বছর একটানা স্বর্গাধিকরণ কামনায় অস্থিখণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলাম। কুর্মপুরাণে কথিত আছে — "যাবস্ত্যস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্য চ।/ তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে"। অর্থাৎ যতদিন অস্থি গঙ্গাগর্ভে বিদ্যমান থাকবে তত সহস্র বছর মৃত ব্যক্তি স্বর্গলোকে বাস করবে। কুর্মপুরাণ আরও বলেছে — "দশাহাভ্যন্তরে যস্য গঙ্গাতোয়েস্থি মজ্জাতি।/ গঙ্গায়াং মরণে যাদৃক্ তাদৃক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ"। অর্থাৎ দশদিনের মধ্যে বা অশৌচ মধ্যে যার অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়, সেই ব্যক্তি গঙ্গায় মৃত্যুসম ফল লাভ করে। হিন্দুবিশ্বাস মতে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল — এই তিন লোকে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিলোকপথগামিনী। আবার, জীবিত ও মৃত সব জীবেরই যাত্রাপথে অবস্থিত বলে, তাঁর অন্য নাম তীর্থ। এই জন্য হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গঙ্গাবতরণ উপাখ্যানটি পাঠ করা হয়ে থাকে এবং মৃতের অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকিক ক্রিয়ায় গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়। গঙ্গার সকল স্তোত্রেই গঙ্গাতীরে মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। আচ্ছা, হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষেরা তো গঙ্গায় অস্থি দেন না, তাঁরা কীভাবে স্বর্গে যান? তাঁরা স্বর্গে যান না? গঙ্গায় অস্থি দিলে বা স্নান করলে যদি সত্যিই স্বর্গে যাওয়া যেত, তাহলে তো সারা পৃথিবীর মানুষ গঙ্গায় এসে গা ধুয়ে যেতে পারত! ডঃ বি আর আম্বেদকরের ভাষামর্মে বলা হয়েছে — গঙ্গা-মাহাত্ম্য ধূর্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচিত। গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপের ফলে ব্রাহ্মণগণই লাভবান হন। অস্থি নিক্ষেপের ফলে কেউ স্বর্গে গেছেন তার প্রমাণ কেউ দিতে পারেন না। এটা বোকাদের শোষণেরই নামান্তর। যাঁরা এটা মানেন তাঁরা ব্রাহ্মণের কাছে বোকাই নন, তাঁদের আর্থিক এবং সময়ের অপচয়ও ঘটে। পথে বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। এটা কুসংস্কার।

অনেক হিন্দু বারাণসীর শ্মশানঘাটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান। তাঁরা মনে করেন, বারাণসীর গঙ্গাতীরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁরা সত্বর মুক্তিলাভ করবেন। অন্যত্র মৃত্যু হলে, মৃতের পরিবারবর্গ মৃতের দেহাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে মৃতের কোনো আত্মীয় আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষে গঙ্গাতীরে এসে মৃতের বিশেষ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন।

গঙ্গার মূর্তিতত্ত্ব : ভারতীয় শিল্পকলার ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে গঙ্গা এক ইন্দ্রিয়পরায়ণা, সুন্দরী নারী। তাঁর হাতে একটি উচ্ছ্বলিত জলপাত্র। এই পাত্রটি অফুরন্ত জীবন ও উর্বরাশক্তির প্রতীক, যা মহাবিশ্বের গতিকে পুষ্ট ও সচল রাখে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। গঙ্গামূর্তির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তাঁর বাহন মকর। এটি একটি কুমির (দেহাংশ) ও মাছের (লেজ) সংকর। পশ্চিমা জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্যাপ্রিকন হিন্দু মকরের একটি রূপ। অন্যদিকে মকর ঋগ্বৈদিক দেবতা বরুণেরও বাহন। এই কারণে গঙ্গা বৈদিক শিকড়ের

ধারণাটি দৃঢ় হয়।

লাখ প্রশ্নের এক প্রশ্ন, গঙ্গার জল ঠিক কতটা পবিত্র! একজন হিন্দু-সন্তান ছোটো থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেখে যে, সব কাজেই গঙ্গাজল ছড়িয়ে পবিত্র করার রীতি। গঙ্গার জলে কি এমন কোনো উপাদান আছে যা সকল কিছু পবিত্র করে দিতে পারে, নাকি এটা শুধুই ধর্মীয় নিয়ম। গঙ্গাজল নাকি সবকিছুই শুদ্ধ করছে, পবিত্র করছে - গঙ্গা নিজে কতটা পবিত্র! দেখা যাক। খোঁড়াখুড়ি চলুক।

(১) গঙ্গাজলে ভাইরাস ঃ হিন্দুরা গঙ্গাজলকে সবসময় পবিত্র ও পানযোগ্য বলে বিশ্বাস করে আসছে। হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে গঙ্গাজলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু এটা প্রমাণ করার সত্যিকার অর্থে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি না! ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ব্যাকটেরিয়াবিদ আর্নেস্ট হ্যানকিন গঙ্গাজলকে পরীক্ষা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বলা হয়েছে যে, কলেরা রোগের প্রধান কারণ ব্যাকটেরিয়া জীবাণুকে গঙ্গাজলে রেখে দিলে তা তিন ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। ঠিক এই ব্যাকটেরিয়াই আবার ছেঁকে নেওয়া জলে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে। তিনি আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গঙ্গা এবং পার্শ্ববর্তী যমুনা নদীর জল সেই সময়কার ভয়াবহ কলেরা রোগের জন্য দায়ী ছিল, একইভাবে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ার অণুজীববিদ কলেরা ও ডায়রিয়ায় মারা যাওয়া লোকদের ভাসমান দেহের কয়েক ফুট নীচ থেকে সংগৃহীত জলে কোনো জীবাণু না-পেয়ে বিস্মিত হন। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসের উপস্থিতিকেই গঙ্গাজলের গুণ ও পবিত্রতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

(২) পচনবিরোধী গঙ্গা ঃ নতুন দিল্লির ম্যালেরিয়া গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, গঙ্গার উপরিস্তরের জলে মশা জন্মায়নি এবং এই জল যখন অন্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা হলে সেখানেও মশার বংশবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করত। নদীর জল সাধারণত যখন পচে যায় তখন অক্সিজেনের অভাবে ব্যাকটেরিয়া জন্ম দেয় — যা জলে এক পচা গন্ধ তৈরি করে। গঙ্গা জলকে যদিও সবচেয়ে ময়লাযুক্ত বিবেচনা করা হয়। অনেকদিন ময়লায় ভরে থাকলেও এর জল পচে না। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ চিকিৎসক সি.ই নেলসন নিরীক্ষা করে দেখছেন যে, গঙ্গার অন্যতম অপরিষ্কার জায়গা হুগলি নদী থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া জাহাজ কর্তৃক সংগৃহীত জল পুরো যাত্রাপথ জুড়েই নির্মল, পরিষ্কার ও সতেজ ছিল। একারণেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজগুলো ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার সময় তিন মাসের পানীয় জল হিসাবে শুধুই গঙ্গাজল ব্যবহার করত। কারণ এটা থাকত সজীব ও সুস্বাদু।

(৩) গঙ্গার 'ফ্যান' ভূমিরূপ ঃ নদীগর্ভস্থ ফ্যান বা Bengal Fan হল নদীর অত্যধিক মাত্রার পলি থেকে গঠিত এক ভূমিরূপ। গঙ্গার ফ্যান হল পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ নদীগর্ভস্থ ফ্যান। এটি প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় ১০০০ কিলোমিটার প্রস্থ,

যার সর্বোচ্চ পুরুত্ব ১৬.৫ কিলোমিটার বলা হয় যে, এই ফ্যান বঙ্গোপসাগর জুড়ে বিস্তৃত। স্রোত পলিকে স্থানান্তরিত করেছে কয়েকটি নদী গর্ভস্থ গিরিখাতের মাধ্যমে যেগুলোর কোনোটি ১৫০০ মাইলের চেয়েও দীর্ঘ। এই ফ্যানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে ভারতে। কারণ এটা বিপুল পরিমাণ হাইড্রোকার্বনের গঠিত পদার্থ যেমন বেনজিন, কয়লার গ্যাস মজুতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

(৪) গঙ্গার দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ ডি.এস. ভার্গব গঙ্গা নিয়ে তিন বছরের গবেষণার ফল হিসাবে যা জানা যায় তা হল, অন্যান্য নদীর তুলনায় গঙ্গা অত্যন্ত দ্রুত তার জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা কমিয়ে আনতে সক্ষম। ভার্গব বলেন, সাধারণত জৈব উপাদানগুলো নদীর অক্সিজেনকে নিঃশেষ করে, তারপর পচতে শুরু করে। কিন্তু গঙ্গার এক অজ্ঞাত উপাদান এই জৈব উপাদান ও ব্যাকটেরিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে হত্যা করে। গঙ্গার নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখার গুণ পৃথিবীর অন্যান্য নদীর তুলনায় পঁচিশ গুণ অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। আপন শক্তি আপনার হৃদয়ে সৃষ্ট হয়।

(৫) গঙ্গার জলসংকট ঃ বর্তমান সময়ে গঙ্গা মারাত্মক জলের সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদা উত্তরপ্রদেশের বেনারসের চারদিকে গঙ্গার গড় গভীরতা ছিল ৬০ মিটার, কিন্তু এখন কোথাও কোথাও মাত্র ১০ মিটার। পাহাড়ি অঞ্চলে ধুলো থেকে উদ্ভূত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অত্যন্ত ভয়ানক হারে ঢালুতে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ জলের সম্পদের ব্যবস্থাপনা, কলকারখানার বর্জ্য ফেলা, জলশোধন ব্যবস্থা এবং অধিক জনসংখ্যাকে দায়ী করেন। এটা শুধু পরিবেশগত দুর্যোগের ঝুঁকিই সৃষ্টি করে না, অপরদিকে আধ্যাত্মিক সংকটেরও সৃষ্টি করে। বিদেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যদি এমন অবস্থা আরও চলতে থাকে এবং পুনঃখননের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না-করা হয়, তাহলে আমাদের এই জীবনেই আমরা অন্যতম একটি বড়ো সভ্যতার সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করব।

সম্প্রতি এক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, ভারতের পবিত্র নদী গঙ্গার জল এখন ক্যান্সারের উৎস হয়ে উঠেছে। ভারতে পবিত্র নদী হিসাবে পরিচিত গঙ্গার জল এখন ক্যান্সারের উৎস হয়ে উঠেছে। ভারতের গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় চালানো জরিপে এ ভয়ংকর সত্য প্রকাশ হয়েছে। জরিপটি করেছে ভারতের ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম। এতে বলা হয়েছে, কারখানার বর্জ্যসহ সারা বছর হাজারে হাজারে প্রতিমা বিসর্জনের নামে প্রতিনিয়ত গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। ফলে ভারতের অন্যান্য স্থানের মানুষের তুলনায় গঙ্গা পাড়ের অধিবাসীদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। এনসিআরপি বলছে, গঙ্গায় যেসব বর্জ্য ফেলা হচ্ছে তাতে রয়েছে ভারী ধাতু ও বিষাক্ত সব উপাদান। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে গঙ্গার যে অংশ প্রবাহিত হচ্ছে তাতে অনেক বেশি রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কোলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের পরিচালক জয়দীপ বিশ্বাস এ

জরিপের ভিত্তিতে জানান, গঙ্গায় শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ফেলায় এ নদীর জলে এখন আর্সেনিক, ক্লোরাইড ও ফ্লোরাইডের মতো বিষাক্ত ভারী ধাতু রয়েছে। গঙ্গার তীরবর্তী এলাকাগুলো পিত্তথলির ক্যান্সারের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। আর প্রোস্টেট ক্যান্সারের দিক থেকে এসব অঞ্চল প্রথম অবস্থানে রয়েছে। ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামের জরিপে দেখা গেছে, গঙ্গা তীরবর্তী অধিবাসীদের প্রতি ১০,০০০-এর মধ্যে ৪৫০ পুরুষ এবং ১,০০০ মহিলা পিত্তথলির ক্যান্সারে ভুগছেন। এ সব এলাকার মানুষের মধ্যে কিডনি, খাদ্যনালি, যকৃত, মূত্রথলি এবং ত্বকের ক্যান্সারের প্রকোপও অধিক মাত্রায় দেখা গেছে। জয়দীপ বিশ্বাস বলেন, পুণ্য অর্জনের মানসিকতায় যারা গঙ্গার জলে স্নান করেন তারাও ক্যান্সারসহ নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার বিপদের মধ্যে রয়েছেন।

পাপমোচন ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে তারা গঙ্গার জলে স্নান বা অন্যান্য মাঙ্গলিক কাজকর্ম করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গঙ্গার জল যেভাবে দূষিত হচ্ছে, তাতে শঙ্কিত পরিবেশবিদগণ। গবেষকরা বলছেন, গঙ্গার জল কারসিনোজেনের উৎস, যা মানুষের শরীরে ক্যান্সারের কোশ তৈরি করে ও দ্রুত অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এ খবর দিয়েছে অনলাইন জি নিউজ। অ্যাটোমিক এনার্জি বিভাগের 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপোজিশনাল ক্যারেক্টারাইজেশন অব ম্যাটেরিয়ালস' সংস্থাটি গঙ্গার জলের নমুনা পরীক্ষা করে এমন ভয়াবহ তথ্য মিলেছে। গবেষকরা বলছেন, নদীটির জলে ক্রোমিয়াম-৬ ধাতু ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। হায়দ্রাবাদভিত্তিক একটি পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে কাজ করছে 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপোজিশনাল ক্যারেক্টারাইজেশন অব ম্যাটেরিয়ালস'। সম্প্রতি কুম্ভমেলার সময় গঙ্গায় যে পরিমাণ বিষাক্ত ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে, তা অনুমোদিত সীমার প্রায় ৫০ গুণ বেশি। গঙ্গা নদী এনডিএম-১ সহ অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী 'সুপারবাগে' পরিপূর্ণ বলে গবেষকেরা জানিয়েছেন। গবেষকগণ বলছেন, উত্তরখণ্ডের হৃষিকেশ ও হরিদ্বারে মে ও জুন মাসে যখন কোটি কোটি পুণ্যার্থী অবগাহন করেন, তখন অন্য সময়ের চেয়ে নদীটিতে ৬০ গুণ বেশি সুপারবাগ থাকে। দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও ব্রিটেনের নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরা এই গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা জানান, ওই স্থান থেকেই অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী 'সুপারবাগ' ছড়ায়। তারা এটাকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে, পুণ্যার্থীরা যেখানে স্নান করেন, সেখানে বর্জ্য শোধন কার্যক্রম এবং অশোধিত পয়ঃনিষ্কাষণ সংযোগও রয়েছে। ফলে তা সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। এনডিএম-১ প্রথম নতুন দিল্লিতে শনাক্ত করা হয়েছিল। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটা ক্লিনিক্যাল সরঞ্জাম ও হাসপাতালেই দেখা যেত। পরে তা দিল্লির জলে ছড়িয়ে পড়ে। এখন সারা বিশ্বেই এটা দেখা যায়। এসব সুপারবাগের নতুন প্রজাতিও দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে গঙ্গার উজানে যে পরিমাণ এনডিএম-১ পাওয়া

যায়, জুনে পাওয়া যায় তার চেয়ে ২০ গুণ বেশি।

এখন প্রশ্ন হল গঙ্গা কি রক্ষা করা সম্ভব হবে? ভারতের গঙ্গাকে বাঁচাতে এবার 'গঙ্গা শোধন প্রকল্প' তৈরি করার কথা ঘোষণা করছেন মোদি-সরকার। গঙ্গার জলে থুতু ও নোংরা জিনিসপত্র ফেলার ব্যাপারে কঠোর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গেছে, গঙ্গার জলে যত্রতত্র থুতু আর বর্জ্য পদার্থ ফেললে সেই ব্যক্তির তিন দিন থেকে তিন বছর অবধি জেল হতে পারে। নতুবা ১০ হাজার টাকা জরিমানাও দিতে হতে পারে। জনবণ্টন মন্ত্রী উমা ভারতী বলেছিলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা আনতে নানা পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল গঙ্গা। গঙ্গাকে মডেল করেই ভারতের আরও নদীগুলির রূপ ফিরিয়ে আনতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গঙ্গা — ভারতের নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র বলে পরিচিত এক নদী। প্রত্যেক হিন্দুর জন্যই পবিত্র শহর বেনারসে (কাশী) এক বিশাল মিটিং হয়েছে, যা এই মহান নদীকে রক্ষার জন্য "গঙ্গা মুক্তি মহাসম্মেলন" নামে মিটিং করা হয়েছে। এই মিটিংয়ে অংশ নেওয়া মানুষ (হিন্দু পুরোহিত, সাধু ও বিখ্যাত সামাজিক নেতারা) এক ঘোষণা গ্রহণ করেছেন, যাতে প্রশাসনের কাছে দাবি করা হয়েছে নদীকে দূষণ থেকে বাঁচানোর জন্য তারা একই সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, ১৮ জুন দেশের ২০টি রাজ্য থেকে দশ লক্ষেরও বেশি সক্রিয় কর্মী মিছিল করে দিল্লি অবধি যাবেন, যেখানে এই নদী সংরক্ষণের জন্য নতুন সমাবেশ করা হবে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যেসব মানুষ গঙ্গানদীর জলে স্নান করেন সেই সমস্ত মানুষও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। মনে রাখতে হবে, গঙ্গানদীর উপকূলে চল্লিশ কোটিরও বেশি লোক বাস করেন। এই নদীর হলে অপরিষ্কৃত নর্দমার জল ফেলে দেওয়া হয় বিশাল পরিমাণে, আর তারই সঙ্গে ধর্মীয় ঐতিহ্য মেনে মৃত মানুষের অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয়ে থাকে (প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবে দগ্ধ না-হওয়া অবশেষ, এমনকি একেবারেই দগ্ধ না হওয়া মৃতদেহ পর্যন্ত), হাজার হাজার প্রতিমা বিসর্জনের ফলে নদীর নাব্যতা হারাচ্ছে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের নিমজ্জনের কারণে। প্রতিমার গোলা অস্বাস্থ্যকর রং জল দূষিত হচ্ছে। যার ফলে নদীর মধ্য অববাহিকা অঞ্চলেই খুব বেশি রকমের দূষণ দেখতে পাওয়া যায়, আর যখন এই নদী তার গতিপথের শেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পৌঁছায়, তখন তার জলের কাছে আসতেও ভয় করে — এতটাই তা নোংরা হয়ে থাকে। গঙ্গা এখন এক রাজনৈতিক সমস্যা। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার গঙ্গা রক্ষা করার জন্য একটি কর্মসূচি নিয়েছিলেন, এই কথা উল্লেখ করে রাশিয়ার স্ট্র্যাটেজিক গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ বরিস ভলখোনস্কি বলেছেন — "বিগত ২০ বছরে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য ২৫ কোটি আমেরিকান ডলারের সমান অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের মতেই, সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে পরিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই নদীর জলে এসে যোগ হওয়া সমস্ত নোংরা জলের একের তৃতীয়াংশ। আর দ্রুত বেড়ে ওঠা জনসংখ্যা, স্থানীয়

কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব ও নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে থাকা রসদের অনুপযুক্ত ব্যবহারের ফলে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের ফলই হয়েছে শূন্য। এখানে হিসাবের মধ্যে আনতে হবে যে, একটি দেশের পক্ষে প্রায়ই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না, বিশেষত, যখন কথা ওঠে সীমান্ত পার হয়ে যাওয়া নদী নিয়ে। ভলখোনস্কি বলেছেন — ভারতের ও দক্ষিণ এশিয়ায় দুটি মহান নদী সিন্ধু ও গঙ্গা সীমান্ত পার হয়ে যাওয়া নদী — ভারত এই দুটির বেশির ভাগ অংশই নিয়ন্ত্রণ করে। আর গঙ্গা প্রায় সারা অববাহিকা জুড়েই তাই যে-কোনো ধরনের কাজই ভারতের পক্ষ থেকে সিন্ধু ও গঙ্গার উপরের অঞ্চলে করলে, তা প্রতিবেশী দেশগুলির স্নায়ু বৈকল্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, এখানে সীমান্ত-দেশ বলতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কথাই বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু এই দুই দেশের ক্ষেত্রে 'উপরের' দিকের দেশ হলেও, ভারত আবার চিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নীচের' দেশ। কারণ চিন গঙ্গার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জল সরবরাহের নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে — তার নাম ব্রহ্মপুত্র। চিন বেশ কিছু বড়ো প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে নিজেদের দেশের নদীগুলির জলের ধারা পরিবর্তন করে দেশের উত্তর-পশ্চিমের খরা কবলিত অংশগুলিতে পাঠিয়ে সিনঝিয়ান উইগুর স্বয়ংশাসিত অঞ্চলে, আর এরই সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের উপরে জল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে ঘোষণা করে। ফলে ভারত নিজেই চিনের কাজকর্মের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি গঙ্গার নীচের দিকের এলাকায় আরও খারাপ হতে পারে। বরিস ভলখোনস্কি বলেছেন — "পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে এই কারণে যে, যেমন আন্তর্জাতিক আইনে, তেমনই প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে চুক্তি-অধিকারের ভিত্তি এই জল সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর জন্য উপযুক্তভাবে নেই। হয় চিন নিজেদের দেশের নদীগুলি নীচে যে সমস্ত দেশে গিয়েছে, তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করেছে, নয়তো শুধু শান্ত করার জন্য ঘোষণা করেই ক্ষান্তি দিচ্ছে, নিজেদের হাত বন্ধ করার জন্য কোনোরকমের আইন সংগত দলিল তৈরি করতে প্রস্তুত হচ্ছে না।" ভারত সরকারের নতুন পরিকল্পনা ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে এবারে বেশি সফল করে বাস্তবায়ন করা হয়ও, তবুও গঙ্গা নদীকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে না। তাহলে কি সভ্যতার অভিশাপ? আমরা কি এতটাই অক্ষম! ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে গঠিত হয়েছিল গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি। এরই মধ্যে এই কমিটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন তুললেন কমিটির মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরাই। তাঁদের বক্তব্য, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে এই কমিটি কাজ শুরু করে গঙ্গা দূষণের বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছে, প্রতিকারের কথা বলেছে এবং এই ব্যাপারে কিছু সুপারিশ রূপায়ণ করে গঙ্গার দূষণ কমানো বা বন্ধ করা যেসব সরকারি সংস্থার কাজ, তারা স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছে। সুপারিশ না-মানার দিক থেকে কলকাতা পুরসভা সবচেয়ে এগিয়ে বলে কমিটির অভিযোগ। কলকাতা পুরসভার দাবি, ১৫০ ফুট পর্যন্ত গঙ্গার পাড়

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের। তাই ওখান থেকে আবর্জনা সরানোর দায়িত্ব নেবে না পুরসভা। বন্দর-কর্তৃপক্ষের দাবি, আবর্জনা সরানোটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। বুঝুন ঠ্যালা!

গঙ্গাকে দূষণ থেকে বাঁচাতে গঙ্গার ৫০ মিটার পাড় পুরোপুরি প্লাস্টিক মুক্ত করতে হবে বলে সুপারিশ করেছিল কমিটি। অধিকাংশ জায়গাতেই সেই কাজ হয়নি। গঙ্গার দু-পাড়ের সব বে-আইনি দখলদারকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে বলেছিল কমিটি। কাজের দায়িত্ব কার, তা নিয়ে চাপান-উতোর চলছে কলকাতা পুরসভা ও বন্দর-কর্তৃপক্ষের মধ্যে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে দেখতে বলা হয়েছিল, জাহাজ বা বার্জ থেকে কোনো বিষাক্ত পদার্থ যেন গঙ্গায় ফেলা না হয়। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট অবশ্য বলেই দিয়েছে, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার কাজটা সরাসরি তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এই কাজ করার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আছে। কোন্ কোন্ শিল্প-কারখানা কোথায় কীভাবে গঙ্গার জলকে দূষিত করছে, তা চিহ্নিত করতে পর্ষদকে একটি বিশেষ সেল গড়ার নির্দেশ দিয়েছিল কমিটি। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হল — এ রকম কোনো বিশেষ সেল পর্ষদের নেই। গঙ্গা-দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি এমন কোনো নির্দেশ দিয়েছিল বলেও তাঁর জানা নেই।

গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকার বর্জ্য জল বিশেষ প্লান্টে শোধন করেই তবেই ফেলার কথা। কমিটির বক্তব্য, সব মিলিয়ে বড়ো জোর ৩০ শতাংশ বর্জ্য জল এইভাবে শোধিত হয়ে পড়ছে। বাকি সবই নোংরা, দুষিত জল সরাসরি গঙ্গায় মিশছে। নজিরগঞ্জ ক্যানাল, বালিখাল, আদিগঙ্গা, মারহাট্টা ডিচের নোংরা জল গঙ্গায় মিশে তার জলকে রোজ দূষিত করে চললেও এদের গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় আনা হয়নি।

ফিরিয়ে দিন গঙ্গার পবিত্রতা। ভাবের ঘরে চুরি অনেক হয়েছে। এখনও সময় আছে, এখনও আদি শংকরাচার্যের গঙ্গা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অবিলম্বে যা করতে হবে (১) গঙ্গায় যে-কোনো প্রতিমা ভাসান বন্ধ করতে হবে, (২) যে-কোনো মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া বন্ধ করতে হবে, (৩) ধর্মের নামে গঙ্গায় যে-কোনো দ্রব্য-আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে, (৩) কলকারখানার যে-কোনো ধরনের বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধ করতে হবে, (৪) গঙ্গাতীরে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ করতে হবে, (৫) মৃতদেহ দাহের জন্য শ্মশান সরিয়ে নিতে হবে গঙ্গার কাছ থেকে, গঙ্গার ঘাটে মৃতদেহ দাহ নিষিদ্ধ করতে হবে, (৬) গঙ্গার নাব্যতা বাড়াতে চূড়ান্ত ড্রেজিং করতে হবে, (৭) যেসব রাজ্যের মধ্য দিয়ে এবং দেশে গঙ্গা প্রবেশ করেছে তারা সকলে সহমত হয়ে বিরতিহীনভাবে একযোগে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। তা না-হলে সেইদিন আসন্ন, যেদিন হা-হুতাশ করতে হবে। যে গঙ্গা একদা সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেই গঙ্গাই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হবে।

মৃত্যু, জীবনের শেষ স্টেশন এবং তারপর .....

— অনির্বাণ বন্দোপাধ্যায়

"মরণ রে, / তুঁহুঁ মম শ্যামসমান/মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,/রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,/তাপবিমোচন করুণ কোর তব/মৃত্যু-অমৃত করে দান। তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।। / মরণ রে,/শ্যাম তোঁহারই নাম।...." — রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এই মৃত্যু বিষয়ক কবিতা দিয়েই শুরু করি "মৃত্যু, মৃত্যুকালীন ব্যবচ্ছেদ এবং আমরা মানুষ নাম প্রাণীকুল" প্রবন্ধটি।

মৃত্যু! ছোট্ট একটি শব্দ। এই সেই শব্দ, যা আমাদের নিয়ে যায় অজানা কোনো রাজ্যে, যার সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে কত না কষ্ট! যখন মৃত্যুর ডাক এসে যায়, প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের সন্তানেরা, বাবা-মা কেউ তাদের বন্ধন দিয়ে ধরে রাখতে পারে না আমাদের। ক্ষণিকের জীবন, তা সত্ত্বেও কত সুন্দর করে আমরা সাজাতে চেয়েছি আমাদের জীবন, কত পরিকল্পনা ছিল - সব মিলিয়ে যায় মাত্র দুটি অক্ষরের এই শব্দের দ্বারা। আমরা প্রতিদিন এই মৃত্যুকে কত আপনভাবে নিজের সঙ্গে বয়ে বেড়াই আমরা নিজেরাও জানি না। জীবদ্দশায় মৃত্যু কী আমাদের যারপরনাই বিব্রত করে না! আমরা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব মৃত্যু কী? মৃত্যু কীভাবে? মৃত্যু কেন? মৃত্যুর পরে কী? মৃত্যুর পরে কী আছে? নাকি মৃত্যুই শেষ? আবার শুধু মৃত্যুতেই শেষ নয়, মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে-স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, জাতিস্মর ইত্যাদি বিষয়। স্মতর্ব্য, মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মানবেতর প্রাণীরা জন্ম-মৃত্যু নিয়ে মোটেই ভাবিত নয়। মৃত্যু যেভাবে মানুষকে বিব্রত করে তেমন অন্য প্রাণীর হয় না। কারণ মানবেতর প্রাণীরা মানুষের মতো বিচক্ষণ নয়। তাই মৃত্যুকে ঘিরে মানুষের সমাজে অনেক মিথ এবং সংস্কার প্রচলিত আছে, যা সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মৃত্যু কী? (Death) বলতে জীবনের সমাপ্তি বোঝায়। জীববিজ্ঞানের ভাষায় প্রাণ আছে এমন কোনো জৈব পদার্থের (বা জীবের) জীবনের সমাপ্তিকে মৃত্যু বলে। অন্য কথায়, মৃত্যু হচ্ছে এমন একটি অবস্থা। যখন সকল শারিরীক কর্মকাণ্ড যেমন শ্বসন, খাদ্যগ্রহণ, পরিচলন, ইত্যাদি থেমে যায়। কোনো জীবের মৃত্যু হলে তাকে মৃত বলা হয়। মৃত্যু বিভিন্ন স্তরে ঘটে থাকে। সোমাটিক মৃত্যু হলে সামগ্রিকভাবে কোনো জীবের মৃত্যু। নির্দিষ্ট অঙ্গ, কোশ বা কোশাংশের মৃত্যুর আগেই এটি ঘটে। এতে হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, চলন, নড়াচড়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও মস্তিষ্কের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সোমাটিক মৃত্যু ঠিক কখন ঘটে তা নির্ণয় করা দুরূহ, কেন-না কোমা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, এবং ঘোর বা ট্রান্সের মধ্যে থাকা ব্যক্তিও একই ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকেন। সোমাটিক মৃত্যুর পর অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে যা থেকে মৃত্যুর সময় ও নির্ণয় করা

যায়। মারা যাওয়ার পরপরই পাশ্ববর্তী পরিবেশের প্রভাবে দেহ ঠান্ডা হয়ে যায়, যাকে বলে Algor mortis। মারা যাওয়ার পাঁচ থেকে দশ ঘন্টা পরে কংকালের পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়, যাকে বলে Rigor mortis এবং এটি তিন-চার দিন পরে শেষ হয়ে যায়। রেখে দেওয়া দেহের নীচের অংশে যে লাল-নীল রং দেখা যায়, তাকে বলে Livor mortis; রক্ত জমা হওয়ার কারণে এমন হয়। মৃত্যুর খানিক বাদেই রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। আর তারপরে দেহের যে পচন শুরু হয়, তার জন্য দায়ী এনজাইম ও ব্যাক্টেরিয়া। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন হারে মারা যায়। সোমাটিক মৃত্যুর ৫ মিনিটের মধ্যেই মস্তিষ্কের কোশগুলির মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে হৃৎপিন্ডের কোশগুলি ১৫ মিনিট এবং বৃক্কেরগুলি প্রায় ৩০ মিনিট বেঁচে থাকতে পারে। এই কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদ্যমৃত দেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে জীবিত ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব।

এতদিন মৃত্যু বলতে হৃৎক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাওয়াকেই বোঝাত। কিন্তু "অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন ১৯৯৪" কার্যকর হওয়ায় বদলে গেছে মৃত্যুর ধারণা। "Brain Death" বা "মস্তিষ্কের মৃত্যু"-তেই এখন কেবল কোনো মানুষকে মৃত বলা যাবে। কোনো মানুষের ব্রেন ডেথ হয়েছে কী হয়নি, তা ঠিক করতে দুজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের লিখিত অভিমত বাঞ্ছনীয়। এরপর যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষিত নথিভুক্ত ফলাফলও যদি ওই অভিমতের পক্ষে যায়, তাহলেই কেবলমাত্র "ব্রেন ডেথ" হয়েছে বলে ধরা হবে। তবে ওই দুই চিকিৎসক কোনোভাবেই সংস্থাপক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। "মস্তিষ্ক মৃত্যু" ঘোষণা করার আগে দেখে নিতে হবে রোগী যেন কোনোরকম নিস্তেজক বা ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়ার বশবর্তী না হন।

"ব্রেন ডেথ" বা "মস্তিষ্ক মৃত্যু" বলতে আসলে ব্রেনস্টেমের মৃত্যুকে বোঝায়। "প্রকৃত মৃত্যু" ও "মস্তিষ্ক মৃত্যুর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রকৃত মৃতদেহে ধমনীপ্রবাহ থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ থাকবে না, হৃদস্পন্দনের আওয়াজ থাকবে না এবং বাইরের উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়া থাকবে না। এই ধরনের মৃত্যুকে বলা হয় "কার্ডিওরেসপিরেটরি ডেথ"। "মস্তিষ্ক মৃত্যু" এর থেকে আলাদা। আমাদের চেতনা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যের কেন্দ্রবিন্দু হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশ দ্বারা এই জরুরি কাজগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই বলে "ব্রেন স্টেম" বা "মস্তিষ্ক কাণ্ড"। এই অংশের মৃত্যু হলে মানুষকে আর বাঁচানো যাবে না। অনেক রোগী দেখা গেছে, যাঁরা অজ্ঞান হয়ে আছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে-কিন্তু তাঁদের হৃৎপিণ্ড কাজ করে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যদি কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য ও হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখা যায় তাহলে একসময় দেখা যাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর যন্ত্র ছাড়া হাজার চেষ্টা করলেও শ্বাস-প্রশ্বাস আর ফিরবে না এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু আর সজাগ হবে না। হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা থাকার ফলে এমন ক্ষেত্রেও হৃৎপিণ্ড তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং ধমনীপ্রবাহ সচল থাকতে পারে। এই অবস্থাকেই আমেরিকায় "ব্রেন

ডেথ” এবং ইংল্যান্ডে “ব্রেনস্টেম ডেথ” বলে।

মৃত্যুর পরে শরীরে ধীরে ধীরে পচন ধরতে শুরু করে—এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকে পচন ধরা পর্যন্ত কী কী শারীরিক পরিবর্তন হয় বা কোন্ কোন্ পথ ধরে শরীর পচতে শুরু করে, তা কি জানা আছে? চিকিৎসাশাস্ত্র মতে মৃত ঘোষণার অর্থ এই নয় যে, শরীরের প্রতিটি কোশের মৃত্যু হয়েছে। হৃদযন্ত্র পাম্প করা বন্ধ করলে, কোশগুলি অক্সিজেন পায় না। মস্তিষ্কে শেষ মুহূর্তে সক্রিয়তার ঢেউ খেলে যায়, এর পরই ‘সবকিছু অন্ধকার’। অক্সিজেন পাওয়া বন্ধ হলে পেশিগুলি শিথিল হতে শুরু করে। পাশাপাশি অন্ত্র এবং মূত্রস্থলী খালি হতে শুরু হয়। শরীরের মৃত্যু ঘটলেও, অন্ত্র, ত্বক বা অন্য কোনো অংশে বসবাসকারী ১০০ ট্রিলিয়ন ব্যাক্টিরিয়া তখনও জীবিত থাকে। মৃত্যুর পর শরীরের অভ্যন্তরে যা ঘটে, সে সবের পিছনেই এই ১০০ ট্রিলিয়ন ব্যাক্টিরিয়ার যোগদান থাকে। মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম শরীরে কোনো পরিবর্তন আসে প্রথমেই হয় অ্যালগর মরসিট ঘরের তাপমাত্রায় না-আসা পর্যন্ত শরীরের তাপমাত্রা প্রতি ঘন্টায় ১.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমতে থাকে। লিভোর মরটিস বা লিভিডিটির ক্ষেত্রে শরীরের নিম্নাংশে রক্ত এবং তরল পদার্থ জমা হয়। ব্যক্তির ত্বকের আসল রঙের ভিত্তিতে তা ধীরে ধীরে গাঢ় বেগুনি-নীল রঙে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। রিগর মরটিস-শেষে শরীরে রিগর মরটিস হয়, এ ক্ষেত্রে অত্যধিক ক্যালসিয়াম ক্ষরণের ফলে পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়। ২৪-৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত এই অবস্থা থাকে। রিগর মরটিসের সময় চোখ খোলা থাকলে, বেশ কিছু ক্ষণের জন্য মৃতের চোখ খোলাই থাকে। এর পর শরীরে পচন ধরতে শুরু করে। রক্ত চলাচল বন্ধ হলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের গঠন শুরু হয়, অম্লের মাত্রা বাড়তে থাকে। এর ফলে কোশগুলিতে ভাঙন ধরে। ২-৩ দিনে শরীর পচতে থাকে। পরিপাক নালিতে থাকা ব্যাক্টেরিয়া এবং আণুবীক্ষণিক প্রাণীরা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তলপেট সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং তাতে গ্যাস তৈরি হয়। তার চাপে শরীরের মল-মূত্র নিষ্কাশিত হয়। পিউট্রেসিন এবং ক্যাডাভেরিনের মতো জৈবিক যৌগ-শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়লে, দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। এই গন্ধই মৃতদেহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নেক্রোসিস পদ্ধতিতে এরপর শরীরের রং সবজেটে থেকে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মৃতদেহের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভিড় জমায় উচ্ছিষ্টভোগী পোকামাকড়। মৃত শরীরকে খাদ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও, এই সমস্ত পরজীবী কীট সেখানে ডিমও পাড়ে। ডিম ফুটে বেরোনো শূককীট মাত্র এক সপ্তাহে শরীরের ৬০ শতাংশ নিকেশ করতে পারে।

এ তো গেল শুধু প্রথম সাতদিনের বৃত্তান্ত। এর পর ধীরে ধীরে প্রাণহীন মানবদেহ ক্রমে মাংস-চামড়ার খোলস ত্যাগ করে পরিণত হয় হাড় সর্বস্ব কঙ্কালে।

মৃত্যু, কিন্তু মৃত্যু নয়। এক অনন্তকালের ফিরে আসার অপেক্ষা। দু-একজন

ফিরলেও, অনেকেই ফেরে না। এমন দুর্বিষহ এবং ব্যয়বহুল অপেক্ষার অবসান হয় একদিন। সেই অবস্থার নাম কোমা, কোমাচ্ছন্ন এবং কোমাচ্ছন্নতা।

কোমা কী? কোমা মৃত্যুর কোন্ অবস্থাকে বোঝায়? Wikipedia বলছে, "In medicine, a coma is a state of unconsciousness lasting more than six hours in which a person : cannot be awakened; fails to respond normally to painful stimuli, right or sound; lacks a normal sleep-wake cycle; and, does not initiate voluntary actions. A person in a state of coma is described as being comatose.

A comatose person exhibits a complete absence of wakefulness and is unable to consciously feel, speak, hear, or move. For a patient to maintain consciousness, two important neurological components must function. The first is the cerebral cortex—the gray matter that covers the outer layer of the brain. The other is a structure located in the brainstem, called reticular activating system (RAS). Injury to either or both of these components is sufficient to cause a patient to experience a coma. The cerebral cortex is a group of tight, dense, "gray matter" composed of the nuclei of the neurons whose axons then from the "white matter", and is responsible for perception, relay of the sensory input (sensation) via the thalamic pathway, and many other neurological functions, including complex thinking. RAS, on the other hand, is a more primitive structure in the brainstem that is tightly in connection with reticular formation (RF). The RAS area of the brain has two tracts, the ascending and descending tract. Made up of a system of acetylcholine-producing neurons, the ascending track, or ascending reticular activating system (ARAS), works to arouse and wake up the brain, from the RF, through the thalamus, and then finally to the cerebral cortex. A failure in ARAS functioning may then lead to a coma."

যুক্তরাষ্ট্রের সান্তাক্রুজ শহরের ৩৯ বছরের বয়স্ক এক মহিলা কোমাচ্ছন্ন অবস্থায় একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। মহিলাটি প্রায় ৭০ দিন যাবৎ কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। সেই অবস্থাতেই সিজার করে শিশুটিকে প্রসব করানো হয়। মেলিসা স্কারলেট নামের এই ৩৯ বছর বয়সি মহিলাটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় সেমিকোমাটেজ অবস্থায় আছেন।

কোমা থেকে ফিরে এসে বিদেশি ভাষায় অনর্গল কথা বলে যাওয়া! বাস্তবে সম্ভব?

বাস্তব ঘটনাগুলি নিরীক্ষণ করা যাক—তার নাম বেন মেকমাহন। বয়স যখন ২২ তখন সে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় কোমায় চলে যায়। অন্তত এক সপ্তাহ লেগেছিল তার

ওই স্থবির অচলায়তন পরিধি থেকে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার জন্য। আর যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন নিবাসী এই তরুণ পুরোপুরি ভুলে গেছে নিজের মাতৃভাষা ইংরেজি। সবাই অবাক হয়ে শুনতে থাকল তার মুখে ইংরেজির পরিবর্তে চৈনিক ভাষা। জানা গেছে, বেন কেবল তার স্কুলেই অল্পবিস্তর চিনের মান্দারিন ভাষা শিখেছিল। কিন্তু সেটা বলা কিংবা লেখার জন্য যথেষ্ট নয়। অথচ কোমা থেকে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বেন চিনা ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই কথা বলতে শুরু করে। তার চিকিৎসকরা জানান, সে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল সেখান থেকে তার বেঁচে ফিরে আসাটা অনেক বড়ো ব্যাপার। বেন তার কোমা থেকে জেগে উঠার মুহূর্তটি স্মরণ করতে পারে। সে সময় সে দেখেছিল এশীয়দের মতো একজন সেবিকা (নার্স) তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে নার্সকে ডেকে চিনা ভাষায় জানালো, ক্ষমা করবেন, আমি এখানে সুস্থবোধ করছি না। এরপর সে নার্সকে একটা কলম এবং কাগজ আনতে বলে। নার্স এনে দিলে বেন তাতে মান্দারিন হরফে লিখে, 'আমি মাকে ভালোবাসি, বাবাকে ভালোবাসি, আমি সুস্থ হয়ে উঠব।' বেনের বাবা-মা তখন ছেলে বেঁচে গেছে তাতেই খুশি। মজার ব্যাপার হল পরবর্তী সে চিনের সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগে পড়ছে।

এ ধরনের ঘটনা কেবল তার ক্ষেত্রেই ঘটেনি। রয়েছে আরও নজির। ২০১০ সালের কথা। সে বছর এ রকম কোমায় থাকার পর ১৩ বছরের ক্রোশিয়ান এক বালিকা যখন জেগে উঠল তখন সে পুরোপুরি জার্মানি ভুলে গিয়ে নিজের গ্রামীণ ভাষা বলা শুরু করল। আবার খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, গেল বছর ২০১৩ সালে এক আমেরিকান নেভিকে তার মোটেল রুম থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সাময়িক কোমা বা চেতন ফেরত পাওয়ার পর দেখা গেল সে আর নিজেকে চিনতে পারছে না। এমনকি সে সুইডিশ ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে।

বিদেশি জার্মান ভাষাশিক্ষায় সবে হাতেখড়ি। থেমে থেমে পড়া, কিছু কিছু লেখা আর আধো আধো বুলি পর্যন্তই দৌড়। এরই মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কোমায় চলে যাওয়া। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এই কোমাই যেন তাকে রাতারাতি জার্মান ভাষা শিখিয়ে দিয়েছে। এখন সে জার্মান ভাষা এতটাই অনর্গল বলা শুরু করেছে যে নিজের ভাষাই ভুলে গেছে সে। ক্রোয়েশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় কেনিন শহরের ১৩ বছর বয়সি এক মেয়ের জীবনে ঘটে গেছে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা। শিশুটির অভিভাবকেরা জানান, শিশুটি সবে একটি বিদ্যালয়ে জার্মান ভাষা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছে। তবে অনর্গল কথা বলা দূরে থাক, ভাষাটি এখনও খুব একটা শেখা হয়ে ওঠেনি তার। শিশুটির পরিবার জানায়, সম্প্রতি আকস্মিক অসুস্থ হয়ে সে কোমায় চলে যায়। প্রায় ২৪ ঘন্টা সে কোমায় ছিল। তবে কোমা থেকে ফেরার পর সে মাতৃভাষা ভুলে যায়। আর শুদ্ধ জার্মানিতে কথা বলা শুরু করে। কেবি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা দাবি করেন, ঘটনাটি

একেবারেই ব্যতিক্রম। বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। হাসপাতালের পরিচালক দুজোমির মারাসোভিক বলেন, "এভাবে স্নায়ুরোগ (ট্রমা) থেকে সেরে উঠে মস্তিষ্ক কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে, আপনি কখনোই তা জানবেন না। তবে ওই ঘটনায় অবশ্যই আমাদের কিছু তাত্ত্বিকল ব্যাখ্যা আছে"। মনস্তত্ত্ববিশেষজ্ঞ মিজো মিলাস বলেন, "আগে এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক আখ্যা দেওয়া হত। তবে আমরা মনে করি, এর অবশ্যই যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। যদিও আমরা এখনও তা খুঁজে পাইনি"।

কোন ধর্মের মানুষ কেমনভাবে মৃতদেহের সৎকারে বিশ্বাস করেন, সেটা দেখা যাক। মিশরীয়রা : প্রাচীনকালে মিশরীয়রা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পরও তাদের আত্মা বেঁচে থাকে। কাজেই পরবর্তী জীবনে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, জীবনটাকে যাতে উপভোগ করা যায়, সে চিন্তায় মিশরীয়রা অস্থির থাকত। ব্যক্তির গুরুত্বের উপর নির্ভর করে গুরুত্ব আরোপ করা হত এ ব্যাপারে। ব্যক্তি যত গুরুত্বপূর্ণ হত এ কাজে গুরুত্ব তত বেশি বেড়ে যেত। পরবর্তী জীবনের আরাম-আয়েশের জন্য স্বভাবতই ফারাওদের ব্যাপারেই পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। ক্ষমতায় আসা নতুন ফারাওয়ের প্রথম কাজ সম্পন্ন করা। প্রত্যেকেই চাইতেন বিশাল আয়তনের হোক তার সমাধিক্ষেত্র। অনেকেই মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সমাধিক্ষেত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যেত। এসব সমাধিক্ষেত্র আসলে মৃতের আত্মার ঘর। মিশরীয়রা মনে করত, লাশ বা মৃতদেহ টিকে থাকার উপরই নির্ভর করে আত্মার বেঁচে থাকা বা ফিরে আসা। এ কারণেই মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মমি করত তারা। আত্মার বেঁচে থাকার জন্য চাই প্রয়োজনীয় নানা জিনিস। তাই নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বিশেষ করে খাবার-দাবার মৃতদেহের সঙ্গে দিয়ে দিত তারা। সমাধি-স্তম্ভ প্রধানের দায়িত্ব ছিল দস্যুদের হাত থেকে মৃতদেহ আর তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র রক্ষা করার। কিন্তু কবরে সমাধিত ব্যক্তিটি কত বিপুল পরিমাণ বিত্ত আর ক্ষমতাবান ছিল তা জাহিরের উদ্দেশ্যেও নির্মাণ করা হত পিরামিড। তাই ফারাওদের মৃতদেহের সঙ্গে কবরস্থ করা হত বিপুল ধন-সম্পদ। সমাজের বিত্তশালীদের কবরেও মূল্যবানসামগ্রী দেয়া হত। এমনকি, নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কবরেও সামান্য পরিমাণ হলেও কিছু খাবার রেখে দেয়া হত।

খ্রিস্টান ধর্মে সৎকার : খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহকে কবর দিয়ে থাকেন। এটাই রীতি। প্রাচীন যুগে পোপগণ মৃতের সুখের জন্য স্বর্গের জায়গা বিক্রি করতেন। জমি কিনলে যেমন দলিল থাকে, তেমনই পোপগণও একটা দলিল লিখে দিতেন - যাকে Indulgence বা পাপক্ষয়পত্র বলা হত। যখন কোনো ধনী ব্যক্তি স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে পোপকে প্রচুর ধনদৌলত দিত। এবং পোপ জিশুর ও মেরির মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একপ্রকারের হুণ্ডি লিখতেন। কী লেখা থাকত তাতে?- "হে ঈশ্বরের বান্দা জিশুখ্রিস্ট! অমুক ব্যক্তি স্বর্গে যাওয়ার জন্য তোমার নামে আমার কাছে লক্ষ মুদ্রা জমা করে দিয়েছে। সে স্বর্গে উপস্থিত হলে তুমি তোমার পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশ

সহস্র মুদ্রা মূল্যের ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বাগানবাড়ি, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের যান-বাহন-ভৃত্য এবং পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা আত্মীয়স্বজন-ভাই-বন্ধু প্রভৃতির নিমন্ত্রণের জন্য প্রদান করা হবে"। যাঁরা যত বেশি টাকা পুরোহিত বা পোপদের কাছে জমা দিতে পারবেন তাঁদের পিতা-মাতা-আত্মীয়স্বজন ততবেশি স্বর্গে জমি বা জায়গা পাবেন। তবে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা এমন ব্যবস্থাপত্রে রাখেন না, বিশ্বাস রাখেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা।

ইসলাম ধর্মে সৎকার : মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয় এবং আত্মীয়রা জামাজার নমাজ পাঠ করেন। আত্মীয়-পরিজনদের মৃত্যুর খবর পেলেই মুসলিমগণ মৃতের উদ্দেশ্যে — ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নালিল্লাহে রাজেউন - বলে থাকেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নালিল্লাহে রাজেউন", অর্থাৎ - নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। এরপর সম্মিলিতভাবে মৃতদেহটিকে মাটি (কবর) দেওয়ার পর ৪০ (চল্লিশ) দিনের মিলাদ দেওয়া হয়। এবং "লা ইলাহা ইল্লাহ মহম্মুদ রসুলাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মোহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ)- আয়াতটি বারে বারে পাঠ করা হয়। পুরোহিত নিয়োগে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই মৌলভি বা মাওলানা বা যে-কোনো মুসলিম ব্যক্তি যিনি আয়াতটি জানেন তিনিই পাঠ করতে পারেন। যে ব্যক্তির পিতা বা মাতা বা আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে তিনি স্বাভাবিক পোশাকই পরবেন, স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করবেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন আর পাঁচজনের মতো। মুসলিম সম্প্রদায়গণের মধ্যে দুটি শ্রেণি আছে। যেমন - (১) মোহম্মদী এবং (২) হানাফি। পিতা-মাতার মৃত্যু হলে মোহম্মদী সম্প্রদায়গণ লোকজন নেমন্তন্ন করে ভোজ দেন না। এঁদের মত - মৃত মানুষের জন্যে আবার ভাত রান্না কেন? এটা তাঁর কোন্ কাজে লাগবে? অপরদিকে হানাফি সম্প্রদায়গণ আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব ডেকে ভোজের ব্যবস্থা করবেন।

ইহুদি ধর্মে সৎকার : ইহুদিরা আত্মায় বিশ্বাস করেন না বলে আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে কোনো যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানাদিও নেই। এঁদের পরলোকবাদেও কোনো বিশ্বাস নেই। মোট কথা, ইহুদিরা ঈশ্বর, অবতার, পুনর্জন্ম, বর্ণভেদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না - মৃত্যু এবং মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যাগযজ্ঞাদিও করে না।

বৌদ্ধধর্মে সৎকার : বৌদ্ধধর্মে মৃতের সৎকারাদি বৌদ্ধভিক্ষুই করে থাকেন (যে কোনো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত হলে তাকে ভিক্ষু পদে উন্নীত করা হয়)। বৌদ্ধরা আত্মাকে নিত্য স্বীকার করে না এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাস করেন না। তবে বৌদ্ধরা মনে করেন, মানুষ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই ব্যক্তির চিত্তপ্রবাহের সংস্কাররাশি যা চুম্বকের মতো গুণসম্পন্ন তা নিকটতম গর্ভের সন্তানের মধ্যে চলে যায়। এইভাবেই তাঁর পুনর্জন্ম হয়। সে কারণে তাঁরা মৃতের কল্যাণে উদ্দেশ্যে কিছু করেন না।

বৈষ্ণবধর্মে সৎকার : বৈষ্ণব মতে মৃতদেহকে সমাধি (কবর) দেওয়াই নিয়ম। একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মৃতব্যক্তিকে যোগাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মৃতদেহের

মাথায় এক মালসা লবণ বা নুন ঢেলে দেওয়া হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ সাধারণত ১১ দিনের মৃতের আত্মাকে মন্ত্রপুত করে বিষ্ণুলোকে পাঠান।

সাঁওতালি সৎকার : সাঁওতালদের সৎকারে তাদের কেউ মারা গেলে মৃতদেহকে দাহ করে বাড়িতে ফেরার সময় একখণ্ড অস্থি নিয়ে এসে কোনো এক রাস্তার মোড়ে পুঁতে রাখে। এরপর তিন দিনের দিন নির্দিষ্ট অস্থিখণ্ডটি তিনটি ডালের মাথায় বসিয়ে সেটার উপর রাখে। গ্রামের মোড়ল বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশমতো মৃতের পুত্র ওই খুঁটির গোড়ায় ফুল, জল প্রভৃতি দিয়ে মৃতককে শ্রদ্ধা জানায়। ওই দিনেই ওখান থেকে অস্থি তুলে নিয়ে যে-কোনো নদীতে দিয়ে দিলেই মৃতের সৎকার শেষ হয়ে যায়। এরপর যে-কোনোদিন সুবিধামতো আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে ভোজের ব্যবস্থা করা।

বৈদিক মতে সনাতন সৎকার : প্রাচীনকালে সমস্ত সনাতনপন্থীরা বেদের নিয়মেই মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতেন। এখনও অনেকে বৈদিক নিয়মেই মৃতকের শেষকৃত্য করে থাকেন। বৈদিক ক্রিয়া মতে "শ্রাদ্ধ সহকারে যেটা করা হয় (সেই শ্রাদ্ধ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যে মৃত হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই তা করা হয়। জীবিত পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা করার নামই শ্রাদ্ধ)। বৈদিক নিয়মানুসারে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে দুই থেকে তিনদিন সময় লাগে। কী সেই নিয়ম? কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তাঁকে দাহ করার সময়ে মন্ত্রের মাধ্যমে অগ্নির এবং মৃতদেহের গুণগান করা হয়। মৃতদেহকে শ্মশানে চন্দন, ঘি, অগুরু, তগর, কস্তুরী, মাসা ইত্যাদি সহযোগে কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করা হয়। তৃতীয় দিনে মৃতকের কোনো আত্মীয় শ্মশানে গিয়ে চিতা থেকে অস্থি উঠিয়ে সেই শ্মশানের ভূমির কোথাও সেগুলি আলাদাভাবে রেখে দেয়। মৃতকের জন্য আর কোনো কর্ম করা কর্তব্য নয়। কেন-না "ভস্মান্তম্ শরীরম্" এই যজুর্বেদ মন্ত্রের প্রমাণে স্পষ্ট হয় যে দাহ ও অস্থি সঞ্চয়ণ ব্যতীত মৃতকের জন্য কোনো কর্ম করা কর্তব্য নয়।

"অন্ত্যেষ্টি" শব্দটি স্বয়ং ঘোষণা করছে - মৃতদেহ দাহ করাই পুণ্যকর্ম। অন্ত্যা অর্থে অন্তিম, চরম বা সর্বশেষ এবং ইষ্টি অর্থে যজ্ঞ, শুভকর্ম বা সংস্কার বোঝায়। মৃত্যুর পর বিধিপূর্বক শবদাহ করাই অন্ত্যেষ্টি কর্ম।

পৌরাণিক মতে হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকার : পৌরাণিক শাস্ত্রমতে (আসলে গরুড়পুরাণ মতে) হিন্দু সম্প্রদায়গণ শবদাহ এবং শবদাহান্তে অস্থি গঙ্গায় অস্থি প্রদান। তদুপরি বর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ যেমন - ১০, ১১, ১৫, ৩০ দিন পর পুরোহিত ডেকে আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এরপর মৃতদেহটি যাতে স্বর্গে যান তার জন্য যথাসম্ভব উপায় প্রয়োগ করা হয়। মৃতব্যক্তিকে স্বর্গে যেভাবে পাঠানো যায় তার কয়েকটা বন্দোবস্ত এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি।

যেমন - (১) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কানের সামনে জোরে জোরে গীতা পাঠ করা, (২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে বুকের উপর নামাবলি অথবা গীতা অথবা উভয়ই রাখা হয়, (৩) মৃতদেহ শ্মশান নিয়ে যাওয়ার পথে "হরি বলো" ধ্বনি তোলা, (৪) মৃতদেহ ভস্মীভূত হওয়ার পর অস্থি তুলে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা, (৫) ব্রাহ্মণকে সবৎসা গোরু দান, (৬) মৃতের দোষ কাটানো, (৭) নানাবিধ কারণে প্রায়শ্চিত্ত করা, (৮) ষোড়শ দান (শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকে ১৬টি দ্রব্য দান করলে মৃতব্যক্তি ৯৬০ হাজার বছর স্বর্গে সুখে কাল কাটাতে পারবেন। যতগুলি পুত্র ওই অনুষ্ঠান মৃতব্যক্তি ততগুণ স্বর্গলাভ করবেন। একজন পুত্র হলে ৯৬০ হাজার বছর, ১০ জন পুত্র হলে অবশ্যই ৯৬০০ হাজার বছর), (৯) হেম গর্ভ তিল দান। (১০) বিলক্ষণা শয্যা দান, (১১) মৃত ব্যক্তির নামে ষাড় ছেড়ে দেওয়া, (১২) অতিথি ভোজন, (১৩) ব্রাহ্মনভোজন, (১৪) বাড়িতে কীর্তন বা রামগানের আয়োজন করা, (১৫) গয়ায় পিণ্ডদান, (১৬) সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ, (১৭) পিতৃতর্পণ ইত্যাদি।

পিণ্ডদানও হিন্দুদের মৃতদেহের একটি সৎকার বিষয়ক ব্যবস্থা। পিণ্ডদানের মাধ্যমে প্রেতলোক থেকে অমৃতলোকে যাত্রা। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, মৃত আত্মা ঘুরে বেড়ায় মানুষের হাত থেকে জল চেয়ে। অর্থাৎ, বংশের জীবিত কারোর হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করে তবেই আত্মার মুক্তি। এ ক্ষেত্রে বংশের কেউ জীবিত না-থাকলেও অন্য কেউ মৃত আত্মার জল দান করতে পারেন। নিজের আত্মীয়ের পিণ্ডদানের সূচনাপর্বে জীবিতের হাত থেকে জীবজগতের সকল মৃত প্রাণীর (তা সে কীটপতঙ্গ, জন্তুজানোয়ার, এমনকী মৃত বৃক্ষাদি পর্যন্ত) জন্য জলদানের আচার বড়ো বিস্ময়কর। পিণ্ডদানের ধর্মীয় আচারস্থল হিসাবে নদীসঙ্গম, সমুদ্রস্থল, অভাবে বড়ো দিঘি বা পুষ্করিণী বেছে নেওয়া হয়। গয়ায় পিণ্ডদান বিশ্বাসীদের কাছে বিরাট ব্যাপার। এর কারণ হিন্দুপুরাণ। দেবতা বনাম অসুরের দ্বন্দ্ব। মহাদেব হত্যা (বধ?) করলেন ত্রিপুরাসুরকে। ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর পুরোনো হিসাব বুঝে নিতে নারায়ণের সঙ্গে শতাব্দীকাল যুদ্ধ করে। কোনো পক্ষই হারছে না, কোনো পক্ষই জিতছে না। এমতাবস্থায় নারায়ণের ইচ্ছেমতো গয়াসুর পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এরপর নারায়ণ গয়াসুরের মাথায় পা রাখলেন। তখন থেকেই সেই পদচিহ্নে পিণ্ডদান হয়। আচার-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এরকম চল্লিশটি বেদিতে পিণ্ডদানের প্রথা চালু আছে।

রামায়ণের নায়িকা সীতাদেবী স্বামী রাম এবং দেবর লক্ষণের অনুপস্থিতিতে ফল্গুনদীর তীরে মৃত শ্বশুরের উদ্দেশে বালির পিণ্ডদান করনে। রাম ও লক্ষণ ফিরে এসে সীতার কাছে পিণ্ডদানের ঘটনায় অবগত হলেন। কিন্তু সীতার বিবৃতি ওরা কেউ বিশ্বাস করলেন না। অবশেষে সীতাদেবী সাক্ষী মানলেন ফল্গু ও বটবৃক্ষদের। এক অজ্ঞাতকারণে ফল্গু নদী ঠিক সাক্ষ্য দিল না। সীতা অভিশাপ দিলেন ফল্গুনদীকে। বললেন, "অন্তঃসলিলা হও"। সেই থেকেই ফল্গুনদী নাকি মাটির নীচ দিয়ে বয়ে যায়। অপরদিকে বটবৃক্ষ যথাযথ সাক্ষ্য

দেওয়াতে সীতার আর্শীর্বাদে অমরত্ব পায়। সে কারণেই অক্ষয় বটের পাদদেশে পিণ্ডদান কর্মসূচী হয়। যাঁরা দুর্ঘটনা বা আত্মঘাতী বা অপঘাতে মারা যান তাদের জন্য প্রেতশিলায় পিণ্ডদান প্রচলিত। আগ্রহী পাঠকগণ যদি আরও জানতে কৌতূহলী হন, তাহলে গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডের ষষ্ঠ, ষোড়শ এবং চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় পাঠ করতে পারেন।

শব সমাধিস্থকরণ ও শবদাহ এবং একটি অপ্রিয় সত্যভাষণ : প্রাচীন ভারতে লোকসংখ্যা ছিল অনেক কম, কিন্তু সেই তুলনায় গাছপালা তথা জ্বালানি ছিল অনেক বেশি। কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা যেমন অনেক বেশি তেমনই আবার দিন দিন গাছপালা ও জ্বালানিও হ্রাস পাচ্ছে। এখানে যৌক্তিক, মানবিক, ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব সমাধিস্থকরণ ও শবদাহের সুবিধা-অসুবিধাগুলি এখানে উল্লেখ করা যাক - (১) ব্যতিক্রম ছাড়া খুব অল্প খরচে একটি মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খরচ লাগে না বললেই চলে। অন্যদিকে একটি মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ছাইভস্ম করতে প্রচুর জ্বালানির দরকার হয়। (২) মাটিতে যে জৈবিক উপাদান আছে সেগুলি মানুষের দেহেও থাকে। ফলে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করলে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললে জৈবিক উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। (৩) মৃতদেহকে সমাধিস্থ করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন হয় না। অন্যদিকে মৃতদেহকে আগুনে পোড়ালে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। (৪) মৃতদেহকে সমাস্থিকরণ একটি মানবিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে মৃতদেহকে আগুনে পোড়ানো একটি অমানবিক ও ভয়ংকর প্রক্রিয়া। শিশু ও দুর্বল হার্টের লোকজনের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এই কারণেই অনেকেই শ্মশানে যেতে চায় না, নানা কারণে যেতে হলেও শবদাহ প্রত্যক্ষ করেন না। এই কারণেই আজকের প্রজন্মের ছেলেরা মুখাগ্নিতে আপত্তি জানাচ্ছেন। (৫) বৃষ্টি-বাদলের দিনেও মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা যায়। কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের দিনে মৃতদেহকে আগুনে পোড়ানো খুবই কঠিন কাজ। আর মৃতদেহকে ঠিকমতো পোড়াতে না পারলে সেটি পরিবেশের জন্য আরও ক্ষতিকর। (৬) সর্বোপরি, মৃতদেহকে সমাধিস্থকরণের ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। সমাধিস্থকরণের জন্য জায়গা লাগলেও পরবর্তীতে সেই জায়গাকে আবার রি-সায়ক্লিং করা যায়। তা ছাড়া কবরস্থান ছাড়াও তো অনেক পতিত জায়গা-জমি পড়ে আছে। ফলে এটি মোটেও কোনো সমস্যা নয়। অন্যদিকে মৃতদেহকে পোড়ানোর সবগুলো দিকই ক্ষতিকর এবং অযৌক্তিক বা অমানবিক বা অবৈজ্ঞানিক। মৃতের সৎকার তো হল, সৎকারের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে স্বর্গে পাঠিয়েই কী সব শেষ! মৃত্যুর পরে কী কিছুই নেই? মৃত্যুতেই কী একটা জীবনের সব শেষ? আত্মা বলে কি কিছু আছে? তবে আত্মা কী? আত্মার স্বরূপ কী? আত্মাই পুনর্জন্ম ঘটাতে পারে? পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা খুঁজতে চেষ্টা করব মৃতব্যক্তির পরিণতি এবং আত্মার ব্যাখ্যার উত্তর।

অবশেষে মানুষ একদিন মৃত্যুকে স্পর্শ করে কিংবা মৃত্যু মানুষকে স্পর্শ করে।

জীবনের প্রথমবার এবং শেষবারের মতো চরম সত্যের মুখোমুখি হয় মানুষ। নানাভাবে মানুষের মৃত্যু আসতে পারে। যদিও সব মৃত্যুই মৃত্যু হলেও, সব মৃত্যু একরকম হয় না। মৃত্যু যেরূপে মানুষকে আলিঙ্গণ করে - (১) বার্ধক্যজনিত মৃত্যু, (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু (বন্যা, সাইক্লোন, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি), (৩) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, (৪) অসুখে-বিসুখে মৃত্যু, (৫) যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু, (৬) রাজনৈতিক কারণে মৃত্যু, (৭) আত্মহত্যায় মৃত্যু, (৮) অনুমতি সাপেক্ষে মৃত্যু (ইচ্ছামৃত্যু), (৯) রাষ্ট্র দ্বারা মৃত্যু (আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ড), (১০) ধর্মীয় কারণে মৃত্যু (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা), (১১) শত্রুতার কারণে মৃত্যু, (১২) আততায়ীর হাতে মৃত্যু (ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধী, মুজিবর রহমান, জন কেনেডি প্রমুখ), (১৩) সামাজিক অশিক্ষার কারণে মৃত্যু (ডাইনি হত্যা ইত্যাদি), (১৪) না খেতে পেয়ে বা অনাহারে মৃত্যু, (১৫) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনশনে মৃত্যু (চেট্টি) (১৬) পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু (ডাইনি হত্যা ইত্যাদি। মানুষ ছাড়া এত প্রকারের মৃত্যু পৃথিবীর আর কোনো প্রাণীর হয় না। তা মৃত্যু যেভাবেই হোক - মৃত্যুর পর কী, তা নিয়ে আমাদের অপার কৌতূহল। নানা জনের নানা মত। সত্যটা কী? সবটাই ধোঁয়াশা!

জীবের মৃত্যুর কথা জানার আগে 'জীবন' কী সেটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। যদিও বিজ্ঞানীরা আজও জীবন বা প্রাণের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেননি, তবুও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের ভাষায় জীবন হল - (১) জীবন বা প্রাণ এমন এক সত্তা যার থেকে অনুরূপ সত্তার জন্ম হতে পারে। পরিবেশের প্রভাবে যার আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটলে তার থেকে উন্নততর জীবন-সৃষ্টির পথ সুগম হতে পারে। (২) প্রতিনিয়ত পরিবর্তনোন্মুখ পরিবেশে মানিয়ে নিতে ইচ্ছুক জটিল সুসংবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের সুনির্দিষ্ট শক্তির বহিঃপ্রকাশই হল জীবন। (৩) বৃদ্ধি, জনন, পরিব্যক্তি ও বিবর্তন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সজীব, জটিল, কোষীয় জৈব যৌগকে জীবন বা প্রাণ বলে। (৪) পরিবেশ ও সজীব বস্তুর আন্তঃবিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশই হল জীবন।

জীবের মৃত্যু অনেকাংশেই প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। প্রোটোপ্লাজম বিশেষ এক প্রকার জটিল যৌগ। উদ্ভিদ বা প্রাণী যে-কোনো জীবদেহ এক বা একাধিক কোশের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণত কোশের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থেকে এই প্রোটোপ্লাজম সবরকম শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে। সে জন্য প্রোটোপ্লাজমকে "প্রাণের ভৌত ভিত্তি" বা "Physical basis of life" বলা হয়। প্রতিটি জীবদেহে প্রোটোপ্লাজম বর্তমান, অর্থাৎ যেখানেই প্রাণ সেখানেই জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজম গঠনের ৭৫% জল। তাই জীবদেহের জলের অভাব হলে প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে জীব বাঁচতে পারে না। তাই জীবকোশে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু হলে জীব জড়বস্তুতে পরিণত হয়। জন্মের পর অধিকাংশ জীবদেহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং পৌঢ়ত্বের পর প্রাকৃতিক নিয়মে জীবদেহে বার্ধক্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে। দেহের কর্মক্ষমতা কমে আসে এবং জরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্মক্ষমতা কমে

আসার ফলে দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে কোশ আর ঠিকমতো অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে কোশস্থিত অঙ্গাণুগুলি ধীরে ধীরে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং জীব একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, নশ্বর শরীর নিথর হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের ছন্দোবদ্ধতা স্তব্ধ হওয়া মানেই মৃত্যু নয়, যতক্ষণ-না মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটছে ততক্ষণ মানুষের মৃত্যু বিলম্বিত হয়। অতএব মৃত্যু জীবের অবধারিত এবং স্বাভাবিক পরিণতি। মৃত্যুর কোনো দিনক্ষণ হয় নাকি? হয় না। কারণ রোগীর মৃত্যুর 'সঠিক' সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিণ্ড ১৫ মিনিট, কিডনি ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশি ৬ ঘন্টা। অঙ্গ বেঁচে থাকার অর্থ হল তার কোশগুলি বেঁচে থাকা। কোশ বেঁচে থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির জোগান থাকে। শক্তি উৎপন্ন হয় কোশের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হলে কোশেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরে শেষ কোশটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

মৃত্যু তো হল, কিন্তু মৃত্যুর ওপারে কী সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই উপনিষদের কথা মনে পড়ে গেল। কঠ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে যম ও নচিকেতার উপাখ্যান আমরা জানতে পারছি, বাজশ্রবস নামক মুনি যজ্ঞফল কামনা করে পুরাকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন করে সেই যজ্ঞে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা পিতাকে বারবার "আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে দান করিবেন?" বলে বিরক্ত করলে পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বললেন, "তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিলাম।" অতঃপর নচিকেতা যমের গৃহে উপস্থিত হলেন এবং তিন রাত্রি অনাহারে থাকলেন। গৃহস্থের বাড়িতে সমাগত ব্রাহ্মণ-অতিথি অনাদৃত হয়ে অনাহারে থাকলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, সেই কারণে যম নচিকেতাকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার অতিথি এবং ব্রাহ্মণ, কাজেই আমার নমস্কারের যোগ্য। যেহেতু তুমি আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে যাপন করিয়াছ, সেই কারণে প্রতি রাত্রির জন্য একটি করিয়া মোট তিনটি বর প্রার্থনা কর"। যমের শুনে নচিকেতা বললেন, "হে যম, আমাকে যমালয়ে পাঠাইয়া পিতার যে দুশ্চিন্তা হইয়াছে তাহা প্রশমিত হউক।....তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পূর্বস্মৃতি যেন জাগিয়া ওঠে এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া যেন সাদর সম্ভাষণ করেন। বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি"।

প্রথম বরপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নচিকেতা বললেন, "হে মৃত্যু, স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই, আপনারও সেখানে কোনো অধিকার নাই, বার্ধক্যজনিত জরার ভয়ও সেখানে নাই। সেখানে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোনো কষ্ট পান না, সমস্ত শোক ও মানসিক দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আনন্দ ভোগ

করেন। হে মৃত্যু, যে অগ্নির চয়ন দ্বারা মানুষ স্বার্গে করে, সেই অগ্নির বিষয় আপনি সম্যক্ অবগত আছেন। শ্রদ্ধাবান আমাকে তাহা সবিস্তারে বলুন। যাঁহারা মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে গমন করেন তাঁহাদের অমৃতত্ত্ব লাভ হয়, এই কারণে স্বর্গলাভের অভিলাষী হইয়া আমি দ্বিতীয় বরে স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি"। যম বললেন, "তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা করো"। যমরাজের কথা শুনে নচিকেতা বললেন, "কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ হলেন আত্মা থাকে না। পরলোক সম্বন্ধে মানুষের মনে এই যে সন্দেহ বিদ্যমান আপনার উপদেশে সেই আত্মার তত্ত্ব আমি সম্যক্ জানিতে ইচ্ছা করি। বরসমূহের মধ্যে ইহাই আমার প্রার্থনীয় তৃতীয় বর। যম বললেন, "নচিকেতা, তুমি যে বিষয়ে বর প্রার্থনা করিয়াছ সে বিষয়ে দেবতারাও পূর্বে সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রাকৃত লোকে সহজে ইহা জানিতে পারে না, কারণ এ আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। তুমি অন্য বর প্রার্থনা করো। আমাকে এ বিষয়ে আর উপরোধ করিয়ো না, আমার নিকটে এই বর প্রার্থনা ত্যাগ করো। যে বিষয়ে দেবতারাও পূর্বে সংশয় প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ জানবে কীভাবে ; তবে কঠ উপনিষদ বলছে, "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।/ ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ"। অর্থাৎ "কোনো মরণশীল মানুষই প্রাণবায়ু, অপানবায়ু বা অন্য কোনো বায়ু দ্বারাই জীবন ধারণ করে না, পরন্তু এই প্রাণ ও অপান যাকে আশ্রয় করে আছ দেহ থেকে পৃথক সেই আত্মা দ্বারাই জীবন ধারণ করে।"

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস "মহাভারত"-এর অষ্টাদশ পর্ব স্বর্গারোহণপর্বে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এ জগতে আশ্চর্য কী?" ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন, "মৃত্যু অবধারিত জেনেও মানুষ বেঁচে থাকে- এটাই আশ্চর্য।"

আসলে এই বেঁচে থাকা এবং ক্রিয়মান জীবনের পরিসমাপ্তি রেখা-যার অপর নাম মৃত্যু - আশ্চর্য দুই-ই। জন্মলাভের মধ্য দিয়ে যে জীবনের শুরু এবং ক্রম-অভিব্যক্তি যার প্রকৃতি - এ যেমন নিশ্চিত, তেমন নিশ্চিত মৃত্যুতে তার শেষ পরিণতি।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহণপরাণি।/তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী"।। - অর্থাৎ "মানুষ যেমন জীর্ণ পোশাক ত্যাগ করে নতুন পোশাক গ্রহণ করে, তেমনই আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে।" "জীর্ণ পোশাক" কী, কখন, কীভাবে তা তো আমরা সবাই বিলক্ষণ জানি। কিন্তু "জীর্ণ শরীর" বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা কিন্তু কোথাও দেননি। অতএব "জীর্ণ শরীর" বলতে আমি বার্ধক্য বয়সকেই বুঝব, তাই নয় কি? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন এই শরীরটির নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার সক্ষমতা লোপ পায় এবং বার্ধক্যজনিত রোগগুলি শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে তখনই ধরে নিতে হবে আমরা বার্ধক্যে পৌছে গেছি। তাই বার্ধক্যে পৌছানোর বয়স ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হতেই পারে।

প্রতিটি মানবকোশে অজস্র (নির্দিষ্ট সংখ্যক) ডিএনএ (DNA) আছে, আর তারই একটা ছোট্ট অংশকে বলা হয় জিন (Gene)। এই জিনগুলিই আমাদের বংশগতির ধারক ও বাহক। আর এই জিনজনিত কারণকেই এখনও বৃদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হিসাবে তাত্ত্বিকভাবে ধরে নেওয়া হয়।

পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে তৈরি হয় প্রচুর বিষাক্ত উপাদান, যাদের বলা হয় রি-অ্যাকটিভ অক্সিজেন স্পিশিস (Reactive oxygen species), যার সংক্ষিপ্ত ভিন্ন একটি নাম 'ফ্রি র্যা ডিকেল' (Free radical)। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে এন্টি-অক্সিডেন্ট (antioxidant) নামক এমন কিছু উপাদান আছে যা সহজেই এইসব ফ্রি র্যাডিকেলকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আর যখন এদের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং ফ্রি র্যামডিকেল প্রাধান্য বিস্তার করে তখন এরা আমাদের বিভিন্ন জিন তথা ডিএনকে ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। আরো মজার একটি ব্যাপার হল আমাদের শরীরে এমন কিছু জিন আছে যারা সেই ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএগুলিকে সারিয়ে তুলতে পারে। ফ্রি র্যা ডিকেল যখন সেইসব সারিয়ে তোলার মতো জিনকেও ধ্বংস যা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন কিন্তু সত্যি সত্যিই আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ব্যাপকভাবে তাদের কর্মক্ষমতা হারাতে শুরু করে। মস্তিষ্ক, হৃদপিন্ড, ফুসফুস, বৃক্ক, অগ্নাশয়, পেশি, ত্বকসহ সকল অঙ্গগুলি এমনিভাবে প্রতিকুলতার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সহজেই বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করে। এভাবেই একটি মানুষ একসময় বার্ধক্যে উপনীত হয়। অর্থাৎ শরীর জীর্ণ হয়। গীতার বয়ান অনুসারে এই শরীর যদি জীর্ণই, তবে সেই জীর্ণ শরীর ছেড়ে আত্মা নতুন শরীরের খোঁজে ত্যাগ করতেই পারে। কিন্তু শূন্য (zero) বয়স থেকে যুবক বয়সে যাদের হঠাৎ মৃত্যু হয় তাদের জীর্ণ নয়, তাহলে শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে কোন্ শরীরের সন্ধানে? সে কথা গীতার বক্তা বলেননি। শুধু গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ কেন, কোনো ধর্মবেত্তাই এর জবাব দেয়নি।

প্রশ্ন হল, মৃত্যুই কী শেষ? অনেকে মনে করেন মৃত্যুই শেষ নয়। আছে আত্মা, আছে জন্মান্তর, আছে বিচার - বিচারে কারোর স্বর্গে (বেহেস্ত বা জন্নত), কারোর-বা নরকে (জাহান্নাম বা দোজখ) গমন ইত্যাদি। আবাল্য যাকে পাশে নিয়ে বেড়ে উঠলেন, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিতে যার আন্তরিক সাহচর্য, কিংবা স্নেহ-ভালোবাসা লাভ করে তৃপ্ত হয়েছেন, প্রেরণা পেয়েছেন, কিংবা জীবনের পথে চলতে গিয়ে যাদের পাশাপাশি দেখেছেন-পেয়েছেন-তারপর একদিন হঠাৎ করে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে হল মৃত্যু তাদের ছিনিয়ে গেল বিনা কৈফিয়তে। চিরতরে হারিয়ে গেল পরম প্রিয়জন। কোনোদিন আর সে ফিরবে না। জন্মমুহূর্তে যেমন একা এসেছিলাম, তেমনই একাই যেতে হয়। মর-জগতের কোনো বস্তুই সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে না, নিয়ম নেই যে! নিয়ে যাওয়া যায় না কারোকেই। যে যায় সে একা শূন্য হাতেই যায়। যায় কি? কোথায় যায়? কেন যায়? কে যায়? আত্মা?

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস থাক বা না-থাক আগ্রহ সকলের মধ্যেই কমবেশি বর্তমান। পণ্ডিতপ্রবর কোচ গ্রুনবার্গ মনে করেন, কতকগুলি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি দেখে মনে হয় - হাড়গোড়ই জীবাত্মার শেষ আশ্রয়স্থল। দেহের মৃত্যু হলে এই কঙ্কালের মধ্যেই জীবাত্মা থাকে। ঠিকই তো! আজ পর্যন্ত ভূতপ্রেতের রূপকল্পনা করতে কঙ্কালের কল্পনাই আগে করে নিই। টিউটনরা মনে করেন, মৃত্যুর জগৎ ছায়া জাতীয়। দেবী হেল এই মৃত্যুর জগৎ শাসন করেন। সূক্ষ্ম কোনো সত্তা স্থূলদেহীর মৃত্যুর পর ভিন্নলোকে গেলেও চিরকাল সেখানে থাকতে পারে। আবার শ্লাভজাতিরা মনে করত, স্থূলদেহের মৃত্যু হলেই সব শেষ হয়ে যায় না। তাই তাঁরা মৃতের সঙ্গে কবরে পার্থিব জীবনে ভোগের সব কিছুই দিয়ে দিত। অন্যদিকে তিব্বতীয়রা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরও জীবাত্মা বেঁচে থাকে। তাঁরা বিশ্বাস করে, মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবাত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় না, চারদিন পর্যন্ত আত্মা দেহের সঙ্গে লেগে থাকে।

মধ্য প্রাচ্যের আন্নামাইটদের মধ্যে রীতি ছিল গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করা। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনপুরুষ পর্যন্ত পূর্বপুরষদেরই নাম স্মরণ করা যেত (হিন্দুরা যেমন তর্পণে সাত পুরুষের বা কোনো হিন্দু চোদ্দপুরুষের নাম স্মরণ করে থাকে)। তবে আন্নামাইটরা পূর্বপুরুষদের সকলেই একত্রে যুক্ত করে পারিবারিক "এক আত্মা" রূপে কল্পনা করেও পুজো দিত। এমন অনেক নরগোষ্ঠী আছে যাঁরা মৃতের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করে না। দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের অনেকেই পিতৃপুরষদের ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। মৃতের আত্মা দুষ্ট আত্মাতে পরিণত হয় বলে তারা মনে করে। সেইজন্য নামরূপ জীবাত্মাকে স্মরণ করে তাকে আনতে চায় না। ফলে মৃত ব্যক্তির নাম মুখেও আনে না। কোথাও কোথাও মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করলে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও আছে। গুয়াজিরো জাতিদের মধ্যে কেউ মৃতের নাম উচ্চারণ করলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হত। গায়ানার প্রাচীন অধিবাসীরা দেহের নানা অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আত্মার কল্পনা করত। যেমন-হৃৎপিন্ডের আত্মা, মস্তিষ্কের আত্মা, রক্তের আত্মা, থুতুর আত্মা ইত্যাদি। চিনের পিকিং মানবজাতিরা মৃতের মাথা ভেঙে ঘিলু খেয়ে নিত। ভক্ষিত মস্তিষ্ক-ঘিলু সেই ব্যক্তির শক্তিও সাহস ভক্ষকের শরীরের ভিতর নিয়ে আসবে। হয়তো পিকিং মানুষেরা এরকম তত্ত্বেই বিশ্বাস করত। কোনো কোনো জনগোষ্ঠীদের মধ্যে শুধুমাত্র মুণ্ড কবর দেওয়ার নিয়ম ছিল। যেমন নিয়ানডার্থাল যুগের মানুষদের মধ্যে এ রীতি ছিল। মুণ্ডের মধ্যেই জীবাত্মা থাকে — এরকম কবর দেওয়ার পিছনে কাজ করেছে। জানা যায়, নব্যপ্রস্তর যুগের প্রথমদিকে কোথাও কোথাও নাকি মৃতদেহ থেকে মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করে কবর দেওয়া হত। মস্তিষ্ক জীবাত্মার বসবাস - এরকম ধারণা যে নব্যপ্রস্তর যুগেও ছিল এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। এমনকি, নিউজিল্যান্ডের মাওরিরাও জীবাত্মার মস্তিষ্কে বাস করে - এ রকম ধারণাই পোষণ করে। একটি নয়, একটি মানুষের কমপক্ষে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে - এমনটা মনে করে মেলানেশিয়ান জনগোষ্ঠীরা।

তবে বগোবো জনগোষ্ঠীরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি আত্মা আছে - একটি ভালো, অপরটি মন্দ। মৃত্যুর পর ভালো আত্মাটি স্বর্গে যায় এবং খারাপ আত্মাটি যায় নরকে। বহু আফ্রিকান এবং পলিনেশিয়ান জনগোষ্ঠীর একটা অংশ এক অদ্ভুত তত্ত্বে বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করত - মহিলা ও নীচুজাতের লোকেদের আত্মা থাকে না। তাদের কাছে পুরুষের আত্মিক শক্তির পরিচয় ছিল কয়টি বিয়ে তিনি করেছেন তার উপর। অর্থাৎ, যে যত বিয়ে করে তার আত্মিক সত্তা তত বেশি। "নেফেস" বলতে জীবাত্মা বোঝালেও একে দেহযুক্ত আত্মার বাইরে খুব বোধহয় ইহুদিরা ভাবতে পারত না। তবে গ্রিক চিন্তার প্রভাবে ইহুদিরা আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে। এই অমরত্ব তাদের মতে জীবাত্মিক সত্তাতেই হত। অর্থাৎ, কোনো জীবাত্মা চিরকালের জন্য নরক ভোগ করবে, কোনো আত্মা চিরকালের জন্য স্বর্গ ভোগ করবে। ভারতের আদিবাসীরা আত্মা-ভাবনায় বারবার তাদের ধারণা বদলেছে। তার কারণ, ভারত স্মরণাতীত কাল থেকেই হাজারো জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। পরিবেশ, জলবায়ু, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি যেমন মুহুর্মুহু বদলেছে - ঠিক তেমনই আত্মার ধারণাও বদলেছে। আজও ভারতের নানা স্থানের জাতিদের নানা রকমের আত্মার ধারণা বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন দর্শন। জীবাত্মা বলতে নির্ভেজাল এক ভারতীয় বিশ্বাস বলতে যা বোঝায়, তা নেই। ভারতে প্রাগার্য নরগোষ্ঠীর জীবাত্মা সম্পর্কে নানা বিশ্বাস যেমন আছে, ঠিক তেমনই আর্যদেরও যুগে যুগে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আবার প্রাগার্য এবং আর্য বিশ্বাস পরস্পর মিশে গিয়েও নতুন ধারণার জন্ম নিয়েছে। ভারতে সাধারণ বিশ্বাস হল, একটি দেহে একটিমাত্র আত্মা থাকে। আদি বৈদিক সাহিত্যে জীবাত্মার চিন্তা তেমন করে প্রতিফলিত হয়নি। কারণ আর্যরা প্রথমদিকে জীবনেরই উপাসক ছিলেন, মৃত্যুর নয়। ঋগ্বৈদিক আর্যরা মৃত্যুর চিন্তা তেমন করে করেননি। তার কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না। তবে ঋগ্বৈদিক আর্যরা মৃত্যুলোকের একটা কল্পনা করেছিলেন। ভাবতেন - মৃত্যুলোক একটা বহুদূর ধূসর দেশ, যেখানে সূর্য তার জ্যোতি হারিয়ে অন্ধকার সৃষ্টি করে। সেই ধূসর জগতেরও একজন দেবতা আছেন বলে তাঁরা মনে করতেন। সেই দেবতার নামই যম, মৃত্যুরই সমার্থক মাত্র। অথচ পরবর্তীকালে এই যমই ভয়াবহ রূপে কল্পনা করা হল। ঋগ্বৈদিক যম মোটেই ভয়াবহ নয়। বলা হয়েছে - যম ও যমী হলেন প্রথম মানব ও মানবী, যাঁরা মৃত্যুর পর অস্তাচলের জগতে গিয়ে তাঁর অধীশ্বর ও অধীশ্বরী হয়েছিলেন। প্রথম মানব-মানবীর "লোক" হিসাবে সেই মৃত্যুলোক ঋগ্বৈদিক আর্যদের কাছে পিতৃলোক নামে পরিচিত। ফলে পিতৃলোকে পরলোক ভীতির স্থান তো নয়ই, বরং সুখকর লোক হিসাবে তাঁদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল। তবে মৃত্যুর পর যে এই স্থূলদেহ থাকে না এটা ঋগ্বৈদিক ঋষিরা জানতেন। সেইজন্য মৃত্যুর পর রূপান্তর ঘটে এরকম ধারণা হয়েছিল। মৃত্যুর পর মানুষ অমর হয়, এরকম একটা ধারণাও ছিল। মৃত্যু তাদের কাছে

ছিল স্থূলদেহের নাশ মাত্র, আর কিছুই নয়। কিন্তু স্থূলদেহ নাশ হওয়ার পর জীবনের সত্তা কী থাকে, এ সম্পর্কে তাঁরা কিছু বলেননি। জীবাত্মার স্বরূপ কী সেটা তাঁরা স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি।

ঋগ্বেদের ধারণা, মৃত্যুর পর পাপীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, পুণ্যবান অমরজীবন লাভ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বলা হয়েছে - পাপী এবং পুণ্যবান উভয়ই মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগের জন্য পুনর্জন্ম লাভ করবে। কর্মফলের জন্যই মানুষ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে চিরকাল ঘূর্ণায়মান, এমনই ধারণা ছিল। উপনিষদে বলা হয়েছে, কামনা-বাসনা থাকলে স্থূলদেহের মৃত্যু হলে জীবাত্মা পুনরায় জন্মান্তরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় এমন চিন্তাভাবনাও শুরু হল। বলা হল, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হল নিষ্কাম কর্ম।

বেদান্ত মতে - আত্মা কখনো চলে যায় না, আসেও না, জন্মগ্রহণ করে না, মৃত্যুও হয় না। আত্মা যেসব কাজ করেছে, যেসব চিন্তা করেছে, সেগুলিই একে কোনো বিশেষ দিকে পরিচালিত করবে। ওই আত্মা নিজের মধ্যে ওইসব সংস্কার নিয়ে গন্তব্য পথে এগিয়ে যাবে। যদি সমবেত কর্মফল এমন হয় যে, পুর্নবার ভোগের জন্য তাকে একটা নতুন শরীর গড়তে হবে, তবে তা এমন পিতামাতার কাছে যাবে, যাদের থেকে সেই শরীর গঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যেতে পারে। আর সেইসব উপাদান নিয়ে আত্মা একটি নতুন শরীর গ্রহণ করবে। এইভাবে ওই আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে যাবে, কখনো স্বর্গে যাবে, আবার পৃথিবীতে এসে মানবদেহ পরিগ্রহ করবে; অথবা অন্য কোনো উচ্চতর বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করবে। এভাবে আত্মা ততদিন অগ্রসর হবে, যতদিন-না তার অভিজ্ঞতা অর্জন শেষ হয় এবং পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

ভারতীয় দর্শনে জড়বাদী চার্বাক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। আত্মার অমরতা, কর্ম ফলভোগ, জন্মান্তর, বন্ধন, মুক্তি সবই অর্থহীন - প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোনো অজড় নিত্য চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কোনো শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, কোনো এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যেসব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেইসব মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রহাহেই আত্মা। ভগবান বুদ্ধের মতে, জন্মান্তর অর্থে কোনো চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জৈন দার্শনিকরা অবশ্য আত্মার সত্তা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট এব চৈতন্য আত্মার স্বরূপ লক্ষণ। আত্মা নিত্য এবং দেহাতিরিক্ত সত্তা। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। কর্মফল ভোগের জন্য আত্মা যখন যে দেহ ধারণ করে, তখন সেই দেহের অবস্থা লাভ করে।

চৈনিক তাওবাদীরা মনে করতেন, প্রত্যেকটি লোকের দুটি করে আত্মা আছে - "কি" এবং "লিঙ"। "কি" হল প্রাণ এবং "লিঙ" হল যথার্থ জীবাত্মা বা দেহের সূক্ষ্ম সত্তা। "কি" দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে। "লিঙ" দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়গণের একটা অংশের বিশ্বাস, আত্মা মৃত্যুকালে মুখ দিয়ে নির্গত হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মস্তিষ্কের পিছন দিয়ে আত্মা নির্গত হয়। মৃত্যুর পর ফেরেস্তা বা দেবদূতেরা আত্মাকে বেহেস্তে নিয়ে গেলেও সেখান থেকে আল্লাহতালা আবার তাদের নীচে পাঠিয়ে দেন। স্বর্গ থেকে ফিরে এসে এইসব আত্মারা কেউ বেশিদিন, আবার কেউ কমদিন কবরে বাস করে। তাদের বিশ্বাস, রোজাকেয়ামতের দিন পর্যন্ত আত্মা পাখির আকারে জীবিত থাকে। বিশ্বাসী ব্যক্তি যে পাখিটিকে আশ্রয় নেয় তার রং সবুজ, পাপীদের আত্মা যে পাখিটিতে আশ্রয় নেয় তার রং কালো। কোরানের মতে, প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে। শেষের দিনে পরমপিতার তুর্যনাদে যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরা মারা যাবেন। উচ্চস্তরীয় কিছু দেবদূতই কেবল বেঁচে থাকবেন। কে, কবে মারা যাবেন তা পূর্বনির্দেশিত। মৃত্যুকালে যার মুখ থেকে "আল্লা ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই"। কালিমাটি উচ্চারিত হবে তিনি নিশ্চয় বেহেস্তে যাবেন। জীবাত্মা আছে - এ বিশ্বাস ইসলামে দৃঢ়। মুসলমানরা মনে করেন, যাঁরা ইসলামে বিশ্বাস করেন মৃত্যুর পর দয়ার্দ্র কোনো দূত সাদা পোশাক পরে তাঁর আত্মার কাছে আসেন এবং পরমপিতার শান্তিতে স্থান লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আত্মাকে এক দেবদূতের কাছ থেকে অন্য এক দেবদূতের কাছে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত তাঁকে ইসলাম বিশ্বাসীরা যেখানে আছেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ইসলামীরা মনে করেন, ইসলামে অবিশ্বাসী আত্মা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেহত্যাগ করে। ঈশ্বরের দূতেরা বিরক্ত হয়ে তাকে অবিশ্বাসীদের আত্মা যেখানে আছে সেখানে নিয়ে যান।

মৃত্যুর পর আত্মার পুনরুত্থানের ধারণা সর্বপ্রথম পারস্যেই সৃষ্টি হলেও পরে নিউ টেস্টামেন্টের পাতায় ওই ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তখন থেকেই পাশ্চাত্য জগতের খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা পরিমাণে ওই ধারণা গ্রহণ বা স্বীকার করে আসছিল। মথি, লুক মার্ক লিখিত সুমাচারের মধ্যে আত্মার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মৃত্যুর পর একটি সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব আছে - এই রকমের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। নিউ টেস্টামেন্টে যে প্রেতাত্মার কথা পাওয়া যায় তা শেষপর্যন্ত Holy Ghost -এ পরিণত হয়েছে। খ্রিস্টানগণ মনে করেন, আত্মা হল অধ্যাত্ম সত্তা।

আত্মা বিষয়ে দার্শনিকগণ কী বলছেন সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, দেহের সঙ্গে আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। জন্মের সময় আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পর আত্মা নিজের রাজ্যে চলে যায়। দার্শনিক ডেকার্তের মতে আত্মা এবং জড় পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট। চেতনার মাধ্যমে আমরা আত্মাকে জানতে পারি। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমরা অনুভবের মাধ্যমে আত্মাকে জানতে

পারি। বার্কলের মতে - ধারণা নিষ্ক্রিয়, আত্মা সক্রিয়। আত্মা আশ্রয়, ধারণা বিষয়। আত্মা জ্ঞাতা, ধারণা জ্ঞেয়।

এবার আত্মা বিষয়ে বিজ্ঞানীরা কী বলেন সেটাও দেখে নিতে পারি। তবে তার আগে স্বামী নিগূঢ়ানন্দের বিজ্ঞানীরা কী বলেছেন সেটা আগে দেখব। নিগূঢ়ানন্দের "মৃত্যুর পরে" গ্রন্থটিতে বলছেন, রুশ বিজ্ঞানীরা মৃতদেহ থেকে চার গজ দূরে সারগেয়েভ ডিটেকটর বসিয়ে দেখেছেন যে, মৃতদেহ কোনো সাড়া না থাকলেও সেই দেহের চার গজ দূরত্বে শক্তির সাড়া পাওয়া যায়। এই দূরত্বে দেহের ফোর্সফিল্ড থাকে বলে বিশ্বাস। আমেরিকার নিউ জার্সির টমসন ডঃ জ্যাক ওয়ার্ডের সাহায্যে আবিষ্কার করেন যে, একটি মানুষের এই ফোর্সফিল্ড আর-একটি মানুষের ফোর্সফিল্ডের স্পন্দন দূর থেকেই অনুভব করতে পারে। মানুষের এই ফোর্সফিল্ড বা দ্বিতীয় সত্তাই বিপদ-আপদ এবং ভালোমন্দের কথা আগে থেকেই বুঝতে পারে। তদানীন্তন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিজ্ঞানীরাও দেহের একটা আত্মিক ক্ষেত্র বা Psi-field রূপী আবরণ আবিষ্কার করেছেন। এই সত্তা নিয়ে তারা Psychotronics নামে এক বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছেন। এই বিজ্ঞান জীবের এই দ্বিতীয় সত্তা নিয়ে কাজ করে। চেকরা দেখিয়েছেন যে, সকল জৈবসত্তার চারদিকেই এই তেজাবরণ থাকে। এই তেজাবরণ বা সাইকোট্রনিক-এনার্জিই হল আত্মা - যা স্থূলদেহ থেকে মৃত্যুকালে বেরিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা স্থূলদেহ থাকাকালীন সূক্ষ্মদেহ বা বায়ো-প্লাজমিক বডির একটা অনুমান করতে পেরেছেন মাত্র। মৃত্যুর পর স্থূলদেহ থেকে এই তেজকায়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এটাও বুঝতে পেরেছেন। স্থূলদেহের উপর এই তেজকায়ার বিরাট একটা প্রভাব আছে তাও তাঁরা অনুমান করতে পেরেছেন। কিন্তু স্থূলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষপর্যন্ত তা কোথায় যায়, কীভাবে থাকে - তা অনুমান করতে পারেনি। - মন্তব্য নিগূঢ়ানন্দের।

আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে আরও অনেক মতামত এখানে হাজির করা সম্ভব। যদি হাজির করি শুধু এই প্রবন্ধটিই নয়, একটা মোটকা একটা বই লিখে ফেলা সম্ভব। যুগ যুগ ধরে আত্মা হাজার মানুষের মত প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্যই সেগুলি স্ববিরোধিতায় বিভ্রান্ত। আসলে সবই অনুমাননির্ভর, প্রত্যক্ষ নয়। প্রত্যক্ষ নয় বলেই ধারণারও শেষ নেই। সৃষ্টির আদি থেকেই যে যার মতো ভেবেছেন এবং প্রকাশ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীর ভণিতায়।

বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে আমিও একজন ব্যক্তিমানুষ। তাই আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে আমারও মত থাকা অনুচিত হবে না। আমি মনে করি - পৃথিবীর সব জায়গাতেই কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু আত্মার বিভিন্ন প্রকার অসংলগ্ন অসামঞ্জস্য ধারণাই প্রমাণ করে দেয় আত্মা বলে আদৌ কিছু নেই। আত্মা যদি থাকে এবং সেটি যদি জন্মহীন, মৃত্যুহীন হয় - তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পূর্বে আত্মারা কোথায় ছিল? আত্মার ক্ষয় নেই, মৃত্যুও নেই - তাহলে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণই-বা কী? আত্মা বিশেষজ্ঞদের কাছে যথার্থ উত্তর মেলে না। সুতরাং আমি বলবই আত্মা নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আত্মা আমার কাছে হাঁসজারু, বকচ্ছপ, ঘোড়ার ডিম, পক্ষীরাজের সমান মনে হয় - তার বেশি কিছু নয়। আত্মা একটি কাল্পনিক বস্তু, ম্যানমেইড - যার কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একমাত্র অস্তিত্ব অন্ধবিশ্বাসী, যুক্তিহীন প্রশ্নহীন, গতানুগতিকার আনুগত্যতায় বিবশ, ধর্মভীরু মানুষের তমসাচ্ছন্ন মানসিকতায়।

মোহমুগ্ধতার চশমা খুললেই পাঠ করতে পারবেন, কর্মফলকে কেন্দ্র করেই এসেছে শোষক ও শোষণের নতুন দিক। দাস সম্প্রদায়কে কর্মফলের আফিম খাইয়ে প্রতিবাদহীন করা হল নানা চাতুরতায়। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আত্মার অবিনশ্বরতার ধারণা, যার সঙ্গে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানচিন্তার কোনো সম্পর্ক নেই। পুরুষদেহজাত শুক্রাণু নারীর দেহনিঃসৃত ডিম্বাণুর মিলনেই নতুন প্রাণের সৃষ্টি হয়। সেখানে আত্মার কোনো সম্পর্ক বা ভূমিকা নেই। যদি থাকত, তাহলে যৌনমিলন ছাড়াই নারী এবং পুরুষ যথাক্রমে গর্ভবতী এবং গর্ভবান হত। যৌনতারও প্রয়োজন হত না, যৌনতাড়নাকে কেন্দ্র করে ব্যভিচারিতাও থাকত না।

আত্মা যদি মন, চেতনা, হৃদয় বা মস্তিষ্ক ছাড়া যদি আত্মা হিসাবে অন্য কিছু কল্পনা করা হয়, তবে সেটা স্রেফ ভাঁওতাবাজি। এ রকম আত্মার অস্তিত্ব কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই। জীবজগতের মস্তিষ্ক, হৃদয়, রক্ত, পেশি, হাড়, স্নায়ু - সবকিছুই নশ্বর। মন বা আত্মা বলে দেহের ভিতর কিছু বসবাস করে না, ঘরবদলও করে না। এটা ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ধারণা, যা ভিত্তিহীন। কেউই প্রত্যক্ষ করেননি। তাই কারোরই আত্মাজ্ঞান গ্রহণযোগ্য নয়।

এইসব জ্ঞানী-পণ্ডিতগণ শুধু আত্মাতেই ক্ষান্ত হননি। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম দিয়েছেন জন্মান্তরবাদের, কাছে স্বর্গ-নরক। আমরা খুঁজতে চেষ্টা করব জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ কী তার উত্তর।

আদি মানুষ প্রথম যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চরম বিস্ময়াভূত হয়েছিলেন, সেই ঘটনাটি অবশ্যই "মৃত্যু"। আর সেই প্রাচীনকাল থেকেই মৃত্যুকে ঘিরে হাজারো অনুসঙ্গ, জল্পনা-কল্পনা, নানা ফন্দি-ফিকির, তত্ত্ব-তালাশ। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আত্মা, পরমাত্মা, মোক্ষ, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ভুত-পেতনি-ব্রহ্মদত্যি, কর্মফল, জন্মান্তর, জাতিস্মর এরকম হাজারে বিমূর্ত ধারণা। বাস্তবে যাঁরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁরাই জন্মান্তর বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন। ভারতীয়রা প্রাচীনকাল থেকেই জন্মান্তরে বিশ্বাসী। আর্যধর্মে এই জন্মান্তর সম্পর্কিত বিশ্বাস আর্য-পূর্ব ভারতীয়দের কাছ থেকে এসেছিল বলে পণ্ডিতজনেরা মনে করেন। গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাসও নাকি জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা জীবাত্মায় রাখলেও জন্মান্তরে বিশ্বাস নেই।

যাঁরা পুনর্জন্মবাদ মানেন না তাঁরা একজন্মবাদেই আস্থাবান। তাঁদের বিশ্বাস, ব্যষ্টি-আত্মা সর্বপ্রথম শূন্য থেকেই সৃষ্ট।

হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদ : হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে, জীবের মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় জীবদেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'জন্মান্তর' কথাটির মূল অর্থ হল, জীবাত্মা একদেহ পরিত্যাগ করলে কর্মফল ভোগ করার জন্য অন্য দেহ ধারণ এ জগতেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। বেদ, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ভবদগীতায় বলা হয়েছে, জীবাত্মা স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তিবশতই আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। জীবাত্মার একাধিক জন্মগ্রহণের কারণ হল তার ভোগের আকাঙ্ক্ষা। আর এরূপ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণকেই বলা হয় জন্মান্তরবাদ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য - "বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মনি তব চার্জুন।/ তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।" অর্থাৎ যে অর্জুন তোমার আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। সে কথা তোমার মনে নেই, সবই আমার মনে আছে। এই বক্তব্যর মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের সখা এবং তাঁর রথের সারথি এই সত্য অতিক্রম করে আর একটি পরম সত্য প্রকাশিত হয়েথে — তা হল তিনি সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। তিনি শাশ্বত, অব্যয়, পরমাত্মার প্রতীক। আবার যখন বলা হয় অর্জুনের বহুবার জন্ম হয়েছে, তখন এ থেকে বোঝা যায় অর্জুনের মধ্যেও পরমাত্মার মতো কোনো শাশ্বত বস্তু আছে যা বহুবার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও নষ্ট হয়ে যায়নি। শাস্ত্রের ভাষায় জীবদেহের ওই শাশ্বত বস্তুটি হল জীবাত্মা, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বিশেষ। অংশের মধ্যেও মূলবস্তুর গুণাগুণ বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার মতো জীবাত্মাও অব্যয়, জন্ম-মৃত্যুহীন, শাশ্বত বস্তু। তবে কোনো অনাদি অতীতে পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে জীবাত্মা ওই পরমাত্মার পুনরায় মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা বলা কঠিন। তবে যতদিন পরমাত্মা বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি না ঘটে ততদিন জীবাত্মাকে বারবার নতুন দেহ ধারণ করে মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, মানুষ প্রকৃতির সংসর্গবশত প্রকৃতির, গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, তমো এবং রজ গুণের প্রভাবে সুখ-দুঃখ, মোহাদিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ম ইত্যাদি আমিত্ব প্রকাশ করে কর্মনাশে প্রবৃত্ত হয়। এই সব কর্মফল ভোগের জন্য তাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। আর একাধিকবার জন্মগ্রহণ করাকেই বলা হয় জন্মান্তরবাদ। দেহ ও আত্মার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দেহহীন আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মাহীন দেহ জড়।দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা, আবার আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব। তবে দেহের মধ্যে যে আত্মার অবস্থান এটা উপলব্ধি করা সহজ কাজ নয়। আত্মা যে দেহকে আশ্রয় করে সেটি কিন্তু নশ্বর। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে গড়া দেহ। যিনি জীবদেহ ধারণ করে এসেছেন তারই দেহনাশ নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এ সম্পর্কে

বলা হয়েছে,— "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"-জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। তবে ওই যে দেহে জীবাত্মা ছিল তার কিন্তু বিনাশ নেই। এই জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহে চলে যায়। জীবাত্মার পক্ষে মৃত্যুর অর্থ হল দেহত্যাগ। জীবাত্মা কেমন করে এবং কেনই-বা দেহ ত্যাগ করে, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেহত্যাগ ব্যাপারটি একটি সহজ কাজ, যেমন একই দেহে বাল্য, কৈশোর, যৌবন বার্ধক্য আসে, তেমনই আত্মাও স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে চলে যায়। যেমন একই লোকে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীবাত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। এইভাবে পুরোনো দেহ ত্যাগ করে জীবাত্মা যে নতুন দেহ ধারণ করছে অর্থাৎ দেহের সঙ্গে তার যে সংযোগ বিয়োগ ঘটেছে এটাই জন্মান্তরবাদ। এবার নিশ্চয় প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে আবার কর্মবাদ কেন? জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মবাদ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ আছে। আত্মার অবিনাশত্ব ও জন্মান্তরবাদের মতো কর্মবাদও হিন্দুধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। কর্মবাদের মূল কথা হচ্ছে বিশ্বজগৎ স্রষ্টার বিশাল। এখানে জীব ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার দ্বারা নানারকম কর্ম করে যাচ্ছে। আর প্রত্যেকটা কর্মের আছে আলাদা আলাদা কর্মফল। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা মনে করেন কর্ম করলেই তার ফল উৎপন্ন হবে, আর কর্মকর্তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর এই কর্মফল ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মোক্ষপ্রাপ্তি বা জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারচক্র থেকে মুক্তি হবে না। সুতরাং, নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন করাই যথাযথ কাজ। নিষ্কাম কর্ম করে জীব মুক্তি লাভ করতে পারে। হিন্দুধর্ম যতগুলি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে জন্মান্তরবাদ অন্যতম।

ইসলামে জন্মান্তরবাদ : ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতে, একজন মানুষ আদৌ নির্বাণ লাভ করল কি না - তারই বা প্রমাণ কী! দেখা যাচ্ছে যে জন্মান্তরবাদ একটি পুরোপুরি অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে অমানবিকও বটে। কারণ এই বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো প্রমাণ ছাড়াই একজনের অপরাধের শাস্তি অন্য কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে জন্মান্তরবাদকে অবাধে অপরাধ করার একটি লাইসেন্সও বলা যেতে পারে। অধিকন্তু, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার বছর ধরে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে কিছু সুবিধাবাদী মানুষের জন্মসূত্রে দাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি এই দর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক নিরীহ জীবজন্তু কোনো-না-কোনোভাবে ইভিল মানুষের পাপ বা অপরাধের বোঝা বহন করছে। এই ধরনের বিশ্বাসকে নিরীহ জীবজন্তুদের প্রতি চরম অপমান ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে। কোরান অনুযায়ী এই পৃথিবীতে একবারই মানুষের জন্ম হবে (২:২৮, ২৯:২০, ৪০:১১, ৪৪:৫৬)। একজনের অপরাধের শাস্তি অন্য কারও উপর চাপিয়েও দেওয়া হবে না (১৭:১৫, ১৬:১৬৪)। ফলে জন্মান্তরবাদের নামে অজ্ঞ ও সাধারণ মানুষকে ঠকানোর কোনো পথই খোলা নেই। তবে অনেকে মনে করেন, কোরানে পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থান আছে, এর স্বপক্ষে

কোরানে মহান আল্লাহ্ একুশটি আয়াত নাজিল করেছেন। আসলে পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থান বা জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ বা কর্মফলবাদ একই ঘটনা।

বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ : বুদ্ধ পরকাল সম্বন্ধেও অনেক কিছুই বলে গেছেন। পরকাল নির্ভর করে মানুষের ইহজন্মের কর্মের উপর। মৃত্যুর পর মানুষ একত্রিশ লোকভূমিতে গমন করে। এই একত্রিশ লোকভূমি হচ্ছে চারপ্রকার অপায় : তীর্যক, প্রেতলোক, অসুর, নরক। সাত প্রকার স্বর্গ : মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, তাবতিংশ স্বর্গ, যাম, স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নির্মাণরতি স্বর্গ, পরনির্মিত বসবতি স্বর্গ। ষোলো প্রকার রূপব্রহ্মভূমি। চার প্রকার অরূপব্রহ্মভূমি — এই একত্রিশ প্রকার লোকভূমির উপরে সর্বশেষ স্তর হচ্ছে নির্বাণ (পরম মুক্তি)। যেমন : ইহজন্মে মানুষ যদি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, গুরুজনের রক্তপাত ঘটায় তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ চার উপায়ে (তীর্যক, প্রেতলোক, অসুর, নরক) জন্মগ্রহণ করে, আর ইহজন্মে মানুষ যদি ভালো কাজ করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ বাকি আঠাশ লোকভূমিতে গমন করে। বৌদ্ধধর্মে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার কোনো ধারণা নেই। বলা হয়ে থাকে বুদ্ধও নাকি স্রষ্টার প্রশ্নে নীরব ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধর্মগ্রন্থকে স্রষ্টার বাণী হিসাবে বিশ্বাস করা হয় না। বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদ তথা কর্মের উপর ভিত্তি করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিশ্বাস করে। তাদের এও বিশ্বাস যে, গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছেন।

"অলৌকিক নয়, লৌকিক" সিরিজের চতুর্থ খণ্ডে প্রবীর ঘোষ বলছেন - "প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ছান্দোগ্যতে আমরা প্রথম পেলাম পুনর্জন্ম কল্পনার কথা। সে কথা এল কল্পনার হাত ধরে, অজ্ঞতার পিঠে সওয়ার হয়ে সেই কল্পনাকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে প্রবলভাবে প্রথম কাজে লাগাল ভারতের ক্ষত্রিয় ও পুরোহিত সম্প্রদায়। পুনর্জন্মের গর্ভে জন্ম নিল 'কর্মফল'-এর কল্পনা। কর্মফল তত্ত্ব হতদরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের শোনাল - হে বৈশ্য, হে শূদ্র, এই যে প্রতিটি বঞ্চনা, এর কারণ হিসাবে তুমি যদি কোনো ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বা উচ্চকুলের মানুষকে দায়ী করো, তবে তুমি ভুল করবে। এইসব উচ্চকুলের মানুষরা তো তোমার বঞ্চনার উপলক্ষ্য মাত্র। তোমার বঞ্চনার মূল কারণ - পূর্বজন্মের কর্মফল। ভারতে দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাসের ফলস্বরূপ এ দেশের বঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের বিদ্রোহ করেনি, বিপ্লবে শামিল হয়নি"।

মানুষদের জন্মান্তর হয় কী হয় না সে জন্মান্তরবাদীরাই বলতে পারবেন। কিন্তু মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে যে আরও কোটি কোটি প্রজাতির কোটি কোটি মানবেতর প্রাণীদের বসবাস আছে, তাদেরও মৃত্যু হয় - তাদেরও পুনর্জন্ম হয় কি না সে কথা কোনো ধর্মের কোনো ধর্মবেত্তাই বলেননি। সে না বলুক, মানুষের কিছু এসে গেলেও মানবেতর প্রাণীদের কিছু এসে যায় না।

জন্মান্তর হোক বা না-হোক, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? - এই প্রশ্নটাই তামাম মানুষকে অস্থির করে তোলে। তবে মৃত্যুর পর মানুষের যাওয়ার জায়গা দুটি — স্বর্গ ও নরক। কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কারা যাবে স্বর্গে? কারাই-বা নরকে যায়?

"কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর? মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর!" কবির প্রশ্নে কবিই উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন তো আমাদের সবারও। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত তাত্ত্বিক, পদার্থ বিজ্ঞানী এবং জ্যোর্তিবিদ।

স্টিফেন হকিং সম্প্রতি মৃত্যুর পরে স্বর্গের অস্তিত্ব আছে এমন ধারণা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, অন্ধকার দেখে ভীত হয় এবং মৃত্যুভীতিতে আক্রান্ত মানুষের বানানো কাল্পনিক এক গল্পই হচ্ছে স্বর্গ। স্টিফেন হকিং বলেছেন, স্বর্গ-নরকের ধারণা অলীক কল্পনামাত্র। মানুষের মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। এরপর আর কোনো কিছুই উপলব্ধি করার সামর্থ্য থাকে না মানবসত্তার। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও রচনার দশম খণ্ডে লিখলেন, "মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে যায় এটা কল্পনামাত্র। সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখময় জীবনযাপন করে-এই ধারণা স্বপ্নমাত্র। স্বর্গ ও নরক এসব আদিম ধারণা।" জন্নতের অর্থ : বাগ-বাগিচা, জাহান্নাম অর্থ : অগ্নিকুণ্ড। পার্শি ভাষায় বেহেস্ত-দোজখ — বাংলায় স্বর্গ-নরক বলা হয়। সপ্তস্বর্গ বা সাত বেহেশত হচ্ছে প্রধান ধর্মসমূহে বর্ণিত মৃত্যু-পরবর্তী আবাসস্থল যেখানে শুধু পৃথিবীতে সৎকর্মসম্পাদনকারী এবং বিশ্বাসীগণ স্থান পাবেন। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং ইহুদি ধর্মে সাত স্বর্গের কথা বলা হয়েছে। ইব্রাহিমীয় ধর্মসমূহে বলা হয় এই সাত স্বর্গের ঠিক উপরেই সৃষ্টিকর্তার সিংহাসন অবস্থিত। জন্নত বা বেহেশত হচ্ছে ইসলামের পরিভাষায় স্বর্গ। মুসলমানগণ বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে ইমানদার এবং পরহেজগার ব্যক্তিগণ জান্নাতে অনন্তকাল ধরে বাস করবে। আরবি জন্নত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাগান বা উদ্যান। কোরান শরিফে একাধিকবার সপ্তবর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক সময় সাত বেহেশত বা জন্নতকে সাত আসমান বলা হয়। কোরান বর্ণিত সাত আসমানগুলি হল - (১) ফিরদাউস, (২) দারুস সালাম, (৩) জান্নাতুল মাওয়া, (৪) দারুল খুলদ, (৫) জান্নাতুল আদন, (৬) জান্নাতুল আখিরাহ, (৭) জান্নাতুন নাঈম। ইসলাম মতে মূলত জন্নত-জাহান্নাম বলতে স্থুল-সূক্ষ্ম জগতের দৈহিক-মানসিক শান্তি-অশান্তির অবস্থা বোঝায়। জীবন-মৃত্যু যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তেমনই জন্নত-জাহান্নামও। যে যেখানেই থাকুক শান্তিই স্বর্গ, অশান্তিই নরক। ইব্রাহিমের অগ্নিকুণ্ডই ছিল তার জন্য জন্নত।

হিন্দুধর্মে স্বর্গকে স্বর্গলোক বলা হয় যা সাতটি লোক বা তলের সমন্বয়ে গঠিত। পর্যায়ক্রমে এই লোকগুলো হচ্ছে - ভূলোক (পৃথ্বী লোক বা পৃথিবী), ভূভার লোক, স্বর্গ লোক, মাহার লোক, জন লোক, তপো লোক এবং সব থেকে উপরে সত্যলোক

(ব্রহ্মলোক)। হিন্দু পুরাণ এবং অথর্ববেদে ১৪টি লোকের কথা বলা হয়েছে। এর সাতটি স্বর্গলোক, বাকি সাতটি নরক বা পাতাল। সপ্তবর্গের ঠিক নিচেই সপ্ত নরক অবস্থিত। স্বর্গের রাজধানী হল অমরাবতী এবং ঐরাবত স্বর্গের প্রবেশদ্বার পাহারা দিচ্ছে। বৈদিক বা হিন্দু ধর্ম অনুসারে স্বর্গ শুধু দেবদেবীদের বাসস্থান। তাই স্বর্গে কোনো রোগ, শোক, তাপ, মৃত্যু, কিছুই নেই। স্বর্গে চিরবসন্ত বিরাজমান থাকবে। আর স্বর্গবাসীদের মনের আনন্দের জন্যে সেখানে থাকবে - নন্দনকানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী কামধেনু, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়, আছে স্বর্গবাসীদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্যে অপ্সরা, মেনকা, রম্ভা, কিন্নরী, গন্ধর্ব ইত্যাদি সুন্দরী নারীগণ। হিন্দু-পৌরাণিক শাস্ত্রানুসারে স্বর্গের অবস্থান এক দুর্গম ও দূরারোহী এবং অতি উচ্চে অবস্থিত এক স্থানে। আকাশ নয়, যার অবস্থান সুমেরু পর্বতের উপরে। ভৌগোলিকদের মতে, স্থানটি ছিল বর্তমান হিমালয় পর্বতের অংশ বিশেষ। বর্তমানে হিমালয়ে যেভাবে সহজে আরোহণ করা যায়, তখনকার দিনে অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন না-হলে কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারত না। এইজন্যই বোধহয় "মহাভারত"-এর স্বর্গারোহণপর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ছাড়া দ্রৌপদী সহ বাকি চার পাণ্ডবের পতন ও মৃত্যু হয়। দেবদেবীরা নাকি ওখানেই থাকতেন, উহাই নাকি স্বর্গলোক। ওই উঁচু জায়গা থেকে নীচু সমতল ভূমিকে বলা হত মর্ত্যলোক, মর্ত্যলোকে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীরা থাকে। কারণ দেবদেবী ছাড়া কাউকে স্বর্গে যেতে দেয়া হত না। সুর-অসুরের দ্বন্দ্বের কাহিনির এখান থেকেই শুরু। স্বর্গের অধিকারের প্রশ্নে বারবার দেবতা-অসুরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে। শাসক-দেবতাদের বিরুদ্ধে শোষিত-অসুরদের স্বাভাবিক পরাজয়। এই দ্বন্দ্বই আর্য-অনার্যদের দ্বন্দ্ব হিসাবে বিশ্লেষিত হয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনের পথ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওই জায়গাটি কৈলাস হিসাবে পরিচিত ছিল, যা বর্তমানে হিমালয় পর্বতের চিন-ভারত অংশে অবস্থিত। বাল্মীকি বিরচিত "রামায়ণম্"-এ লঙ্কেশ্বর রাবণ মর্ত্য থেকে স্বর্গে আরোহণ করে দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর সাধারণ মানুষ পুণ্যের তারতম্য অনুসারে ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতম স্বর্গের অধিকারী হতে পারে, আবার পাপ অনুসারে নিম্ন থাকে নিম্নতর নরকে নিপতিত হতে হয়। অবশ্য এর আগে একটি বৈতরণী নদী (পৌরাণিক এই নদী ওড়িশা রাজ্যে বহমান) পার হতে হয় তাকে। নিরাপদে ওই বৈতরণী অতিক্রমকারীরা স্বর্গ লাভ করে এবং অতিক্রম করতে পতিত হয় পচা রক্তমাংসে পরিপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ও তপ্ত নদীর জলে। হ্যাঁ, পাপীদের সেখানেই থাকতে হবে অনন্তকাল। হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষি মুনিগণ প্রথমেই প্রচার করে সবাইকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন পাপপূণ্য তুলাদণ্ডে ওজন করে পরিমাপের বিধানসহ পাপপূণ্যের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন ভগবান।

প্রাচীনকালে মানুষ ভাবত নরক হল পৃথিবীর পেটের ভিতর, মানে মাঝখানে। গ্রিক কাব্যকথায় বার বার উঠে আসে নরকদেবতা হেইডিসের আবাস পাতালে। খুব

ছোট্টবেলায়, মানে সত্তর/আশির দশকে এক ধরনের ক্যালেন্ডার পাওয়া যেত। বেশ বড়ো মাপের। পাপ করলে যমরাজ কীভাবে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন, তারই গোটা কুড়িক হাতে আঁকা স্ন্যাপ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শাস্তি যারা পাচ্ছেন তারা সকলেই উলঙ্গ। এখন আর ওই ক্যালেন্ডার দেখি না। তাহলে কী এখন আর কেউ পাপ করে নরকে যাচ্ছেন না! প্রসঙ্গ বলে রাখি, পুণ্যবানদের যমরাজ কোথায় রাখেন কী খাওয়ান কী করান কত সুখে রাখেন সে বিষয়ে কোনো ক্যালেন্ডার দেখিনি। যাই হোক, এবার আমরা দেখে নিতে চেষ্টা করব আরও কিছু ধর্মাবলম্বীদের পাপপুণ্যের বিভিন্নতা।

(১) ইরানীয় ধর্মের স্বর্গ-নরক : প্রাচীন ইরানীয় পুরাণ মতে, ধর্মগুরু জরাথুস্টের "জেন্দ আবেস্তা" নামক গ্রন্থটি থেকে জানা যায় ইরানীয় দেবতা অহুর মাজদা। ইরানীয় দেবতা অহুর মাজদা একেবারে নিরাকার ব্রহ্ম ছিলেন না, তাকে ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এক স্বর্গবাসী দেবতা মনে করা হত। এই মত অনুসারে মৃত্যুর পর জীবিতকালের পাপ ও পুণ্যের শাস্তি এবং পুরস্কারের বিধান ছিল। অবশ্য তার আগে প্রথমে মৃতের দেহকে এক দানব অধিকার করে নেবে এবং আত্মাকে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক পর্যায়ে এসে আত্মার মাঝে জ্ঞানের সঞ্চার হবে, তখন আত্মাকে 'চিন্দভাদ' নামক এক ব্রিজ বা সেতু পার হতে হবে। পুণ্যবানরা অনায়াসে সেতু পার হতে পারবে এবং দেবতার সঙ্গে মিলিত হবে। দেবতা অহুর মাজদা ওই পুণ্যবানদের বসার জন্য স্বর্ণসিংহাসনের ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে 'হুরান-ই-বেহেস্ত" নামক সুন্দরী পরিদের সঙ্গে অনন্তকালের যৌনমিলনের ব্যবস্থা করে দেবেন। অপরদিকে জীবিতকালে পাপ কার্য করেছে বলে যে আত্মাগণ সেতু পার হতে সফল হলেন না, তারা নরকে নিক্ষেপ করে যন্ত্রণা ভোগ করবে।

(২) ইহুদি ধর্মের স্বর্গ-নরক : ইহুদিদের ধর্মকে জুডাইজম বলে। জুডাইজম ধর্মমতে মানুষের মৃত্যুর পর বিচারের একটি শেষদিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেইদিনই মৃতদের আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে এবং পুনরুত্থানের পর আত্মাদের জীবিতকালের পাপপুণ্যের বিচার হয়। ইহুদিদের আত্মাকেও সেতু পার হতে হয় এবং পাপপুণ্যের বিচার হয়। সেতু অতিক্রমে অসফল আত্মাগণ নীচের নরক-নদীতে নিক্ষেপিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে। ইহুদিদের মতে মানুষের পাপপুণ্যের পরিমাণ দুটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে এবং তুলাদণ্ডের দু-দিক স্থাপন করে প্রতিজনের পাপপুণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে যেদিকে পাল্লা ভারি হবে, সে অনুসারে ব্যবস্থা হবে। অর্থাৎ, পুণ্যের ভাগ ভারী হলে স্বর্গলাভ এবং পাপের ভাগ ভারী হলে নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে অনন্তকাল।

ইহুদিদের স্বর্গের নাম এদন বা ইডেন। ইডেন বহু মূল্যবান পাথরখচিত। তিনটি দ্বার বিশিষ্ট ও চারটি প্রবাহমান নদী থাকবে ইডেনে। (প্রথম প্রবাহিত নদীর নাম পিশোন, যা সমস্ত হবিলাদেশ বেষ্টন করে প্রবাহিত ছিল। দ্বিতীয় নদীর নাম ছিল গিহোন, যা সমস্ত কুশদেশ বেষ্টন করে প্রবাহিত ছিল। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, এটা অশুরিয়া দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং চতুর্থ নদীর নাম ছিল ফরাৎ। ঐতিহাসিকদের

মতে পিশো, গিহো, হিদ্দেকল ও ফরাৎ - এই চারটি নদীর উৎপত্তি এলাকার মধ্যে ওই সময়ে ইডেন নামে একটা জায়গা ছিল। আন্দাজ করা হয়ে থাকে যে, ইডেন জায়গাটি বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বভাগের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত একটি অঞ্চল। তাওরাতে উল্লিখিত নদী চারটি ওই অঞ্চল থেকেই উৎপন্ন হয়ে পিশোন ও গিহোন কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে এবং হিদ্দেকল ফরাৎ নদীদ্বয় একত্রিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পতিত হয়েছে।) নদীগুলির প্রথমটিতে দুধ থাকবে, দ্বিতীয়টিতে মধু থাকবে, তৃতীয়টিতে সুরা থাকবে এবং চতুর্থটিতে সুগন্ধিযুক্ত নির্যাস প্রবাহিত হতে থাকবে। এ ছাড়া একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানও থাকবে। সেখানে প্রচুর সুমিষ্ট ফল এবং সুগন্ধ-সৌন্দর্যময় ফুলে পরিপূর্ণ থাকবে।

(৩) খ্রিস্টান ধর্মের স্বর্গ-নরক : বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের উল্লেখ আছে, মানুষ আপন পাপকর্ম দ্বারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উপরন্তু মৃত্যুর পর আত্মা দেহ থেকে বিকারপ্রাপ্ত এবং ধুলোয় পরিণত হয়। মৃত্যু ব্যক্তিদের মধ্যে যারা পূণ্যবান তারা দেহত্যাগের পরে তাদের আত্মা স্বর্গে গমন করে। অপরদিকে মৃত্যু ব্যক্তিদের মধ্যে যারা পাপী তাদের আত্মা শেষ বিচারের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়। বিচারের দিন পবিত্র আত্মা জিশুখ্রিস্ট স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসেন এবং বিচারাসনে উপবিষ্ট হবেন। সেদিন মৃতগণ কবর থেকে উত্থিত হবে বিচারের সম্মুখীন হতে। বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত পাপীগণ চিরপ্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অপরদিকে পুণ্যবানরা অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত প্রসাদে পাঠানো হবে। সেখানে পুণ্যবানদের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষগণ, দেবদূতগণ, স্বয়ং প্রভু জিশুখ্রিস্টও তাদের সঙ্গে আনন্দোৎসবে যোগদান করবেন। খ্রিস্টমতে বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর নয়, জিশুই শেষ বিচারের বিচারক।

(৪) প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে স্বর্গ-নরক : প্রাচীন মিশরীয় ফারাও ধর্ম মতে, যুগ বিবর্তনান্তে তিন থেকে দশ হাজার বছর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবে। আর এই বিশ্বাস থেকেই বোধহয় মিশরে মৃতদেহ রক্ষার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাস বা সমাধিগাত্রে মৃত ব্যক্তিদের জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন কথা লিখে রাখার প্রচলন ছিল। মৃতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক মৃতকে পরমেশ্বরের কাছে একটা শপথ বা এফিডেভিট দিয়ে জীবিতকালে তার পাপপূণ্য কাজের হিসাব দিতে হবে। পরে ওই সত্যপাঠেপ সত্যমিথ্যা যাচাই করবেন জ্ঞানের দেবতা 'থৎ' এবং 'হোরাস'। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে মৃতের হৃৎপিণ্ড। বিচারের পর দুইটি দ্বার দিয়ে স্বর্গ অথবা নরককুণ্ডে প্রবেশ করতে হবে। পুণ্যাত্মাগণ "আলু" নামক স্বর্গধামে প্রবেশ করে মনের আনন্দে শস্যক্ষেত্র চাষ করবে এবং পাপাত্মাদের নরককুণ্ডে পাঠিয়ে পিলারের সঙ্গে বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে পোড়ানো অথবা গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে।

(৫) চিনা ধর্মের স্বর্গ-নরক : চিন দেশের প্রাচীন ধর্মমত অনুসারে পাপপুণ্যের বিচারে স্বর্গ ও নরক লাভের বিধান প্রচলিত ছিল। ওই গ্রন্থে ন্যায়-অন্যায় ও পাপপুণ্যের

বিচার, পুরস্কারের ও দণ্ডের বিবরণসহ অনেক বিষয় উল্লেখ ছিল, যা দ্বারা মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ বুঝে চলতে পারে। অবশ্য "সুকিং" নামক গ্রন্থে চিনদেশের সর্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থ বলে পরিচিত, যা কনফুসিয়াস সংকলন করেন বলে কথিত আছে। যেখানে মৃত্যুর পরে স্বর্গ-নরকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট তেমন কিছুর উল্লেখ নেই। তবে কনফুসিয়াস দর্শন অনুসারে দেহাংশ পঞ্চভূতে মিশে যাবে এবং অশরীরী আত্মা স্বর্গ-নরকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট তেমন কিছুর উল্লেখ নেই। তবে কনফুসিয়াস দর্শন অনুসারে দেহাংশ পঞ্চভূতে মিশে যাবে এবং অশরীরী আত্মা সংসারে অদৃশ্য আকারে উপস্থিত থেকে আপন সংসার ও জগতের মঙ্গল সাধন করতে থাকবে। মানে মানুষের শারীরিক মৃত্যু হবে নিশ্চয়, তবে আত্মার মৃত্যু নেই - তাই কনফুসিয়াস প্রলয় শেষে পুনরায় সৃষ্টি বা পরলোক বিষয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করেননি।

(৬) বৌদ্ধধর্মের স্বর্গ-নরক : বৌদ্ধধর্ম মতে এই পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। তাঁরা মনে করেন জগত অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান আছে এবং অনন্তকাল ব্যাপি এভাবেই থাকবে। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে বিশ্বের আকৃতি চিরকালই একরূপ আছে এবং আগামীতেও ওই একইরূপই থাকবে। কর্মানুসারে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীগণ সংসারে ঘুরে বেড়ায় মাত্র। বৌদ্ধধর্মে স্বর্গ-নরক, দেবদূত বা ফেরেস্তা, পয়গম্বর বা নবি এবং শেষ বিচার ও শয়তান সহ অন্যান্য বিষয়াদির উল্লেখ নেই।

স্বর্গের লোভ আর নরকের ভয়ে দুটি বিষয়ই মানুষকে ধর্মের প্রতি অতি অনুরাগী করে তুলেছে। এ ছাড়া মানুষের ধর্মবিশ্বাসী হওয়ার অন্য কোনো কারণ নেই। মানুষ বড়ো স্বার্থপর। আত্মা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে স্বর্গে বা নরকে যাবে কে? তাই আত্মার স্বর্গে বা নরকে পাড়ি দেওয়ার চিন্তা অবান্তর কল্পনামাত্র। তাই স্বর্গ ও নরক ও অবন্তর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই স্বর্গে যাওয়ার জন্য ধর্ম পালন করাও ভূতের ব্যাগার খাটা বৈকি। তাই কল্পিত স্বর্গে পাড়ি দেওয়ার আকাশকুসুম স্বপ্ন না দেখে আমরা যদি আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাকেই আরও সুন্দর করে তুলতে পারি তাহলে সেটাই হবে প্রকৃত সুখের। আসলে স্বর্গ আর নরক বলে আলাদা কোনো জায়গা নেই। আকারেও নেই, নিরাকারেও নেই। অস্তিত্বে নেই, অনস্তিত্বেও নেই। আকাশেও নেই, পাতালেও নেই। তাহলে কি স্বর্গ-নরক ব্যাপারটা পুরোপুরিই ভাঁওয়া? না, একদমই ভাঁওতা নয়। স্বর্গ-নরক আছে এই পৃথিবীর বুকেই। চোখ-কান খোলা রাখলেই আপনি স্বর্গদর্শন এবং নরকদর্শন করতে পারেন। উপভোগ করতে পারেন, স্বর্গসুখ, অথবা হাড়ে-হাড়ে ভোগ করতে পারেন নরকযন্ত্রণা। স্বর্গবাস বা স্বর্গসুখ তাঁরাই ভোগ করেন, যাঁরা সৎকর্ম, সৎ জীবনযাপন, সৎ চিন্তা, যে অন্যের অনিষ্ট করেন না (ভাবেনও না), যে পরস্ত্রী এবং পরশ্রীতে কাতর নয়, যিনি কখনো কোনো অন্যায় কাজ করেন না,, যিনি পরোপকারী ইত্যাদি। অপরদিকে তাঁরাই নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন, যাঁরা অসৎ কর্ম, অসৎ জীবনযাপন, অসৎ চিন্তা, যে অন্যের অনিষ্ট করেন (ভাবেন), যে পরস্ত্রী এবং

পরশ্রীতে কাতর, যিনি অন্যায় কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন ইত্যাদি। এমন কি ধর্ম বা ঈশ্বরের নামেও যাঁরা বিভিন্ন অন্যায় সম্পাদন করেন, তবুও তাঁরা নরকযন্ত্রণা ভোগ করবেন (চন্দ্রস্বামী, আশারাম, আফজল, মাসুদ, সাদ্দাম হোসেইন, লাদেনদের কথা মনে করুন) কথা মনে করুন। প্রথম পক্ষ অমরত্বের ভাগীদার হতে পারেন, দ্বিতীয় পক্ষের অমরত্বে সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না। অমরত্ব সম্ভব? কেন নয়? আলবৎ অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। কীভাবে?

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?" রবিঠাকুরের রচিত এই পংক্তির পর সব প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তবুও আমি সামান্য কিছু না-লিখে থাকতে পারছি না। মানুষ মরণশীল। শুধু মানুষ কেন, সব প্রাণীই মরণশীল। জন্ম হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উদ্ভিদ থেকে প্রাণী-সকলেরই মৃত্যু হয়। এ যেন "জন্মের ঋণশোধ মৃত্যু দিয়ে"। মৃত্যু এক অনিবার্য সত্য। সকলকে যে মরতেই হবে এ-কথা আমরা পূর্বজ্ঞাত। মায়াময় পৃথিবী। চিরতরে বিলীন হতে মন চায় না কারোর। মনে হয় রয়ে যাই অনন্তকাল। তাই চাই অমরত্ব। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে অমরত্বের লেনদেনে ছড়াছড়ি। অসুরগণ দেবতাদের কাছে অমর বর চেয়ে চরমতম কৃচ্ছ্রসাধন করছেন। অপরদিকে দেবতারাও মুড়ি-মুড়কির মতো অমরত্ব দিচ্ছেন। দু-হাত তুলে অসুরদের অমর বর প্রদান করছেন এবং হত্যা করছেন। অসুররা অমর নন, এমন কী সুর বা দেবতারাও অমর নন — হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা, এর মধ্যে কটা দেবতা বেঁচে আছেন যাঁদের স্মরণ করা হয়! তাহলে অমরত্ব কী? সংক্ষেপে অমরত্ব হল মৃত্যুহীন জীবন।

পৃথিবীতে যত লোক আছে তার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত জর্জিয়ার অধিবাসীগণের পরমায়ু পৃথিবীর আর সব রাষ্ট্রের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের গড় আয়ু ৯০ বছর। সে দেশের বেশির ভাগ লোক মারা যায় একশত বছরেরও ঊর্দ্ধে গিয়ে। এমনকি ১৫০ বয়সি বৃদ্ধের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এত দীর্ঘজীবী হয়েও কেউ অমরত্ব লাভ করতে পারেনি। আমরা বস্তুত পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারত-উপনিষদে অমরত্বের বিষয়টা জানতে পারি। এখানে দেবতারা সকলেই অমর এবং অসুররাও অমর, কিন্তু তাঁদের নানা ছিদ্রান্বেষণ করে মৃত্যুদান করেছেন দেবতাগণ।

হিন্দুশাস্ত্র মতে, পুরাকালে রম্ভা অসুর নামে এক অসুর ছিল। তার পুত্র মহিষাসুর ছিলেন অসুরদের রাজা। মহিষাসুর ব্রহ্মার ভক্ত ছিলেন। অমরত্ব বর লাভের আশায় ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করতেন। তপস্যারত অবস্থায় একদিন ব্রহ্মা এসে মহিষাসুরের কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, "মহিষাসুর তুমি কি চাও?" মহিষাসুর উত্তরে বললেন, "আমি অমরত্ব চাই।" ব্রহ্মা বললেন, "না না মহিষাসুর, এই বর তুমি প্রার্থনা করো না; এই বর শুধু দেবতারা লাভ করিতে পারে, কোনো অসুর নয়, অন্য বর প্রার্থনা করো"। এইভাবে অমরত্ব লাভে কয়েক বার ব্যর্থ হয়ে শেষে মহিষাসুর কঠিন

থেকে কঠিনতর তপস্যায় লিপ্ত হলেন। ব্রহ্মা তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, "তোমার কঠিন তপস্যায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, বলো তোমার প্রার্থনা কী?" মহিষাসুর বললেন, "হে দেবকর্তা, আপনি আমাকে এমন বর দিন যাতে আমি ত্রিভুবন জয় করতে পারি"। ব্রহ্মা বললেন, "তথাস্তু, সর্বত্র অপরাজেয় থাকবে; শুধু নারী ছাড়া"। উত্তরে মহিষাসুর বললেন, "হে দেবকর্তা, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি নারীর ভয়ে ভীত নই"।

বরলাভের পর অসুরদের রাজা মহিষাসুর ঘোর অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে দেবতারা হেরে গেলেন। অসুর স্বর্গরাজ্য দখল করে দেবতাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং সর্বত্র অন্যায়-অত্যাচারের রাজ্য কায়েম করলেন। তার অত্যাচারে-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাজ্যহারা দেবতারা একদিন এক সভায় সমবেত হলেন। তারা ব্রহ্মাকে অগ্রদূত করে মহাদেব ও বিষ্ণুর কাছে অসুরের নানাবিধ অত্যাচার-অনাচারের কাহিনি বর্ণনা করলেন। সেই গণ-অভ্যুত্থানের কাহিনি শুনে মহাদেব ও বিষ্ণু ক্রোধে গর্জে উঠলেন। ব্রহ্মাও ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। ক্রোধের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, ক্রোধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে আগুনের মতো তেজ বের হতে লাগল। সকলের তেজরশ্মি একত্রিত হয়ে বিশাল আলোকপুঞ্জে পরিণত হল। এই আলোকপুঞ্জ থেকেই আবির্ভূত হলেন এক নারী দেবীর মুর্তি - দেবী দুর্গা। নির্মাণ হল শিবের তেজে দেবীর মুখ। বিষ্ণুর তেজে তার বাহুসমূহ, যমের তেজে কেশপাশ, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ, ব্রহ্মার তেজে তার ত্রিনেত্রর উৎপন্ন হয়। দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র থেকে একটি করে নতুন অস্ত্র সৃষ্টি করে মহামায়া দুর্গাদেবীর দশ হাতের সাজিয়ে দিলেন। শিব তার কালান্তক ত্রিশূল, বিষ্ণু তার অমোঘচক্র, বরুণ তার ভীমনাদ শঙ্খ, অগ্নি তার অব্যর্থ শক্তি, বায়ু তার ত্রিদিক বিজয়ী ধন এবং বাণপূর্ণ দুইটি অক্ষয় তূণীর, ইন্দ্র তার দুর্নিবার বজ্র, বিশ্বকর্মা তার খরশান কুঠার ও অভেদ্য বর্ম এবং হিমালয় পরিবর্তন করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। একসময় দেবীর এক খড়গের আঘাতে অসুরের মস্তক ধর থেকে আলাদা হয়ে গেল।

সব অসুরই অমর বর পেয়েছিলেন এবং সব অসুরদেরই বরদাতাদের ষড়যন্ত্রে মরতেও হয়েছে। অসুরদের অমরত্বের অধিকার নেই, মানুষ সহ পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণীদেরও সেই অধিকার নেই।

আমরা গ্রিক পুরাণেও অমরত্বের খোঁজ পাই। দেখি, কী সেই কাহিনি - রিক পর্বত অলিম্পিয়াসে দেবরাজ জিউস এবং দেবী হেরার ঘরে জন্ম নেয় হারকিউলিস। ছোটোবেলা থেকেই হারকিউলিস ছিল বেশী শক্তিশালী, তার বাল্যকালের একমাত্র বন্ধু ছিল পাখাওয়ালা ঘোড়া পেগাসাস। সমস্ত দেবতা হারকিউলিসকে খুব পছন্দ করত, শুধু ব্যতিক্রম ছিল জিউসের ভাই হেডস। হেডস জিউসকে ঘৃণা করত। হেডস জিউসের

মতো অলিম্পিয়াসের রাজা হতে চেয়েছিলেন, অলিম্পিয়াসের রাজা হওয়ার জন্য হেডস তিন ভাগ্যদেবীর (ক্লোতো, ল্যাচেসিস, অ্যাট্রোপোস) সাহায্য চায়, সেই তিন ভাগ্যদেবী যারা কিনা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানতেন। কিন্তু ভাগ্যদেবীরা তাকে জানায় ১৮ বছর পরে টাইটান নামক এক দৈত্য দ্বারা জিউসকে হত্যা করা গেলেও হারকিউলিস সেই দৈত্যকে হত্যা করবে। এরপর হেডস বিকল্প ভাবতে লাগলেন। হেডস হারকিউলিসকে হত্যার জন্য এক ধরনের বিষ তৈরি করেন, কিন্তু তিনি হারকিউলিসকে সেই বিষ সম্পূর্ণরূপে পান করাতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে হারকিউলিস তার পালিত পিতা-মাতার (আনফ্রিট্রাইয়ন ও আলকেমিন) কাছে বড়ো হন।

ছোটোবেলা থেকে হারকিউলিস মোটামুটি নিঃসঙ্গ ছিল এবং তার শক্তি ছিল তার অন্যতম সমস্যা - সে যা কিছুই ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করত সেটাই ভেঙে যেত। হারকিউলিস একাকীত্ব এবং অন্যান্য সমস্যা তার পালিত মা-বাবা বুঝতে পারে। তারপর হারকিউলিসকে বোঝানো হয় সে দেবতার ঘরে জন্ম নেওয়া এজন্যই সে অন্যদের থেকে ভিন্ন রকম।

হারকিউলিস তার জন্মের রহস্য উন্মোচনের জন্য সে জিউসের মন্দিরে যায় এবং সেখানে গিয়ে সে অবাক হয় যখন সে দেখতে পায় জিউসের এবং হেরার মূর্তি জীবিত হয়ে গেছে। এবং জিউস এবং হেরা স্বীকার করে যে তারাই তার আসল পিতামাতা। হারকিউলিস তার আসল পিতামাতার কাছে থেকে যেতে চায়, কিন্তু জিউস তাকে বলে "এখানে শুধু দেবতারাই থাকতে পারবে, তুমি যদি কোনোদিন নিজেকে এই পৃথিবীর সত্যিকারের বীরে পরিণত করতে পার, তবেই তুমি এখানে থাকতে পারবে"। হারকিউলিস নিজেকে সত্যিকারের বীরে পরিণত করার জন্য তার বাবার কথা অনুযায়ী বীর তৈরির শিক্ষক ফিলোকটেসের কাছে যায় এবং তার কাছে দীক্ষিত হওয়ার পর জীবনের প্রথম পরীক্ষার জন্য থেবসের দিকে রওনা হয়।

মাঝপথে সে দেখতে পায় অর্ধমানব এবং অর্ধ ঘোড়ার সংমিশ্রণে এক দৈত্য একটি সুন্দরী মেয়েকে আক্রমণ করেছে। হারকিউলিস ওই দৈত্যটা বধ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। মেয়েটির নাম ছিল মেগার। হারকিউলিস মেয়েটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায়। এদিকে হেডস (জিউসের ভাই), হারকিউলিসকে হত্যা করার জন্য একের পর এক দানব পাঠাতে থাকে। হারকিউলিস সবাইকেই পরাজিত করে এবং পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী বীরে পরিণত হয়। কিন্তু তারপরও সমস্যা থেকে যায়, হারকিউলিস অমরত্ব পায় না। পারে না অলিম্পিয়াসে গিয়ে তার পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতে। হারকিউলিস তার পিতাকে জিজ্ঞেস করে, সে এত দৈত্য বধ করার পরেও কেন অমররত্ব পাচ্ছে না। জিউস তাকে বলে তুমি যত সাহসী হও না-কেন, যতদিন তোমার হৃদয়ে কোনো দুর্বলতা থাকবে, ততদিন তুমি অমরত্ব পাবে না। হারকিউলিস খুঁজতে থাকে তার মেগারাকে বন্দি করে। অবশেষে মেগারাকে মুক্ত করার জন্য হারকিউলিস একদিনের জন্য তার শক্তি সমর্পণ করতে রাজি হয়। এইসময় হেডস

সাইক্লোপস নামক এক তেজি দৈত্যকে পাঠায় হারকিউলিসকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু হারকিউলিস ফিলোকটেসের সাহায্যে সাইক্লোপসকে হত্যা করে। সেই সাইক্লোপ্সের যুদ্ধের সময় মেগারা আহত হয়। ফলে হেডসের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী হারকিউলিস তার শক্তি ফিরে পায়। কারণ শর্ত ছিল মেগারাকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিতে হবে।

এদিকে হেডস টাইটন নামক এক দৈত্যকে অলিম্পিয়াসে পাঠায় দেবতা জিউসকে হত্যা করার জন্য। হারকিউলিস আহত মেগারাকে ফিলোকটেসের কাছে রেখে জিউসকে রক্ষা করতে চায়। হারকিউলিস কোনো অস্ত্র ছাড়াই টাইটানকে হত্যা করে তার পিতাকে রক্ষা করে। হেডস যখন দেখল তার কোনো পরিকল্পনা কাজে আসছে না, তখন সে হারকিউলিসকে বলল, "মেগারা মারা গেছে"। এই কথা শুনে হারকিউলিস ভেঙে পড়ে এবং সেই সঙ্গে মেগারার সঙ্গে সহমরণের ইচ্ছা জানায় এবং একই সঙ্গে মেগারার আত্মা যেখানে থাকবে সেখানে যেন তার আত্মা রাখা হয় সেই দাবিও জানায়। অবশেষে ভালোবাসার জন্য এই আত্মাহুতির হচ্ছা হারকিউলিসকে দেবতাদের কাছে সত্যিকারের বীরের মর্যাদা দেয়। কথিত আছে হারকিউলিস এবং মেগারা অমর হয়ে দুজনে একসঙ্গে পৃথিবীতে বসবাস করতে লাগল।

হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে - যখন ব্রহ্মকে প্রত্যেক বিষয় প্রতীতির মধ্যে জানা যায়, তখনই সম্যঙ্গান হয়। এই জ্ঞান থেকেই ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। আত্মার জ্ঞান থেকেই পুরুষ বীর্য লাভ করেন, বিষয়ের জ্ঞান থেকে নয়। বিদ্যা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞান দ্বারা তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যেক বোধ বা প্রতীতির সঙ্গে তার প্রকাশক এবং দ্রষ্টারূপে আত্মার বিদ্যমানতাও উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, বোধগুলি বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হলেও এদের বোধ প্রকাশক এবং দ্রষ্টা আত্মা এক, অখণ্ড, ধ্বংসহীন এবং নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। এক আত্মাই সমস্ত বোধকে ধারণ করে আছে। এভাবে প্রত্যেক বোধ বা প্রতীতির সঙ্গে আত্মার যে উপলব্ধি — এটাই হল যথার্থ জ্ঞান বা সম্যগ্দর্শন। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করেন তাঁর জীবন ব্রহ্মময় হয়ে যায় এবং তিনি বিশ্বময় ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। এ জন্যও একে সম্যগ্দর্শন বলা হয়েছে। এই দর্শন থেকেই অমৃতত্ব লাভ হয় এবং সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শোক, দুঃখ-অজ্ঞান মোহময় পার্থিব জীবনের ঊর্দ্ধে উঠে অমৃতময় আনন্দময় জীবন লাভ করেন।

আত্মার জ্ঞান থেকে বীর্য লাভ হয় বলা হয়েছে। এখানে বীর্যের অর্থ অমৃতত্ব লাভের সামর্থ্য। বিষয়ের জ্ঞান যে বীর্য দেয় তাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না, আমাদের শোকদুঃখের অতীত করতে পারে না, মৃত্যভয় নিবারণ করতে পারে না। একমাত্র আত্মার জ্ঞান থেকেই এই সামর্থ্য লাভ হয়। কারণ তখনই মানুষ বুঝতে পারে — 'আমি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি বিশিষ্ট দেহ নই, আমি আত্মা, আমি জন্মমৃত্যুহীন, আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি দেহাদির মত ধ্বংসশীল জড় পদার্থ নই'। এই জ্ঞান থেকেই বীর্য

লাভ হয় যার দ্বারা শোক—দুঃখ জয় করা যায়, মৃত্যুভয় নিবারিত হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষজে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, "মৈত্রেয়ী, আমি এই স্থান (আশ্রম) হইতে চলিয়া যাইতেছি। এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার ভাগ-ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি"। মৈত্রেয়ী বলেন, "ভগবান, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তাতে অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "না, সম্পদশালী ব্যক্তিদের জীবন যেমন তোমার জীবনও সেইরকম হইবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্বের আশা নাই"। মৈত্রেয়ী বললেন, "যাহা দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা দ্বারা কী করিব? — "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাৎ"। সেই অমরত্বের প্রশ্ন!

ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, মানুষের আয়ু ক্ষণস্থায়ী। অতীতকালে মানুষের আয়ু ছিল অনেক। কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ মানুষের আয়ু কমিয়ে দেন। ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণনায় আছে, প্রথম মানুষ হজরত আদম ৯৩০ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অবশ্য আদমের চেয়েও বেশি বেঁচেছিলেন নুহ। নুহ ৯৫০ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এছাড়া ইয়ারুদ ৯৬২, মুতাশালেহ ৯৬৯, শিশ ৯১২, কিনান ৯১০, আনুশ ৯০৫, মাহলাইল ৮৯৫, লামাক ৭৭৭, ইব্রাহিম ১৭৫, ইসমাইল ১৩৭, ইসহাক ১৮০, ইয়াকুব ১৪৭, ইউসুফ ১১০, লুত ১৩৭, কহাত ১৩৩, ইমরান ১৩৭, জিহোয়াদা ১৩০, ইউসা ১১০, সারা ১২৭ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনোক ৩৬৫ বছর পৃথিবীতে ছিলেন। এরপর তাকে আর দেখা যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি তিনি মারা যাননি? কিতাব মতে, ইনোক মারা যাননি। তাকে আল্লাহ তুলে নিয়েছেন। কিন্তু কেউই দৈহিক অমরত্ব লাভ করেনি। আল্লাহ যে আয়ু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা তিনি বদলে দিতে পারেন। যেমন তিনি হিস্কিয়ের আয়ু ১৫ বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই আধুনিক যুগে মানুষ কত বছর পর্যন্ত বাঁচে? এক এক দেশে এক এক রকম গড় আয়ু আছে। হজরত মোহাম্মদ ৬৫ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তার আগের নবি হজরত ঈসা মাত্র ৩৩ বৎসর বেঁচে ছিলেন।

মরণশীল মানুষ পাবে অমরত্ব, চিরযৌবন — এমনটি ভাবতে কার-না ভালো লাগে? অমরত্ব লাভের চেষ্টা তো আর আজ-কালকের ব্যাপার নয়। হাজার হাজার বছর ধরে সেই চেষ্টা চালাচ্ছে মানুষ। পুরাণেও এমন চেষ্টা নিয়ে আছে হাজার কাহিনি। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎসপুরাণ, বরাহপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে উল্লেখ্য যে, অমৃতের সন্ধানে সমুদ্রমন্থন করা হয়েছিলো। অমৃত সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল অমরত্ব লাভ করা। কথিত আছে যে, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে দেবতারা তঁদের শক্তি হারিয়ে ফেললে, সেইজন্য তাঁরা বিষ্ণু কাছে শক্তি ও অমরত্ব লাভ প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু দেবতাদের উপদেশ দেন যে, সমুদ্রমন্থন করে অমৃত উঠে এলে তা পান করে অমরত্ব লাভ করা

যাবে। সমুদ্রমন্থনের জন্য বিশালাকার মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকি সর্পকে মন্থন রজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রগর্ভে মন্থন-কার্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিশালাকার মন্দার পর্বতের ভারে সমুদ্রের তলদেশ পাতালে প্রবেশ করে এবং মন্থন-কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিষ্ণু কুর্মাবতার রূপে নিজের পিঠে মন্দার পর্বত ধারণ করে মন্থন কার্য সুসম্পন্ন করেন। পুরাণে অমৃত সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করে দেবতাদের দ্বারা হিরন্ময় পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হলে তা হতে অমৃত উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে এই অমৃত সমুদ্র গর্ভে পতিত হয়। পরে ইন্দ্র দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিষ্ণুর কাছে যান। তখন বিষ্ণু নিজে কুর্মরূপ ধারণ করেন এবং মন্দার পর্বতকে নিজের পিঠে ধারণ করে বাসুকিকে মন্থন-রজ্জুতে রূপান্তরিত করে সমুদ্র মন্থন-কার্য শুরু হলে অমৃত উৎপন্ন হয়। সুর-অসুরের সম্মিলিত প্রয়াসে সমুদ্র মন্থন হয়েছিলে। শর্ত অনুসারে অমৃতের অর্ধেক অসুরদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু পূর্ব প্রতিশ্রুতি তথা শর্ত ভঙ্গ করে দেবতারা ছলনার আশ্রয় নেয়। বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে অমৃত বিভিন্নস্থানে গোপন স্থানে সংরক্ষণ করে রাখেন। পরে তা দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করেন। বিষ্ণু যে যে স্থানে অমৃত সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন সেই সেই স্থানেই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বলে জনশ্রুতি।

কাশীদাসী মহাভারতে অন্য এক অমরত্ব অর্থাৎ অমৃতলাভের কাহিনি পাচ্ছি : নারায়ণ বলেন, " এই ক্ষীরসিন্ধুর মধ্যেই আমার অবস্থান। আমার নাম মোহিনী। আমি অযোনিসম্ভূতা। তোমাদের কলহ আমি সহ্য করতে না-পেরে এখানে উপস্থিত হয়েছি। কী কারণে তোমরা কলহ করছ?" মোহিনীরূপী নারায়ণের এই কথা শুনে সবাই বলল, "অমৃতের কারণে সুর এবং অসুরের এই দ্বন্দ্ব। দেবীর আগমনে ভালই হল। এবার তিনিই সুধা ভাগ করে দিন"। মোহিনী বললেন, "সকলে আমার বিধান না-ও মানতে পারে। এর ফলে তারা আমার উপব ক্রুদ্ধ হবেন"। তখন দেবাসুর সবাই সমবেত হয়ে একযোগে বলেন, "যে তারা দেবীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন"।

মোহিনীরূপী হরি তখন অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে একদিকে দেবতাদের ও অপরদিকে অসুরদের দুই সারিতে বসালেন এবং অমৃত বন্টন শুরু করলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দেবতারা বলেন, "যেন মোহিনী এবং দেবতাদের আগে সুধা বিতরণ করেন"। দৈত্যেরা সেই দাবি মেনে নেন। মোহিনী এইভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে বাকি শেষাংশ তিনি নিজে পান করেন। এমন সময়ে সদাজাগ্রত চন্দ্র ও সূর্য মোহিনীকে ডেকে বলেন যে, "দৈত্য রাহু দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত পান করে ফেলেছেন। এই কথা শুনে নারায়ণ যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে তাঁর সুদর্শনচক্রের সাহায্যে রাহুর মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তা সত্ত্বেও অমৃতের প্রভাবে রাহুর মৃত্যু হল না। তার মুণ্ডই হল রাহু ও দেহ হল কেতু। — "চক্রেতে অসুর-মুণ্ড করিল ছেদন।।/তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু। মুখ হৈল রাহু, কলেবর হৈল কেতু"।। দৈত্যরা ক্রোধে জ্বলে উঠল।

দৈত্যরা দেবতাদের মারতে স্বর্গে রওনা দিল। শুরু হল দেবতা ও দৈত্যের যুদ্ধ। অমৃত পান করে দেবতারা শক্তিশালী হয়েছিল, দৈত্যরা তাদের পরাজিত করতে পারল না। তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজেদের স্থানে ফিরে গেল। দেবতারাও স্বর্গে ফিরে গেলেন।

সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ রাহুগ্রাসের ফলেই হয় — একথা হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন। যেহেতু রাহু দেবতার ছদ্মবেশে অমৃত পান করা সূর্য ও চন্দ্র দেখে ফেলে এবং মোহিনীরূপী নারায়ণকে সেকথা জানিয়ে দেয় এবং ফলে নারায়ণের ক্রোধে তাঁর মুণ্ডকর্তন হয়, সেইহেতু নিয়ম করে সূর্য-চন্দ্রকে ভক্ষণ করে। রাহু স্কন্দ-কাটা বলে মুখ দিয়ে ভক্ষণ করলে কাটা গলা দিয়ে সূর্য-চন্দ্র বেরিয়ে আকাশে বিরাজ করে।

অমরত্ব লাভের আরও একটি জনপ্রিয় পুরাণ-কাহিনি শোনাই : কশ্যপের দুই স্ত্রী - বিনতা এবং কদ্রু। বিনতা এবং কদ্রু সহোদরা। গরুড় কশ্যপ ও বিনতার পুত্র এবং কদ্রুর পুত্রেরা হল সর্প। কদ্রু একবার কশ্যপের কাছে বর প্রার্থনা করেন যে, ওর যেন এক হাজার নাগ-সন্তান হয়। বিনতা সেই কথা শুনে কশ্যপের কাছে বর চান যে, ওঁর মাত্র দুটি সন্তান হলেই চলবে। শর্ত একটাই, তারা যেন কদ্রুর সন্তানের থেকে বেশি বলশালী হয়। বিনতার সেই দুই সন্তানের এক হলেন সর্পভুক গরুড়। ঘটনা চক্রে বিনতা কদ্রুর দাসীত্বে পরিণত হয়েছিলেন। কদ্রুর সর্প-সন্তানরা গরুড়কে বলেছিলেন যে, তিনি যদি তাদের জন্য অমৃত নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে বিনতার দাসীত্ব মোচন হবে। গরুড় তাঁর অমিত বাহুবলে ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরাস্ত করে অমৃত নিয়ে যখন ফিরছেন তখন বিষ্ণু গরুড়কে অমৃতলোভী নয় বুঝে বর দিতে চাইলেন। গরুর বর চাইলেন যে, অমৃত পানা না-করেও তিনি অজেয় ও অমর হতে পারেন। বিষ্ণু গরুড়কে বরদান করে তাঁকে নিজের বাহন হিসাবে চাইলেন। গরুড় রাজি হলেন। ফেরার পথে ইন্দ্রের সঙ্গে গরুড়ের আবার যুদ্ধ হল। ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে আঘাত করেও গরুড়ের ক্ষতি করতে পারলেন না। অবশ্য গরুড় ইন্দ্র ও তাঁর বজ্রের সম্মানার্থে একটিমাত্র পালক-পতন ঘটালেন। সেই সুন্দর পালক দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে ওঁর নাম দিলেন সুপর্ণ। গরুড় অজেয় জেনে ইন্দ্র গরুড়ের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে অমৃত ফেরত চাইলেন। গরুড় বললেন যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি অমৃত নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যেখানে তিনি অমৃতভাণ্ডটি রাখবেন, সেখান থেকে ইন্দ্র সেটি হরণ করতে পারেন। ইন্দ্র তাতেই খুশি। খুশি হয়ে গরুড়কে বর দিতে চাইলেন। গরুড় বর চাইলেন, মহাবল সর্পরা যেন গরুড়ের ভক্ষ্য হয়। গরুর অমৃত এনে কুশের উপর রাখতেই সর্পরা বিনতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু সর্পদের অমৃত ভক্ষণের আগেই ইন্দ্র হরণ করে পগারপার। ভাগ্যিস!

মানুষকে সেই বিশ্বাস দিতে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী। তাঁর জানিয়েছেন, মানুষকে চিরযৌবন দিতে তাঁরা শিগগিরই নিয়ে আসছেন এক মহৌষধ। এ ওষুধ মানুষের অকালবার্ধক্যকেই ঠেকাবে। সেই সঙ্গে আয়ুও বাড়িয়ে দেবে ১০

বছরের বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী বলছেন - অমরত্ব বলতে যদি আপনি মনে করেন আপনার শরীরটিকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখা, তাহলে তা হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না, কারণ আপনি নানাভাবে আপনার মৃত্যু প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করলেও একটি দুর্ঘটনায় আপনার মৃত্যু হতেই পারে। যাই হোক, মানুষ সত্যিকারের অমরত্ব লাভ করবে তখনই, যখন মানুষ তার স্মৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারবে। এই যে আপনি আপনাকে অনুভব করছেন এ সবকিছুই আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষিত ডাটার কারণেই। ধরুন, আপনার ব্রেইনে সংরক্ষিত সব স্মৃতি একটি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা গেল, এখন এই স্মৃতি যদি অন্য একটি দেহে প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে ওই দেহকেই আপনি আপনার নিজের দেহ বলে মনে করবেন। জীববিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে একটি কৃত্রিম মানবদেহ তৈরি করা হয়তো আনুমানিক ৫০ বছরের মধ্যে সম্ভব হতে পারে। জীববিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে একটি কৃত্রিম মানবদেহ তৈরি করা হয়তো আনুমানিক ৫০ বছরের মধ্যে সম্ভব হতে পারে। তবে মানুষের ব্রেইনের জটিল বিন্যাস বুঝে তা থেকে ডাটা এক্সট্রাক্ট করে সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে তা আবার জৈব মস্তিস্কে স্থাপন করা প্রযুক্তি অর্জন করতে এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে হয়তো। তবে কাজ চলছে, একদিন হয়ত সমাধানও আসবে। ২০৪৫ সালের মধ্যে হয়তো অমরত্ব লাভ হবে না, তবে মানবজাতি আরও দু-একটি শতাব্দী টিকে থাকলে অমরত্ব লাভ হবে বলে আশা করি।

অমরত্ব লাভের উপায় : তাহলে কী অমরত্ব লাভের কোনো উপায় নেই? আলবাৎ আছে। আমি মনে করি দুটি উপায় আছে। দুটি উপায়ে মানুষের অমরত্ব লাভ সম্ভব। দেখুন পছন্দ হয় কি না —

(১) "কীর্তিযস্য স জীবতি" : সেটা হল সময়ের মূল্য বুঝে যে কাজ করছে, মরেও অমর তারা পৃথিবীতে । যে ব্যক্তি মহৎ কোনো কিছু করে জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করতে পারলেন, তিনিই অমর হলেন। তাজমহল নির্মাণ করে সম্রাট শাহজাহান অমরত্ব লাভ করেছেন। মিশরের ফ্যারাওরা পিরামিড তৈরি করেও অমর হয়ে আছেন। অমর যদি হতে চান তবে একটা কীর্তি স্থাপন করুন। মার্কনি সাহেব রেডিয়ো আবিষ্কার করে অমর হয়েছেন। স্টিভেনসন রেলগাড়ি তৈরি করে অমর হয়ে আছেন। হোমার "ইলিয়াড" ও "অডিসি" কাব্য রচনা করে অমর হয়ে আছেন। কালিদাস, কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস প্রমুখগণ মহাকাব্য রচনা করে অমর হয়ে আছেন। মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে অমর হয়ে আছেন। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে অমর হয়ে আছেন। জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আছে এটা প্রমাণ করে ফ্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে অমর হয়েছেন। রাজকাপুর, রাজেশ খান্না, সুনীল দত্ত, নার্গিস,

সুরাইয়া, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, দেবানন্দ প্রমুখেরা স্মরণীয় অভিনয় করে অমর হয়ে আছেন। মুকেশ, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মোহম্মদ রফি, কিশোরকুমার গান গেয়ে অমর হয়েছেন। পরিতোষ সেন, ভ্যান ঘগ, পাবলো পিকাসো, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি প্রমুখগণ চিত্রকলায় অবদান রেখে অমরত্ব পেয়েছেন। বৈবস্বত মনু, হজরত মোহম্মদ, জরাথুস্ট, কনফুসিয়াস, শংকরাচার্যরাও অমর হয়েছেন। সক্রেটিস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখরাও অমরত্ব লাভ করেছেন। ভবিষ্যতে এমনই আরও হাজার হাজার মানুষ অমরত্ব পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁরাও। মানুষ অমর হতে পারে তার সৃষ্ট মহৎ কাজের মাধ্যমে।

(২) মরণোত্তর দেহদান : পুরাণ ও মহাকাব্যে দেহদানের কাহিনি পাওয়া যায়। অথর্ব মুনির সন্তান ছিল দধীচি। দধীচি মুনি ছিলেন শিবভক্ত। বৃত্রাসুর একবার স্বর্গ আক্রমণ করে এবং সেখান থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দেয়। দেবতারা বৃত্রাসুরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করার সময় জানতে পারেন দধীচি মুনির অস্থিনির্মিত অস্ত্র ছাড়া অন্য অস্ত্রে তাঁকে হত্যা করা যাবে না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির কাছে এসে প্রার্থনা জানান। অকুণ্ঠিতচিত্তে দধীচি পরের উপকারের জন্য নিজের জীবনদানে সম্মত হন। দধীচি বলেন, নশ্বর অস্থিপঞ্জর লোকের উপকারে লাগানো অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যর বিষয় আর কী হতে পারে! এরপর দধীচি যোগবলে দেহত্যাগ করলে তাঁর অস্থি বা হাড় দিয়ে বজ্রাস্ত্র তৈরি করা হয়। সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র, বজ্রাস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হল বৃত্রাসুরকে। এইভাবেই পুরাণে বজ্রাস্ত্র নির্মাণে দেহদানের মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন মহান দধীচি।

মৃতদেহ এখন আর শুধু অ্যানাটমি শিক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হয় না, এর প্রায়োগিক ক্ষেত্র আজ বহুদূর বিস্তৃত। শব-ব্যবচ্ছেদের সহায়তায় মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়, রোগের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ, চিকিৎসা চলাকালীন ঘটে-যাওয়া ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধান এবং জীবিত রোগীর দেহে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দেহকলা সংগ্রহের জন্যও মৃতদেহ প্রয়োজন। তার জন্য অতি দ্রুত ধর্মীয় সংস্কার তথা আত্মা-পরলোক-জন্মান্তরবাদের ভ্রান্ত ধারণা কাটিয়ে উঠতে হবে। না হলে খুব দেরি হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে (ভারত) জনসংখ্যা ১২১ কোটি ছুঁই ছুঁই। বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংগঠনের প্রভাবে ও সরকারি প্রচার মাধ্যমের উৎসাহদান এই বিরাট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশও দেহদানে অঙ্গীকার করলে এবং তা সংগৃহীত হওয়ার কাঠামো তৈরি হলে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কারণে মানুষ মারা যাবে না। মরদেহের অভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম থেকে "শব-ব্যবচ্ছেদ" বিষয়টি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। গত প্রায় ৪০ বছর যাবৎ ছাত্রছাত্রীরা শব-ব্যবচ্ছেদ না-করেই প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক নোট খাতা থেকে টুকে নিজেদের শব-ব্যবচ্ছেদ না-করায়

চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক প্রাথমিক বিষয় না জেনেই তাদের চিকিৎসা-জীবন শুরু করতে হচ্ছে। এ রাজ্যের সবকটি মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বছর প্রায় ৭৫২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। তাদের পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বছরে অন্ততপক্ষে ১৫০টি মৃতদেহের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় বাস্তব জ্ঞানের অভাবে চিকিৎসকদের ভুল অপারেশন করার রহস্য।

এমতাবস্থায় এই সমস্যার সমাধানে একটা পথই খোল আছে। সেটা হল মরণোত্তর দেহদান। মরণোত্তর দেহদান জারি থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী কিডনি, লিভার, অগ্ন্যাশয়, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কর্নিয়া, মজ্জা, চামড়া বা ত্বক ইত্যাদি রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। কে বলতে পারে কবে, কখন, কার দরকার হতে পারে একটি শরীর-যন্ত্র! কোথায় পাবেন? কীভাবে পাবেন? কেবলমাত্র অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অঙ্গের অভাবে আমাদের মৃত্যু হবে?

আসুন, সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে ধর্মের গন্ধ-মাখানো পরিচিতি মুছে ফেলতে এবং বিজ্ঞানের তথা মানুষের উন্নতির জন্য। সর্বোপরি, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশি মানুষ মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হই এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করি। একের মরণোত্তর অঙ্গ ভিনশরীরে অবস্থান করে নতুন প্রাণের মধ্য দিয়ে নশ্বর দেহ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। আমারই যকৃৎ অথবা কিডনি অথবা ফুসফুস অথবা হৃদপিণ্ডের সাহায্যে যখন অন্যের শরীরের রক্তধারা প্রবাহিত হবে তখন এ অমরত্ব কার!

মৃত্যু তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বলে আত্মহত্যা! মৃত্যু, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু নয়; এমন মৃত্যু দু-রকম হয়-(১) আত্মহত্যা এবং (২) ইচ্ছামৃত্যু। আত্মহত্যা এবং ইচ্ছামৃত্যু এক ব্যাপার নয়। সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আলোচনার মধ্য দিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করব।

আত্মহত্যা : প্রথমেই আসি আত্মহত্যা প্রসঙ্গে। আত্মহত্যা বা আত্মহনন (suicide) হচ্ছে একজন নর কিংবা নারী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। লাতিন ভাষায় "সুই সেইডেয়ার" থেকেই এসেছে "suicide" (যা বাংলা তর্জমায় "আত্মহত্যা") শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা। যখন কেউ নিজেকে নিজে হত্যা করেন, তখন এ প্রক্রিয়াকে আত্মহত্যা করেছে বলা হয়। ডাক্তার বা চিকিৎসকগণ আত্মহত্যার চেষ্টা করাকে মানসিক অবসাদজনিত গুরুতর উপসর্গ হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বের অনেক দেশেই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে এক ধরনের অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক ধর্মেই আত্মহত্যাকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যিনি নিজেই নিজের জীবন বা প্রাণ বিনাশ করেন, তিনিই আত্মঘাতক বা আত্মঘাতী বা আত্মঘাতিকা বা আত্মঘাতিনীরূপে সমাজে পরিচিত হন।

প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে আত্মহত্যা ত্রয়োদশতম প্রধান কারণ। কিশোর-কিশোরী আর যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নীচে, তাদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা। নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি, প্রায় তিন থেকে চার গুণ।

হিন্দুধর্ম মতে আত্মহত্যা : হিন্দুধর্ম মতে আত্মহত্যা মহাপাপ। হিন্দুধর্ম আত্মহত্যাকে গর্হিত বলে আখ্যা দিয়েছে। মৃত্যুর পরে আত্মহত্যাকারীর অবস্থান কোথায় হয়? ঈশ উপনিষদে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সাবধান করে বলা হয়েছে যে আত্মহত্যাকারী মৃত্যুর পর আনন্দহীন লোকে গমন করে। "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবতাঃ।/তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।" (ঈশ উপনিষদ, ৩) অর্থাৎ, অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে আবৃত একটি লোক আছে। তার নাম আনন্দলোক। যারা আত্মহত্যা করে তারা মৃত্যুর পর সেই লোকে যায়।

তবে Section 306 in The Indian Penal Code বলছে, Abetment of suicide.—If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extent to ten years, and shall also be liable to fine."

Section ৩০৯ ধারায় বলা হয়েছে, "Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offence, shall be punished with simple imprisonment for term which may extend to one year 1 [or with fine, or with both]".

তবে এবার আর আত্মহত্যা করা চেষ্টা অপরাধ নয়। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় পিনাল কোডের ৩০৯ ধারা অনুযায়ী আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ হিসাবে গণ্য হত। বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারাটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আত্মহত্যার চেষ্টা করে ধরা পড়লে এক বছর পর্যন্ত কারাবাস ও জরিমানা হত। নিজেকে মেরে ফেলতে সফল না-হলে জেলের চার দেয়ালে ভিতর সময় কাটাতে হত। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু লোকসভায় জানিয়েছেন, আইন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৩০৯ ধারাটিকে ভারতীয় পিনাল কোড থেকে বাদ দিতে চলেছে। আইন কমিশন তাদের ২১০তম রিপোর্টে জানিয়েছিল এই ধারা অমানবিক। তাই সংবিধানিক হোক বা অসংবিধানিক আইপিসি-র ৩০৯ ধারাকে বাতিল করা উচিত। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মানসিক অবসাদের ফলে যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এই আইন বাতিল হলে সেই ব্যক্তিদের কষ্ট হয়তো কিছুটা কমবে। আইন কমিশনের মতে, আত্মহত্যার চেষ্টা আসলে অসুস্থ মানসিক অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। শাস্তির বদলে প্রয়োজন চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত সহানুভূতি। বহুদিন ধরেই এই আইন নিয়ে সমালোচনা চলছিল। সমালোচকরা দাবি

করেছিলেন এই আইন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অযৌক্তিক। একজন মানুষ সাধারণত সাংঘাতিক কষ্ট থেকে নিজের জীবন শেষ করতে উদ্যোগী হন। তার উপর আইনি শাস্তি পেলে সেই ব্যক্তির কষ্ট, উদবেগ কয়েকগুণ বাড়ে বই কমে না।

অবশ্য অনেকের মতে, একজন ব্যক্তির জীবন তাঁর কাছে যতখানি মূল্যবান ঠিক ততখানিই মূল্যবান তার দেশের কাছেও। কেউ যদি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে দেশ, প্রশাসন তাঁর প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।

ইসলাম মতে আত্মহত্যা : ইসলাম মতে, আত্মহত্যা মহাপাপ। এ কাজ থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেছেন এবং এর পরিণামের কথা ভাবার জন্য কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বর্ণনা দিয়ে মহাপবিত্র আল কোরানে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ রাববুল আলামিন বলেন, "আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। এবং যে কেউ জুলুম করে, অন্যায়ভাবে উহা (আত্মহত্যা) করবে, অবশ্য আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ করব, আল্লাহর পক্ষে উহা সহজসাধ্য।" (সুরা-নিসা-২৯-৩০) আরও কিছু সতর্কবাণী - (ক) সাহাবা আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত রাসুল বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। (খ) যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে সেও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে। (গ) যে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে তার কাছে জাহান্নামে সে ধারালো অস্ত্র থাকবে যার দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে। (ঘ) রাসুল বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে দোজখে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শা ইত্যাদির আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে সেও দোজখেও সেইভাবে নিজেকে শাস্তি দেবে। (ঙ) হজরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের পূর্বেকার এক লোক আহত হয়ে সে ব্যথা সহ্য করতে পারেনি। তাই সে একখানা চাক দিয়ে নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলে। এরপর রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে বড়ো তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তাই আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

খ্রিস্টধর্ম মতে আত্মহত্যা : পবিত্র বাইবেলে ছয়জন লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আত্মহত্যা করেছিল, তারা হলেন — অবিমেলক (বিচারকর্তৃগণ ৯:৫৪), শৌল (১ স্যামুয়েল ৩১:৪), শৌলের অস্ত্রবহনকারী (১) স্যামুয়েল ৩১:৪-৬), অহিথোফল (২ স্যামুয়েল ১৭:২৩), সিম্রি (১ রাজাবলি ১৬:১৮) এবং জিহুদা (মথি ২৭:৫)। এদের পাঁচজনই ছিল দুষ্ট, পাপী লোক (কিন্তু শৌলের অস্ত্রবাহকের চরিত্র সম্বন্ধে তেমন করে বিচার করা যায় না)। আবার কেউ কেউ শিমশোনের ঘটনাও আত্মহত্যা বলে থাকে

(বিচারকর্তৃগণ ১৬:২৬-৩১)। কিন্তু আসলে শিমশোনের উদ্দেশ্য ছিল পলেস্টীয়দের মেরে ফেলা, নিজেকে মেরে ফেলা নয়। বাইবেলে আত্মহত্যাকে খুন সমতুল্য বলা হয়, যার মানে নিজেকে খুন করা। একমাত্র ঈশ্বর ঠিক করে দেবেন কে কখন কীভাবে মারা যাবে। বাইবেল অনুসারে, একজন লোক স্বর্গে যেতে পারবে কি না তা তার আত্মহত্যা করার উপরে নির্ভর করে না। যদি উদ্ধারপ্রাপ্ত নয় এমন একজন আত্মহত্যা করে, তবে সে নরকের পথে 'দ্রুত' এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করল না। যাই হোক, যে আত্মহত্যা করেছে সে খ্রিস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ বা উদ্ধার অস্বীকার করার ফলে চূড়ান্তভাবে নরকে যাবে, আত্মহত্যা করার জন্য নয়। তাহলে, একজন খ্রিস্টীয়ান আত্মহত্যা করলে বাইবেল তার সম্বন্ধে কি বলে? বাইবেল বলে, মুহূর্তে আমরা সত্যিকারভাবে খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি, আমরা অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা পেয়েছি (জোহন ৩:১৬)। বাইবেল অনুসারে, সকল সন্দেহের উর্ধে একজন খ্রিস্টীয়ান জানে যে, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছে (১ জোহন ৫:১৩)। ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে একজন খ্রিস্টীয়ানকে কোনো কিছুই আলাদা করতে পারে না (রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)। যদি কোনো 'সৃষ্ট বস্তু' একজন খ্রিস্টীয়ানকে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে আলাদা না করতে পারে, তাহলে আত্মহত্যার মতো 'সৃষ্ট বস্তু' ও একজন খ্রিস্টীয়ানকে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে আলাদা করতে পারে না। তবে আত্মহত্যা অবশ্যই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক পাপ। বাইবেল অনুসারে আত্মহত্যা মানে খুন, তাই তা সবসময়ই ভুল। কারণ ঈশ্বরের জন্য খ্রিস্টীয়ানদের বেঁচে থাকতেই ডাকা হয়েছে এবং কখন তারা মারা যাবে তা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের, শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই সিদ্ধান্ত।

সহায়তা : আমাদের নিজেদের জীবন শেষ করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রতিবছর এক মিলিয়ন মানুষ এই পথ বেছে নেয়। এমনকি যেসব সমাজে আত্মহত্যা বেআইনি বা নিষিদ্ধ সেখানেও মানুষ আত্মহত্যা করে। যাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয় তাদের মনে হয় আর কোনো পথ নেই। সেই মুহূর্তে মৃত্যুই তাদের জগতের শ্রেষ্ঠ উপায় হয়ে ওঠে এবং এদের আত্মহননের এই সুতীব্র ইচ্ছাশক্তিকে কখনোই অগ্রাহ্য করা উচিত না-এই অনুভূতি সত্যিকার, শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক। জাদুবলে এটা সরিয়ে তোলা যায় না। তবে একথাও সত্যি যে - () প্রায়ই সাময়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান আত্মহত্যা হয়। () আমরা যখন বিষণ্ণ বোধ করি, তখন বর্তমান মুহূর্তের খুব সংকীর্ণ প্রেক্ষাপটে আমরা জীবনটাকে দেখি। এক সপ্তাহ বা এক মাস পর হয়তো সবকিছু সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাবে। () যারা একসময় আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগ আজও বেঁচে আছে বলে খুশি। তারা বলে তারা জীবন শেষ করে দিতে চায়নি — শুধু যন্ত্রণাটা দূর করতে চেয়েছিল।

সবচেয়ে জরুরি কাজ, কারোর সঙ্গে কথা বলা। যাদের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয় তাদের একা সব সামলানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদের এখনই সাহায্য চাওয়া

উচিত। () বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে কথা বলুন। শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য বা বন্ধু কিংবা সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। () একজন বিফ্রেন্ডারের সঙ্গে কথা বলুন। কয়েকজন পরিবার বা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। কয়েকজনের অচেনা লোকের সঙ্গ কথা বলা সহজ মনে হয়। সারা পৃথিবীতে বিফ্রেন্ডারদের কেন্দ্র আছে, এদের স্বেচ্ছাসেবীদের কথা শোনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফোনে কথা বলা কষ্টকর মনে হলে ইমেল পাঠানো যায়। () ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। যদি কেউ দীর্ঘসময় যাবৎ বিষণ্ণবোধ করে বা আত্মহত্যার ইচ্ছা থাকে সে হয়তো সাংঘাতিক বিষণ্ণতাবোধে ভুগছে। এটা এক চিকিৎসাগত পরিস্থিতি, রাসায়নিক ভারসাম্য হারানোর ফলে এমন হয় এবং ওষুধের প্রেসক্রিপশন এবং থেরাপির সুপারিশ করে ডাক্তার এর চিকিৎসা করতে পারেন।

জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ায়, সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তবে ওই সময়ে কী ঘটছে তাও গুরুত্বপূর্ণ। কারোর আত্মহননের ইচ্ছা হলে তক্ষুনি ওই অনুভূতির ব্যাপারে কথা বলা উচিত। সহায়তার জন্য একটি ওয়েব সাইটের লিংক দিলাম : http://www.befrienders.org/need-to-talk

স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইচ্ছামৃত্যু :এবার আসব স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইচ্ছামৃত্যু প্রসঙ্গে। নন্দিনীকে চুরি করার শাস্তি ভোগ করতে হল প্রভাসকে। শাস্তি হল মর্ত্যে মানে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে মরণশীল মানুষ হয়ে। যখন দেবব্রত নামে জন্ম হল, তখন মনে হয় পূর্বের স্মৃতি সান্ত্বনার কাজে আসেনি। ভীষণ প্রতিজ্ঞায় বর লাভ হল, বরটি "ইচ্ছামৃত্যু"। নচেৎ রাজ্যহীন, স্ত্রী-সন্তানবিহীন হয়ে এই ভীষণ পৃথিবীতে বাস করার মতো প্রতিজ্ঞা হয়ত কুরুক্ষেত্র ধর্মনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াত। চিরকৌমার্য ব্রত নিয়ে "ভীষ্ম" অপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসাবে আজও তার মৃত্যুতিথিতে হিন্দুরা তাঁকে পিতার প্রাপ্য জলদান করে থাকে। তার সৎ ভাই বিচিত্রবীর্যের বিয়ের জন্য কাশিরাজের তিন কন্যাকে হরণ করেন তিনি। ভাইয়ের অকালমৃত্যুতে তার নির্দেশে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর জন্ম হয়। ভীষ্ম গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে তাদের বিয়ে দেন। রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের পরামর্শ ভীষ্মই দিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষপাতী হয়েও চিরদিন তিনি দুর্যোধনকেই আশ্রয় করেছিলেন এবং দূতসভায় দ্রৌপদীর চুল আকর্ষণ করাসহ দুর্যোধনের যাবতীয় অধর্মাচরণের প্রতিবাদ তিনি আদৌ করেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতিরূপে প্রতিদিন দশ হাজার পাণ্ডব সৈন্য বধ করে প্রথম দশ দিন যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর পাণ্ডবদের সমূহ বিপদ আন্দাজ করে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে নপুংসক শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন তাকে রথ থেকে ফেলে দেন। ইচ্ছামৃত্যু বরপ্রভাবে তিনি শরশয্যায় শয়ন করেও আটান্ন রাত জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মাঘ মাসের অষ্টম তিথিতে তার মৃত্যু ঘটে।

আবার গ্রিক পুরাণে দেখি সিসিফাস। দেবতাদের গোপন সত্য চুরি করায় সেও

অভিশপ্ত। তার জন্যও পাতালপুরীর শাস্তি। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল মৃত্যুর। সিসিফাস মৃত্যুকে বন্দি করেছিল, আর ভীষ্মের কাছে ছিল মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক, তবু দুজনের কাছেই জীবনজগত বিমূর্ততা বা অ্যাবসার্ডের নামান্তর। সিসিফাসের পাথর গড়িয়ে যায়, আর ভীষ্মকে সইতে হয় ভোগহীন জীবনজ্বালা, শিখণ্ডী স্ত্রীহস্তের প্রহার এবং ধনঞ্জয়ের তীব্র বাণ। স্ত্রীর ভালোবাসার পরীক্ষা নিতে গিয়ে সিসিফাস বিপথে, নন্দিনীর জন্য প্রভাস।

ইউথ্যানাশিয়া বা ইচ্ছামৃত্যু : পুরাণ-মহাভারতে যতই ইচ্ছামৃত্যুর গপ্পো থাক-না কেন, বাস্তবে "ইচ্ছামৃত্যু" মামার হাতের মোয়া নয়। তাহলে ইউথ্যানাশিয়া (euthanasia) ব্যাপারটা ঠিক কী? এর মানে কি মানবাধিকারের স্বীকৃতি? ইউথ্যানাশিয়া কি স্বেচ্ছাচারের জন্ম হতে পারে? "ইউথ্যানাশিয়া" শব্দটি গ্রিক। 'ইউ' অর্থ ভালো, এবং 'থ্যানাটোস' অর্থ হল মৃত্যু। শারীরিক ব্যথা-যন্ত্রণার উপশম যখন আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তখন সেই যন্ত্রণার মুক্তি ঘটাতে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণই হল ইউথ্যানাশিয়া। এই ইউথ্যানাশিয়া নিয়ে চলছে যুক্তি-পালটা যুক্তি গোটা বিশ্ব জুড়ে, দীর্ঘ দিন। সক্রেটিস স্বয়ং হেমলকের মাধ্যমে ইউথ্যানাশিয়ার প্রচলন করেন এথেন্সে। আবার সক্রেটিস, প্লেটো বা সেনেকার মতো গ্রিক দার্শনিকরা জীবনাবসান ঘটাতে ইউথ্যানাশিয়ার পক্ষপাতী হলেও হিপোক্রেটিস কিন্তু এর ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ইউথ্যানাশিয়ার পক্ষে যুক্তি আছে তেমনই বিপক্ষেও যুক্তি কম নয়। আমরা সকলেই চাই সে মৃত্যু যেন যন্ত্রণাদীর্ণ না হয়। আমরা কেউই তিলে তিলে মরতে চাই না, একদিন টুপ করে মরে যেতে চাই। যে মানুষ নিরাময়হীন রোগে জর্জর, যে রোগভোগে বোধশক্তিহীন, কিংবা যার অস্তিত্ব শুধু জড় বস্তুর মতো, তাতে মানুষের শরীর আর মন - দুইয়েরই বড়ো কষ্ট হয়, বড়ো অমর্যাদাকর হয়। আসলে জীবন যখন কারও কাজে লাগে না, এমন কী নিজের কাজেও লাগে না; উলটে নিজেকে প্রতিদিনের জীবনে পরমুখাপেক্ষী হয়ে অসহায় যাপন করতে হয়, তখন রোগীর ইচ্ছায়, তাকে সসম্মানে পৃথিবী থেকে বিদায় জানানোর ব্যবস্থাই হল ইউথ্যানাশিয়া। এতে যেমন যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষটিকে সসম্মানে বিদায় জানানো গেল - তেমনই তাঁর আত্মীয়-পরিজন-পরিবারও ওই নিদারুণ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করা থেকে বেঁচে গেলেন।

অনেকসময়ই মানুষটি হয়তো এমন শারীরিক অবস্থায় চলে গেছেন যেখান থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব নয়। বোধহীন শরীর জীবিত আছে শুধু যন্ত্রের মাধ্যমে। পরিবার প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। তখনই অনুভূত হয় তাঁর জীবনের অবসান ঘটিয়ে পরিবারটিকে বাঁচানো? এইরকম 'লস্ট কজ'-এর জন্যে একটা জীবন বাঁচাতে গিয়ে তো পরিবারের বাকি জীবিত সদস্যদের শান্তি, সুস্থিতি, ধৈর্য, আর্থিক নিরাপত্তা সব বিঘ্নিত হতে পারে! কিন্তু সেই অসুস্থ, বোধহীন মানুষটির জীবনাবসানের অনুমতি কে দেবেন? পরিবারের নিকটতম আত্মীয়? নাকি ডাক্তার? নাকি আইনজ্ঞ? নাকি তাঁর উত্তরসূরী? এটা আর-এক বিতর্কিত বিষয়। অর্থই অনর্থের মূল। তাই অর্থ

লোভে বা সম্পত্তির লোভে অসুস্থ মানুষটির উত্তরসূরীরা ইউথ্যানাশিয়ার সিদ্ধান্ত সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। আসলে স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইউথ্যানাশিয়া নিয়ে এসব বিতর্ক আজকের নয়। প্রাচীন গ্রিস বা রোমে এর অনেক আগে থেকেই স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রচলন ছিল।

ইউথ্যানাশিয়া সাধারণত তিন ধরনের। (১) ভল্যান্টারি, (২) নন-ভল্যান্টারি এবং (৩) ইনভল্যান্টারি। অসুস্থ ব্যক্তির সম্মতিতে স্বেচ্ছামৃত্যু হল "ভল্যান্টারি ইউথ্যানাশিয়া"। রোগীর সম্মতি ছাড়া ইউথ্যানাশিয়া হল "নন-ভল্যান্টারি"। স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিতে সক্ষম, এমন ব্যক্তির সম্মতি না-নিয়ে বা তার অসম্মতিতে ঘটানো ইউথ্যানাশিয়া হল "ইনভল্যান্টারি"। এই তিন ধরনের ইউথ্যানাশিয়াকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়-(১) অ্যাক্টিভ ইউথ্যানাশিয়া এবং (২) প্যাসিভ ইউথ্যানাশিয়া। অ্যাক্টিভ ইউথ্যানাশিয়াতে কোনো প্রাণঘাতী ওষুধ বা ইঞ্জেকশন সরাসরি প্রয়োগ করা হয়। প্যাসিভ ইউথ্যানাশিয়াতে জীবনদায়ী ওষুধ, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা লাইফ সাপোর্ট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ইচ্ছামৃত্যুর অধিকার চাই : ১৯২৮ সালে গুজরাতি সংবাদপত্র 'নবজীবন'। গান্ধীজীর দুটি চিঠি প্রকাশ করে। সে সময় সবরমতী আশ্রমে একটি বাছুরের ম;ত্যু ঘিরে তীব্র আক্রমণের শিকার হন মহাত্মা। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে ধেয়ে আসে একের পর এক সমালোচনার তির। তারই প্রেক্ষিতে পরিস্থিতির বিশদ ব্যাখ্যা করে চিঠি লেখেন 'জাতির জনক'। গান্ধীজী লিখেছিলেন, "অঙ্গহানী হওয়ার ফলে আশ্রমের একটি বাছুর তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। চিকিৎসকদের সবরকম চেষ্টার পরও তার কষ্ট দূর করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা জানান, বাছুরটির সেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। বোঝা যাচ্ছিল প্রাণীটির অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়, মানবিকতার স্বার্থে এই তীব্র যন্ত্রণার একমাত্র উপশম হতে পারে শুধুমাত্র মৃত্যু। বিষয়টি সম্পর্কে গোটা আশ্রমের মতামত জানতে চাওয়া হয়। শেষ গভীর অনুতাপ কিন্তু প্রবল যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিই। আমি নিজে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে এক চিকিৎসককে প্রাণীটির দেহে বিষাক্ত ইনজেকশন দেওয়ার নির্দেশ দিই। মাত্র দুই মিনিটে গোটা প্রক্রিয়া শেষ হয়"। এরপর মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, "বাছুরটির মতো কোনো মানুষের ক্ষেত্রেও কি একই নীতি গ্রহণ করা সম্ভব? আমার নিজের জন্যও কি এমন সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হতে পারে? আমার উত্তর হল হ্যাঁ। একজন শল্য চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করতে রোগীর দেহে ছুরি বসালে যেমন হিংসা বলা চলে না, তেমনই পরিস্থিতির বিচারে আরও এক কদম এগিয়ে কাউকে অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে তার প্রাণসংহার করায় কোনও অন্যায় নেই"।

ইউথ্যানাশিয়া কার্যকরের আইন : বিভিন্ন দেশে ইউথ্যানাশিয়া কার্যকর করার আইনও বিভিন্ন রকম। নেদারল্যান্ডের আইন অনুযায়ী ইউথ্যানাশিয়া হল রোগীর অনুরোধ অনুসারে ডাক্তারের মাধ্যমে তার জীবনাবসান ঘটানো। ব্রিটেনের হাউস অফ লর্ডসে

মেডিক্যাল এথিকস সিলেক্ট কমিটির মতে ইউথ্যানাশিয়া হল অপরিসীম রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য 'ডেলিবারেট ইন্টারভেনশন'। এই মুহূর্তে নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড, এস্তোনিয়া, আমেরিকার ওয়াশিংটন, ওরিগন এবং মন্টানা রাজ্যগুলোতে ভল্যান্টারি ইউথ্যানাশিয়া আইনানুগভাবে স্বীকৃত। ২০১৫ থেকে কানাডার কিউবেকেও ভল্যান্টারি ইউথ্যানাশিয়া আইনি স্বীকৃতি পাবে। নন-ভল্যান্টারি ইউথ্যানাশিয়া কোনো দেশেই আইনি স্বীকৃতি পায়নি এবং ইনভল্যান্টারি তো খুন করার সামিল।

ভারতে প্যাসিভ ইউথ্যানাশিয়া সম্প্রতি আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১১ সালের ৭ মার্চ সুপ্রীমকোর্ট জানান যে 'পার্মানেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট'-এ দীর্ঘদিন থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'লাইফ সাপোর্ট' প্রত্যাহার করে পরোক্ষে স্বেচ্ছামৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রীমকোর্ট প্রথমবার ভারতে প্যাসিভ ইউথ্যানাশিয়ায় সম্মতি দেন। বলা হয়, কোনো রোগী যদি দীর্ঘদিন কোমায় থাকেন, তবে তাঁকে খাবার খেতে না দিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য পরোক্ষে ইন্ধন দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু অবশ্যই পরিবারের লোক আর আদালতের অনুমতিসাপেক্ষে। 'খাবার খেতে না দিয়ে' স্বেচ্ছামৃত্যুর এই ধারণা হিন্দুধর্ম ও জৈনধর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুটি ধর্মেই না-খেয়ে মৃত্যুর অধিকার স্বীকৃত। সুপ্রীমকোর্ট বলেছেন, "omission of support to life" কখনোই "act of killing" নয়; তাই এভাবে পরোক্ষে মৃত্যুর ইন্ধন দেওয়া কখনোই ভুল সিদ্ধান্ত নয়।

জীবন যখন এমন দুর্বিষহ আর পরমুখাপেক্ষী, তখন ইউথ্যানাশিয়ার মাধ্যমে তাঁর শেষ সীমাটুকু নির্ধারণ করে নেওয়ার অধিকার চাওয়া তো ভুল হতে পারে না! মানুষের জীবনে বার্ধক্য, জরা, অসুস্থতা খুবই স্বাভাবিক। তার থেকে ছুটি চাওয়ার প্রশ্নই নেই, কারণ তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দেহ আর মন যদি মানুষের মতো অবস্থায় আর না থাকে, বোধহীন আর যন্ত্রচালিত হয়; তখনও সে জীবনকে প্রলম্বিত করাতে অর্থ, মর্যাদা, উত্তরসূরীদের ধৈর্য - সবেরই ক্ষতি। সেখানে ইউথ্যানাশিয়ার মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ জীবনকে শেষ করা ভুল নয় মোটেই।

একজিট : স্বেচ্ছামৃত্যুর ব্যাপারে আর-একটা মাইলস্টোন হল 'মরণ পর্যটন'। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অন্য লোকে বেড়াতে যাওয়ার যে পৌরাণিক ধারণা, ভাষার সামান্য পরিবর্তন করে সেটাই হয়ে দাঁড়ালো মৃত্যুর জন্যে বেড়াতে যাওয়া, যাকে বলে মরণপর্যটন"। এ ব্যাপারে অবশ্যই পথিকৃৎ সুইজারল্যান্ড, জীবনযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে যারা স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইউথ্যানাশিয়ার অধিকারকে ইতিমধ্যেই বৈধ করেছে। নিজেদের দেশে অধিকার না পেলে স্বেচ্ছামৃত্যুর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে আবেদন করতে পারেন। অনুমতি পেলে পরবর্তী দায়িত্ব নেবে সেখানকার পর্যটন সংস্থাগুলি একেবারে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করা পর্যন্ত। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা বাস্তব। ২০১৩ সালের

যে হিসাব পাচ্ছি, তাতে ইউরোপের নানা দেশ থেকে মরণ পর্যটনে শামিল হয়েছেন প্রায় ৯০০-র কাছাকাছি ইচ্ছুক মানুষ। এর ফলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে এমন খবর তো আমি শুনিনি!

ভয়ংকর অসুখে-ধরা অধিকাংশ মানুষ, আবার চারপাশের দশটা-পাঁচটা ঘষটানো অধিকাংশ মানুষও বেঁচে থাকেন স্রেফ পটাং করে মরে যাওয়ার খ্যামতাটা নেই বলে, 'এর পরেও বাঁচতে ইচ্ছে করছে' বলে আদৌ নয়। মৃত্যুর প্যাটার্নটা নিজে ঠিক করতে পারব না? কেন? আমি কবে মরব এবং কখন, সেটা ঠিক করাও কি আমার জীবনযাপনের সিদ্ধান্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ নয়? শরীর অথবা মনের রোগে ভুগে-হেগে হেজেমজে গিয়ে নির্ধারিত শেষ নিশ্বাসটা নেব। আমি সত্যি সত্যি স্বাধীন, না দণ্ডিত? সঙ্গীহীন-বাক্যহীন বন্ধ্যা বাঁচাটাকে মারতে মরতেই তো চাই। উইথ ডিগনিটি।

বেশ কিছু দেশে ইতিমধ্যেই আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যু। একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন্ কোন্ দেশে ইচ্ছামৃত্যু স্বীকৃত। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, আলবেনিয়া, কলম্বিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, নিউ মেক্সিকো, মন্টানায়। পূর্বেই ইচ্ছামৃত্যুর স্বীকৃতি ছিল প্রাচীন গ্রিস এবং রোমে।

কিছু অপ্রত্যাশিত মৃত্যু : এমন অনেক মৃত্যু হয়ে গেছে এ পৃথিবীতে, যে প্রত্যাশিত নয়। শুধুমাত্র অজ্ঞানতার কারণেই সেইসব মহান ব্যক্তিদের মেরে ফেলেছেন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপোষিত ধর্মযাজকেরা। সে সময়ে ধর্মবেত্তাদের এতটাই দাপট ছিল যে তাঁরা যা বুঝতেন তার বাইরে কথা বললেই নির্মম হত্যা। এ প্রসঙ্গে এমন কয়েকজনের মৃত্যুর বর্ণনা না করলে লেখাটা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

(১) সক্রেটিস : সক্রেটিস প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। তিনি এমন এক দার্শনিক চিন্তাধারা জন্ম দিয়েছেন, যা দীর্ঘ ২০০০ বছর ধরে পশ্চিমা সংস্কৃতি, দর্শন ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। সক্রেটিস ছিলেন এক মহান সাধারণ শিক্ষক, যিনি কেবল শিষ্য গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানে বিশ্বাসী ছিলেন না। জেনোফোন রচিত সিম্পোজিয়ামে সক্রেটিসকে বলতে শোনা যায়, তিনি কখনো কোনো পেশা অবলম্বন করবেন না। কারণ তিনি ঠিক তা-ই করবেন, যাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, আর তা হচ্ছে দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা।

এথেনীয় সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার যুগ থেকে পেলোপনেশীয় যুদ্ধে স্পার্টা ও তার মিত্রবাহিনীর কাছে হেরে যাওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টাই সক্রেটিস বেঁচেছিলেন। পরাজয়ের গ্লানি ভুলে এথেন্স যখন পুনরায় স্থিত হওয়ার চেষ্টা করছিল তখনই সেখানকার জনগণ একটি কর্মক্ষম সরকার পদ্ধতি হিসেকে গণতন্ত্রের সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেছিল। সক্রেটিসও গণতন্ত্রের একজন সমালোচক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

এথেনীয় সরকার সক্রেটিসকে এমন দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছিল যাতে তার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতে পারে। সক্রেটিস সরাসরি বা অন্য কোনোভাবে বিভিন্ন সময়ে স্পার্টার অনেক নীতির প্রশংসা করেছে যে, স্পার্টা ছিল এথেন্সের ঘোর শত্রু। এসব সত্ত্বেও ঐতিহাসিকভাবে সমাজের চোখে তার সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে তীব্র সমালোচনা। এথেনীয়দের সুবিচারের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ানোর চেষ্টাকেই তার শাস্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্লেটোর অ্যাপোলজি গ্রন্থের ভাষ্যমতে, সক্রেটিসের বন্ধু চেরিফোন একদিন ডেলফির ওরাকলের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা হয় — সক্রেটিসের চেয়ে প্রাজ্ঞ কেউ আছে কি না। উত্তরে ডেলফির ওরাকল জানান, সক্রেটিসের চেয়ে প্রাজ্ঞ কেউ নেই। এরপর থেকেই সক্রেটিসকে সমাজের চোখে একজন রাষ্ট্রীয় অপরাধী হিসাবে দেখা হতে থাকে। সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন ওরাকলের কথাটি ছিল নিছক হেঁয়ালি। কারণ ওরাকল কখনও কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞান অর্জনের কারণে প্রশংসা করেন না। এটি আদৌ হেঁয়ালি ছিল কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য সক্রেটিস সাধারণ এথেনীয়রা যে লোকদের জ্ঞানী বিবেচনা করত তাদের কাছে গিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তিনি এথেন্সের মানুষদেরকে উত্তম, সৌন্দর্য এবং গুণ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বুঝতে পারেন এদের কেউই এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানেন না। কিন্তু মনে করে যে তারা সব জানে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সক্রেটিস সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী যে, সে যা জানে না তা জানে বলে কখনও মনে করেন না। তার এ ধরনের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তখনকার স্বনামধন্য এথেনীয়দের বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়। সক্রেটিসের সামনে গেলে তাদের মুখ শুকিয়ে যেতে শুরু করে। কারণ তারা কোনো প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন না। ফলে এখান থেকেই সকলে সক্রেটিসের বিরোধিতা শুরু করে দেন।

এখানেই শেষ নয়, তাঁর বিরুদ্ধে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করানোর অভিযোগও আনা হয়েছে। সব অভিযোগ বিবেচনায় এনে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। হেমলক বিষ পানের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়। বিষপানের পর সক্রেটিসকে হাঁটতে আদেশ করা হয় যতক্ষণ-না তাঁর পদযুগল ভারী মনে হয়। অতঃপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর যিনি সক্রেটিসের হাতে বিষপাত্র তুলে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর পায়ে পাতায় চিমটি কাটেন। সক্রেটিস সেই চিমটি স্বাভাবিক কারণেই অনুভব করতে পারেননি।

(২) জর্দানো ব্রুনো : জর্দানো ব্রুনো একজন ইতালীয় দার্শনিক, ধর্মযাজক, বিশ্বতত্ত্ব বিশারদ এবং ওকাল্টিস্ট। জিওর্দানো ব্রুনোর আসল নাম ফিলিপ্পো। প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা করার অপরাধে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। এজন্য অনেকে তাকে চিন্তার মুক্তির জন্য নিবেদিত একজন শহিদ হিসাবে গণ্য করে থাকেন। তার জন্মের সময়টা এমন ছিল যে, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়াশীলতাও শেষ হয়নি, আবার

যুক্তিভিত্তিক আধুনিক যুগের সূচনাও ঘটেনি। সে হিসাবে তার জন্ম এক মহাসন্ধিক্ষণে। এ কারণে দর্শনচ্যুত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানচ্যুত দর্শনের অন্ধকার যুগ বিরাজ করছিল। এমন সময়েই বিপ্লবী মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হন জর্দানো ব্রুনো। সে সময় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উত্থান ঘটছিল এবং ক্যাথলিক চার্চ সমাজে নিজেদের প্রভাব রক্ষার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ব্রুনো বিজ্ঞান, দর্শন এবং যুক্তিবাদ নিয়ে এমন সব চিন্তা করেছিলেন যা বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যই বলা হয়, ব্রুনো অসময়ে জন্ম নিয়েছিলেন, তার জন্ম আরও অনেক পরে হওয়া উচিত ছিল। ব্রুনো সরাসরি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না, যতটা তিনি দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু তার জোরালো বক্তব্য বিজ্ঞানের বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাজ-কারবার তখনকার অনেক বিজ্ঞানী দার্শনিককে মুক্তচিন্তা করতে এক রকমের বাধ্য করেছে। আখেরে এতে লাভ হয়েছে বিজ্ঞানের। বদ্ধ চিন্তাভাবনার গণ্ডি পেরিয়ে বিদ্রোহ করে শিখিয়েছে মুক্তচিন্তা করতে। তার বক্তব্য ছিল, "মহাবিশ্ব সীমাহীন। এখানে অসীম সংখ্যক পৃথিবীর মতো বিশ্ব আছে অসংখ্য নক্ষত্র ঘিরে। এবং যেহেতু অসীম সংখ্যক পৃথিবী রয়েছে তাই এই অসীম সংখ্যক বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে"।

কোপার্নিকাস সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের প্রথম প্রস্তাবকারী হলেও তাকে এর রেশ ভোগ করতে হয়নি। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে নিকোলাস কোপার্নিকাস পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সেই স্থানে সূর্যকে বসান। তিনি তাঁর মতবাদে বলেন, "সকল গোলক সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে এবং এজন্য সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র"। ১৫৪৩ সালে তাঁর বই "De Revolutionibus Orbium Coelestium" প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তিনি মারা যান। এ যেন মরে গিয়ে বেঁচে যাওয়া। কিন্তু তাঁর মতবাদ সমর্থনের অভিযোগে ব্রুনোকে মরতে হয়।

জুয়ান মোসেনিগো নামক একজন অভিজাত ভেনেশিয়ান তাঁকে ভেনিসের ধর্মবিচার সভার হাতে তুলে দেন। তাকে ১৫৯২ সালের ২৩ মে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁকে রোমের ধর্মবিচার সভার কাছে পাঠানো হয়, সেখান থেকে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর সাত বছরের বিচারকার্য শেষে ১৬০০ সালের ২০ জানুয়ারি রায় ঘোষণা করা হয়, তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার। রায় ঘোষণার পর তাঁকে ৮ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল অনুশোচনার জন্য। যদিও তিনি তা করেননি।

১৬০০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রোমের ক্যাম্প ডেল ফিওরিতে ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়।

(৩) গ্যালিলিও গ্যালিলি : গ্যালিলিও গ্যালিলি একজন ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক যিনি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে বেশ নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। কোপারনিকাসের মতবাদের বিরোধী মতবাদ প্রচারিত হয় এবং গ্যালিলিও তা

সমর্থন করেন। ফাদার টমাসো কাচ্চিনি ব্যাখ্যা সহকারে পৃথিবীর গতি সম্পর্কে গ্যালিলিও মতবাদ বর্ণনা করেন। এরপর সেই মতবাদের ভিত্তিতে তার বিচার করেন এবং ঘোষণা করেন যে, এগুলো ভয়ংকর এবং ধর্মদ্রোহিতার শামিল। এধরনের অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টায় তিনি রোমে যান। কিন্তু ১৬১৬ সালে কার্ডিনাল রবার্ট বেলারমাইন ব্যক্তিগতভাবে তার মামলাটি হাতে নেন এবং তাকে হেনস্থা শুরু করেন। ধর্মীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় আইন হিসাবে কোপার্নিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে বা পড়াতে বাধ্য করা হয়।

১৬৩০ সালে তিনি রোমে ফিরে যান তার রচিত "ডায়ালগ কনসারনিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেন্স" বইটি প্রকাশের লাইসেন্স নেওয়ার জন্য। এটি বইটি ১৬৩২ সালে ফ্লোরেন্স থেকে প্রকাশিত হয়। এ বছরেই অক্টোবর মাসে তাকে রোমের পবিত্র দপ্তরের (Holy Office) সম্মুখীন হতে হয়। কারণ ছিল "Congregation for the Doctrine of the Faith" (বিশ্বাসের উপদেশাবলির জন্য সমাবেশ)। আদালত থেকে তাকে একটি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় যার মাধ্যমে তাকে পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণা শপথের মাধ্যমে পরিত্যাগের জন্য বলা হয়। এই দণ্ডাদেশের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্যই তাকে সিয়েনায় একঘরে জীবন কাটাতে হয়। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে - বাইবেল বিরোধী এই সত্য কথা বলার কারণে চার্চ গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করেছিল 'ধর্মদ্রোহিতার' অভিযোগে। ১৬৩৩ সালে, গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়, হাঁটু মুড়ে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই সঠিক, পৃথিবী স্থির অনড় এবং সৌরজগতের কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। শোনা যায়, এর মধ্যে ও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন : "তারপরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে"।

ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, অন্তরীণ অবস্থায় নিজ গৃহে।

ঠিক চারশ বছর পরে গত ১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর ভ্যাটিকান সিটির পোপ দ্বিতীয় জন পল (খ্রিস্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু) আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেন যে গ্যালিলিওকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে শাস্তি দেওয়াটা তাদের জন্য ভুল ছিল, তিনি এই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁর উপর থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

রহস্যজনক মৃত্যু : এমন অনেক মৃত্যু আছে, এমন অনেক অন্তর্ধান আছে, এমন কোনো হারিয়ে আছে — যা অধরাই রয়ে গেছে নানা কূট-কারণে। এমনই কয়েকটি

ঘটনা উল্লেখ করব—

(১) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু : মৃত্যু নয়, অথচ মৃত্যুর মতো। অবশ্য এই একটি ক্ষেত্রেই "মৃত্যু" শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। সেটা গর্হিত অপরাধ! বলতে হয় অন্তর্ধান। আমি শুধু ঘটনাটি বলব : সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি নেতা। তিনি 'নেতাজি' নামে সমধিক পরিচিত। উল্লেখ্য, কংগ্রেস কমিটি যেখানে ভারতের অধিরাজ্য মর্যাদা বা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে মত প্রদান করে, সেখানে সুভাষচন্দ্রই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত দেন। জওহরলাল নেহরু সহ অন্যান্য যুবনেতারা তাঁকে সমর্থন করেন। শেষপর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ মতবাদ গ্রহণে বাধ্য হয়। ভগৎ সিংহের ফাঁসি ও তাঁর জীবন রক্ষায় কংগ্রেস নেতাদের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন চুক্তি বিরোধী একটি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁকে কারারুদ্ধ করে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়। নিষেধাজ্ঞা ভেঙে তিনি ভারতে ফিরে এলে আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

মনে করা হয়, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট (যদিও এই মত বিতর্কিত) তাইওয়ানে একটি বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। একটি মতে নেতাজি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে বন্দি অবস্থায়, সাইবেরিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন। আর-একটি মতে, বর্তমানে রেনকোজি মন্দিরে রাখা নেতাজির চিতাভস্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে, ওই চিতাভস্ম নেতাজির নয়। আসলে ভারতবর্ষে নেতাজির তুমুল জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একদল উঁচুতলার ভারতীয় নেতা এবং ইংরেজ সরকার মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করে নেতাজিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। তাই ভারতীয় সরকার কখনো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জনসমক্ষে আনেননি। অনেকের মতে ফৈজাবাদের ভগবান গুনমানি বাবা হলেন নেতাজি। পঞ্চাশের দশকের শাহনওয়াজ কমিশন থেকে মুখার্জি কমিশন পর্যন্ত একাধিক কমিশন বসিয়েও রহস্যের কোনো সুরাহা হয়নি। রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ সদস্য সুখেন্দুশেখর রায় এক বিবৃতিতে বলেন, "যদি বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজি মারা গিয়ে থাকবেন, তাহলে সেই তথ্য প্রকাশ পেলে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কেন খারাপ হবে? দুর্ঘটনায় তো যে কেউই মারা যেতে পারেন! তাহলে কি আমরা ধরে নেব কোনো কোনো রাষ্ট্র নেতাজির অন্তর্ধানের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল? সরকার যে যুক্তি দিচ্ছে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এই রহস্যজনক নীরবতা সম্মান দিয়ে থাকেন, গোটা ঘটনায় তাদের জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে, সেইজন্যই এই নীরবতা পালন করা হচ্ছে, তথ্য গোপন করা হচ্ছে"।

(২) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী : লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একজন বিশিষ্ট ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। শাস্ত্রী সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক থেকে রাশিয়ার তাসখন্দে মারা যান। তার এহেন আকস্মিক মৃত্যু রহস্যের জন্ম দেয়। কিন্তু পোস্ট মর্টেম

করে সেই রহস্য উদঘাটনের জন্য রাশিয়া বা ভারত সরকার উভয়ই কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলে শুনিনি। পরে তাঁর মৃত্যুর পিছনে সঠিক কারণ চিহ্নিত করা হয় যে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হয়। তার সমস্ত জিনসিপত্র ভারতে ফেরত এলেও শুধুমাত্র যে ফ্ল্যাস্কে করে শেষবার তিনি জল পান করেন তা ফেরত দেয়া হয়নি। ২০০৯ সালে জনপ্রিয় লেখক অনুজ ধর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত নথি প্রকাশ করার জন্য তথ্য অধিকারের অজুহাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে, তাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হতে পারে এবং বৈদিশেকি সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। তাই তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং সংসদীয় বিশেষাধিকার ভঙ্গ হতে পারে বলেও জানানো হয়।

(৩) সুব্রত মুখার্জি : এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি ওবিই, ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম চিফ অব দ্য এয়ার স্টাফ বা বিমান বাহিনী প্রধান। তাকে বলা হয় "ভারতীয় বিমান বাহিনীর জনক"। সুব্রত মুখার্জী ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার ১৯৬০ সালের নভেম্বরে প্রথম টোকিওগামী ফ্লাইটের যাত্রীদের একজন। ১৯৬০ সালের ৮ নভেম্বর সুব্রত ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন বন্ধুর সঙ্গে টোকিয়োর একটি রেস্তোরায় আহার করছিলেন। এ সময় খাবারের একটি টুকরো (মতান্তরে কাঁটা ফুটে) তার গলায় আটকে যায় এবং তিনি শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তাঁর মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট রহস্যের দানা বাঁধে। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির মৃত্যুর কারণ অন্য কোনোভাবে হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। আজও কোনো কিনারা হয়নি। কিনারা তো হয়ই-নি, উলটে এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

(৪) শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু : শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু ঠিক কীভাবে হয়েছিল, এই বিষয়টি নিয়ে নানা মত আছে। মতান্তরের মাঝখানে কিছু অনুমানভিত্তিক প্রচারও ঢুকে পড়েছে। সবটা মিলিয়ে, চৈতন্যদেবের অন্তিম পর্ব সম্পর্কে যৌক্তিক বিদ্যায়তনিক সংশয় অপেক্ষা, অযৌক্তিক অপপ্রচারই বড়ো হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সন্দেহ কেন? দুটি স্পষ্ট কারণ : (১) চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঠিক কীভাবে হল সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা নেই। এবং (২) শ্রীচৈতন্য জগন্নাথে মানে নীলাচলে লীন হয়ে গেলেন, এই প্রচার অনেকেই তাঁকে হত্যারই করার সন্দেহ করছেন। তাহলে? সংস্কৃত, বাংলা এবং ওড়িয়া ভাষায় চৈতন্যদেবের যে জীবনকথা লিখিত হয়েছে, সেখানে দুটি তথ্যই প্রধান। জয়ানন্দ মনে করেন, রথাগ্রে নৃত্যরত অবস্থায় পায়ে ইট লেগে ক্ষত হয়, সেই কারণে তাঁর দেহান্ত হয়। জয়ানন্দ "চৈতন্যমঙ্গল"-এ তিনি চৈতন্যদেবের স্পর্শ লাভ করেছিলেন আনুমানিক দুই বছর বয়সে। চৈতন্যদেবকে দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে থাকার কথা নয়। যদি-বা তাঁর মনে থাকেও, তবে চৈতন্যদেবের অন্তিম পর্ব তাঁর দেখার কথা নয়। জয়ানন্দের সিদ্ধান্ত বাস্তবে সম্ভব। কিন্তু তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা, এমন কিছু প্রমাণ হয় না। ওড়িয়া কবি ঈশ্বর দাসের সিদ্ধান্ত, তিনি জগন্নাথের

দেহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। কোন্ মতটা ঠিক? চৈতন্যদেবের সহপাঠী মুরারী গুপ্তই প্রথম সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জীবনকথা লেখেন, যেটি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত" নামে পরিচিত। তাঁর রচনা সর্বাধিক প্রামাণ্য। তিনি চৈতন্যদেবের অন্তিম পর্ব কিছু লেখেননি। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেন, পিতার কাছ থেকে শুনে "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" লিখেছিলেন। তিনিও প্রত্যক্ষদর্শী নন। ফলে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু স্বাভাবিক, না হত্যা?— এমন কোনো সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা কীভাবে সম্ভব?

জয়ানন্দের "পায়ে ইট লেগে মৃত্যু"-র তত্ত্ব বাস্তবে একেবারেই অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য কাব্যগুলি এই ভাবনাকে সমর্থন করে না বলে এ নিয়ে মানুষের সন্দেহ আছে। চৈতন্যদেবের "জগন্নাথে লীন" হয়ে যাওয়ার বর্ণনা এই সন্দেহকে আরও জোরদার করেছে। অনেকের ধারণা পাণ্ডারা তাকে হত্যা করে এই প্রচার করেছে — মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হয়ে গেছেন! নিরঞ্জন ধর তাঁর "অবতার শ্রীচৈতন্য ও মানুষ নিমাই" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে যেকথা লিখেছেন, সেটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক : "রাজরোষ"-এ পড়ে চৈতন্য নীলাচলবাসী হন এবং প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। "রাজরোষ" থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই নিমাই গৃহত্যাগী হন। মহানিষ্ক্রমণের রাতে নিমাই দুই বলবান মায় বিশ্বস্ত সহচর গদাধর ও হরিদাসকে নিজের দু-পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন। এ ঘটনায় বোঝা যায়, নিমাই ওই রাতের অন্ধকারে সুলতানের লোকেরা তাঁকে ধরতে আসতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। ইতিমধ্যেই যে সুলতান তাঁর বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারী কেশবছত্রীর উপর চৈতন্যকে ধরে আনার ভার দিয়েছেন। একথা শোনামাত্র সেদিনই রাতের অন্ধকারে তিনি ওই স্থান ত্যাগ করেন।

রাজশক্তির সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন নিমাই। নিমাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। স্বীয় হস্তে দণ্ড রাখতে শুরু করেন। চরম নিরাপত্তাহীনতার কারণে নিমাই নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করেন। কারণ একাধিক। প্রথমত ওড়িশা তখন পূর্ব ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য, তদুপরি বৈষ্ণব-প্রভাবিত ছিল। দ্বিতীয়ত পুরী বৈষ্ণবদের এক সর্বভারতীয় প্রধান তীর্থক্ষেত্র বটে এবং পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্ররা স্বয়ং ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। সর্বোপরি, নবদ্বীপবাসী যাঁরা মুসলিম শাসকদের অত্যাচারে ও নানা ফতোয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই পুরীতে এসে জমায়েত হয়েছিল। বাংলা-ওড়িশার সীমান্তের পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল থাকলেও চৈতন্য কোনো ঝুঁকি নেননি। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর রামচন্দ্র খাঁনের সঙ্গে তিনি আগে থেকেই আগাম বন্দোবস্ত করেছিলেন, যাতে তিনি নির্বিঘ্নে বাংলা-ওড়িশা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেন। তিনি বাংলার রাজরোষ অতিক্রম করে সীমান্ত পেরিয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করলে এতটাই নিরাপদ বোধ করছিলেন যে, সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর হস্তস্থিত দণ্ড সপাটে ভেঙে ফেলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল কোথায়! ওড়িশায় গিয়েও তিনি নোংরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। হ্যাঁ, চৈতন্য ওড়িশার অভ্যন্তরীণ

রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। বস্তুত ওড়িশার সেদিনকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিষ্কার দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যসম্প্রদায়, অপরদিকে বিদ্যাধর ও মন্দিরের পুরোহিতকুল।

উৎকলবাসীরা শ্রীচৈতন্যকে যখন "সচল জগন্নাথ" ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়কালে ঈর্ষান্বিত হয়ে ক্ষমতা দখলের চরম পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাধর চৈতন্যশিবিরকে ছত্রখান করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতকুলের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তাঁদের চৈতন্যবিরোধিতা তো ছিলই, উপরন্তু তাঁদেরকে আর্থিক টোপ দেওয়া হল। বলা হল - তীর্থযাত্রী, ভক্তদের কাছ থেকে পূজা-দান-প্রণামী ইত্যাদি বাবদ মন্দিরের যে বিরাট আয় হত তার সবটুকুই পুরোহিতদের প্রাপ্য।

চৈতন্য যে এইসব ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেননি তা নয়। তা বুঝেই কাশীশ্বর নামে এক ভীমদেহী ব্যক্তি অঙ্গরক্ষক রূপে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, যখন চৈতন্য মন্দির প্রদর্শনে আসতেন। যে দণ্ড তিনি সীমান্তে ভেঙে ফেলেছিলেন, তা আবার ধারণ করতে শুরু করলেন।

তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। সেদিন ছিল জগন্নাথের চন্দন উৎসব। চন্দন সরোবরের চারপাশে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। মন্দির প্রায় পরিত্যক্ত বলা যায়। কয়েকজন প্রহরী ও দু-একজন পুরোহিত মন্দির-প্রাঙ্গনে টুকটাক কাজে ব্যস্ত। এমন সময় সতর্ক পাহারা এড়িয়ে চৈতন্য একাকী মন্দিরে এসে উপস্থিত। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। চৈতন্য অনুচরেরা দরজা খোলার জন্য দরজার বাইরে হইচই করতে থাকলেন, ভিতর থেকে কোনো সাড়া এলো না। বেশ কয়েক ঘন্টা পরে দরজা খুলে মন্দিরের প্রহরী জানিয়ে দিল যে — চৈতন্য জগন্নাথের অংশ, জগন্নাথের দেহে মিশে গেছেন এবং তাঁর মৃতদেহ জগন্নাথের আদেশে ক্ষেত্রপাল আকাশ দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছেন।

জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতদের এহেন দুর্বল চিত্রনাট্য সরল ও শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণবরা মাথা পেতে মেনে নিল বিনাবাক্যব্যয়ে। বৈষ্ণব তথা চৈতন্যভক্তগণরাও মনে করেন, পাণ্ডারা চৈতন্যদেবের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তদুপরি চৈতন্যদেবকে একা একা মন্দিরে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে লিখিতভাবেই কড়া নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল, তাঁর মরদেহ কোথায় গেল-এসব প্রশ্নের উত্তর আজ আর নেই। আজকের দিনে যেমনভাবে কোনো হত্যার পুলিশি তদন্ত হয়, তেমনভাবে চৈতন্যের মৃত্যুর কিনারা করা যাবে না। চৈতন্যভক্তগণরা আরও মনে করেন, চৈতন্যদেব খুন হলে সেই খবর চাপা থাকত না। কোনো-না-কোনোভাবে মৌখিক সাহিত্য, মৌখিক ইতিহাসে তা ধরা পড়ত। তেমন কোনো প্রমাণ লোকসংস্কৃতিতে

পাওয়া যায় না। পাণ্ডাদের ভয়ে না হয় পুরীর লোক চুপ করে থাকতে পারে। কিন্তু চৈতন্যজীবনীকাররা তো সবাই পুরীতে বসে লেখেননি। খুন হলে তাদের লিখতে তো কোনো বাধা ছিল না। তাই কি!!!

(৫) **হিটলার :** অ্যাডলফ হিটলার গানশুটে আত্মহত্যা করে মারা যান। তার আত্মহত্যার দিনটি ছিল ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল। আর আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে বার্লিনের ফুয়েরার বাংকারে। ফুয়েরার বাংকারটি প্রথম দিকে গড়ে তোলা হয়েছিল সাময়িকভাবে, বিমান হামলার সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য। পরে যখন বার্লিনে বিমান হামলা বেড়ে গেল, তখন এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একে হিটলারের স্থায়ী আশ্রয়স্থলে রূপ দেয়া হয়। অ্যাডলফ হিটলার এই বাংকারে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি থেকে। তখন থেকেই এই বাংকারটি হয়ে ওঠে জার্মান নাৎসি সরকারের মূল কেন্দ্র। হিটলার সেখানেই ছিলেন আত্মহত্যার আগে পর্যন্ত। এ বাংকারেই আত্মহত্যার ৪০ ঘন্টা আগে হিটলার বিয়ে করেন ইভা ব্রাউনকে। বলা যায় বিয়ের পরপরই এরা দুজনই আত্মহত্যা করেন। ইভা ব্রাউন পলা হিটলারের জন্ম ১৯১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। হিটলারের সঙ্গে আত্মহত্যা করে মৃত্যু ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল। ছিলেন হিটলারের দীর্ঘ দিনের সঙ্গীও মাত্র ৪০ ঘন্টারও কম সময়ের জন্য হিটলারের স্ত্রী। বাংকারটি ছিল রাইখ চ্যান্সেলারির নীচের ভূগর্ভে। ১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল যখন রেড আর্মি আশপাশে যুদ্ধরত, তখন ইভা সংক্ষিপ্ত আয়োজনে বিয়ে করেন হিটলারকে। তখন তার বয়স ২৯। আর হিটলারের ৫৬। এর ৪০ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে তিনিও আত্মহত্যা করেন হিটলারের সঙ্গে। তার আত্মহত্যা কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা নিয়ে প্রচলিত আছে নানা মত। কেউ বলছেন তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। কেউ বলেছেন তিনি নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। কেউ বলেছেন হিটলার সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অনেক কষ্ট করে মারা যান। সমসাময়িক ইতিহাসবিদেরা অবশ্য তার মৃত্যুর এ বিবরণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন - হয় এটি নিছক একটি সোভিয়েত অপপ্রচার, নয়তো এটি বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটি প্রয়াস মাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীর একটি সাক্ষ্যও রয়েছে। এ সাক্ষ্য মতে, হিটলারের মুখে গুলির আঘাত লাগে। তবে এর কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া মাথার যে খুলি ও চোয়াল সংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে তাও সত্যি-সত্যি হিটলারের কি না, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। এর বাইরে হিটলারের দেহভস্ম কোথায় কোথায় ছড়ানো হয়েছে, সে ব্যাপারেও বিভিন্ন ইতিহাস উৎস বিশ্লেষণে একমত হওয়া যায় না। প্রচার করা হয় — হিটলার বললেন, তিনি শেষ পর্যন্ত বার্লিনেই থাকবেন এবং এরপর নিজের গুলিতেই আত্মহত্যা করবেন। পরদিন তিনি এসএস চিকিৎসক ড. ওয়র্নার হ্যাসির কাছে জানতে চান আত্মহত্যার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি কোনটি। ড. ওয়ার্নার তাকে জানান "পিস্তল অ্যান্ড পয়েজন মেথড" হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আত্মহত্যা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সারকথা হচ্ছে, এক

ডোজ সায়ানাইড সেবন আর সেই সঙ্গে মাথায় গুলি করা। ১৯৬৯ সালে সোভিয়েত সাংবাদিক লেভ বেজিমেনস্কির SMERSH-এর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সম্পর্কিত একটি বই প্রকাশিত হয় পাশ্চাত্যে। কিন্তু পূর্ববর্তী ভুল তথ্য দেওয়ার চেষ্টার ফলে ইতিহাসবিদেরা এ বইয়ের তথ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। ১৯৭০ সালে কেজিবি নিয়ন্ত্রিত স্মার্শ ফ্যাসিলিটি পূর্ব জার্মানি সরকারের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। কেজিবি তখন আশঙ্কা করে ১৯৪৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে হিটলারের লাশ পুঁতে রাখার স্থানটি চিহ্নিত হয়ে পড়লে সে স্থানটি জার্মানদের তীর্থস্থানে রূপ নিতে পারে। সে আশঙ্কায় কেজিবি ডিরেকটর ইউরি আদ্রেঁপভ হিটলার ও ইভার দেহাবশেষ চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার অপারেশন অনুমোদন করেন। ১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল গোপনে মাটি খুঁড়ে বের করে আনা হল পাঁচটি কাঠের বাক্স। এগুলির মধ্যে ছিল ১০ কিংবা ১১টি লাশের অবশেষ। এগুলির বেশিরভাগই ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। দেহাবশেষগুলো ব্যাপকভাবে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া হল। এরপর এর ছাইভস্ম জার্মানির এলবি নদীর উপনদী বিটারিটজ্ নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। আর এভাবেই শেষ হয় হিটলারের রহস্যময় মৃত্যু উপাখ্যান।

(৬) **নেপোলিয়ন :** নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ফ্রান্স সম্রাট নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়েছে, এ নিয়ে বিতর্ক কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু বিতর্ক আছে তিনি কীভাবে মারা গেলেন? কখন মারা গেলেন? তার মতো একজন শক্তিধর মানুষ দক্ষিণ আটলান্টিকের এক পরিত্যক্ত দ্বীপে পাকস্থলীর ক্যান্সারে মারা গেছেন, এমনটি কি ভাবা যায়। বরং ওয়াটারলুর যুদ্ধেই তার মৃত্যু হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। কিংবা তিনি খুন হতে পারতেন কোনো ঈর্ষাপরায়ণ বিদ্রোহীদের হাতে। শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে শত্রুর তলোয়ারের নীচে জীবন দেওয়াই ছিল তার জন্য স্বাভাবিক। কার্যত দেড় দশকের মতো সময় বীরদর্পে ইউরোপ শাসন করে যাওয়া নেপোলিয়ন একটি পুরোপুরি সিক্ত আধ-সেঁকা অন্ধকার এক ঘরে নির্বাসিত অবস্থায় ধীরে ধীরে নিস্তেজ বিবর্ণ হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন। এরপর একসময় মারা গেছেন। অন্তত নেপোলিয়নের বেলায় এমনটি অভাবনীয়, সেই সঙ্গে অকল্পনীয়। ১৮১৫ সালের জুনে ওয়াটারলোর যুদ্ধে পরাজিত হন। ব্রিটিশরা সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে তাকে আটকে রাখে। সেখানে তিনি জীবনের শেষ ছয়টি বছর কাটিয়ে মারা যান। ময়না তদন্তের রিপোর্ট মতে, তিনি পাকস্থলীর ক্যান্সারে মারা যান। তবে সুইডেনের দাঁতের চিকিৎসক ও বিষ বিশেষজ্ঞ স্টেন ফরশুফভুদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানী বরাবর বলে আসছেন, নেপোলিয়নকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। বস্তুত তিনি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বৈপ্লবিক ধারণা। সুসংহত করেছেন ফরাসি বিপ্লবের চেতনা। সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা জুড়ে। আবার এর আট লাখ বর্গমাইলল ছেড়ে দিয়েছেন থমাস জেফারসনের কাছে, মাত্র একরপ্রতি ৬ সেন্টের বিনিময়ে। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছিল যার পেইন্টিং আর মূর্তি, সেই মানুষটির সাধারণ মৃত্যু কল্পনা করা যায় কি! সেজন্যই তার মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা অগ্রহণযোগ্য ইতিহাস ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। সালটা ১৮২০। নেপোলিয়নের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। শরীর দুর্বল, সঙ্গে বমি বমি ভাব। মনে হল, তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। নেপোলিয়নের চিকিৎসকেরা যখন হাডসন লাউইয়ের কাছে একথা জানান তখন হাডসন তা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এসব ইংরেজদের অপপ্রচার। দুজন চিকিৎসক অবশ্য বলেছিলেন, নেপোলিয়ন হেপাটাইটিসে আক্রান্ত, সেই সঙ্গে আছে আমাশয়। ১৮১৯ সালে নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত অনুসারী চিপরিয়ানি কর্সিকান অসুস্থ হয়ে মারা যান। একইভাবে মারা যান লংউড হাউসের আরও দুই ভৃত্য। পরিস্থিতি ছিল রহস্যজনক। দ্রুত এই তিনজনের অসুস্থ হয়ে পড়া ও মারা যাওয়ায় মনে করা হয় তাদের ওপরও বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। নেপোলিয়ন আভাস দিয়েছিলেন, তিনিও এমনটি সন্দেহ করছেন। এবং তিনি আশঙ্কা করছেন, তিনি হতে পারেন এদের টার্গেট। ১৮২১ সালে নেপোলিয়নের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। এবং মাসজুড়ে প্রচণ্ড পেট ব্যথায় ভুগে ৫ এপ্রিল মারা যান। লাশের ময়নাতদন্ত করেন ডাক্তার অ্যান্টোমার্কি ও আরও পাঁচ ইংরেজ ডাক্তার। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তার মৃত্যু পাকস্থলীর ক্যান্সারে। একজন ইংরেজ ডাক্তার বললেন, তার মৃত্যু হেপাটাইটিস সহ পেটের অসুখে। কিছু কর্তৃপক্ষ এটি মেনে নিয়েছেন যে, নেপোলিয়ন ক্যান্সারে মারা গেছেন। কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মেডিক্যাল রিপোর্ট এতটা খতিয়ে দেখা হয়নি। বলা হয়, নেপোলিয়ন নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে তিনি শিকার হয়েছিলেন হেমোরয়েডসের। পাঁচড়া ছাড়াও তার ছিল দীর্ঘমেয়াদি চর্মরোগ নিউরোডারমিটিটিস, রেগে যাওয়ার রোগ, মাইগ্রেন ও প্রস্রাবের জ্বালা সৃষ্টিকারী রোগ ডাইসুরিয়া। ১৯৬৬ সালে একটি মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক লেখায় উল্লেখ করা হয়, এসব রোগের জের হিসাবে তিনি প্যারাসাইটিক রোগ সিসটোসোমিয়াসিসে ভুগছিলেন। অনেক সম্ভাবনা। রহস্যের কুয়াশা আজও কাটল না।

(৭) শেলি : পুরো নাম পার্সে বিশি শেলি তিনি ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডর হরশাম নগরীতে জন্ম নেন। শেলি পৃথিবীর অন্যতম সেরা রোম্যান্টিক কবি। তাঁক কবিতা বারবার মানুষের মন ছুঁয়ে যায়। ১৮২২ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে জলে ডুবে শেলির মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যু রহস্যাবৃত, তাই এখনও অজানা। অনেকে বলে হতাশার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। আবার অনেকে বলেন লর্ড বায়রনের সঙ্গে শত্রুতার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়।

অসামান্য ব্যক্তিদের অতি সামান্য মৃত্যু : আবার এমন অনেক মৃত্যুও দেখা যায় - যাঁরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ তথা অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটেতে জল খায় যাঁদের অঙ্গুলীহেলনে, তাঁদের মৃত্যুই অত্যন্ত সামান্য কারণে। কিছু মৃত্যু বলা যাক—

(১) কৃষ্ণ : যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর কৃষ্ণ-বলরাম সংসার ছেড়ে বনে চলে যান। যাবার সময় অর্জুনের কাছে তিনি তাঁর সারথি দারুককে পাঠিয়ে সকল বিষয় অবগত করান। বনে গিয়ে ইনি যোগাবলম্বনপূর্বক একস্থানে শয়ন করে থাকলেন। ইতোমধ্যে বলরাম দেহত্যাগ করেন। এই সময় জরা নামক এক শিকারী হরিণ মনে করে - কৃষ্ণের পায়ে শরবিদ্ধ করে। এর ফলে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। এই সেই কৃষ্ণ, যিনি কৌরব ও পাণ্ডববংশ নির্বংশ করার মূল নিয়ন্ত্রক, যিনি পুতনা হত্যা-তৃণাবর্ত হত্যা-বৎসাসুর ও বকাসুর হত্যা-কেশী হত্যা-অঘাসুর হত্যা-কালিয়দমন-গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন-কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক কংসবধ-শঙ্খাসুর হত্যা-নরকাসুর হত্যা-শতধম্বাকে হত্যা-জরাসন্ধ হত্যা-শিশুপাল ও শাম্ব হত্যা ইত্যাদি। নানাবিধ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই কৃষ্ণের কী তুচ্ছ পরিণতি!

(২) গৌতম বুদ্ধ : ভক্তরা যাতে খুশি হন, সেই কারণে বুদ্ধ নানা স্থানে উৎসব ও ভোজের আয়োজনে যোগদান করতেন। পেটরোগা গৌতম বুদ্ধ বৈশালী নগরে গণিকা অম্বপালী বা আম্রপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। অম্বপালী বুদ্ধদেব ও তাঁর অনুচরদের প্রচুর ভোজে আপ্যায়িত করে। অম্বপালীর প্রদত্ত ভোজ ভক্ষণ করে বুদ্ধদেবের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়েছিল। তিনি বৈশালীর নিকটবর্তী এক গ্রামে এসে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর কুশীনগরের পথে বুদ্ধদেবকে পাবা গ্রামে চুন্দ নামক একজন কর্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। চুন্দ বুদ্ধ ও তাঁর অনুচর ভিক্ষুদের জন্য পোলাও, শূকরমাদ্দব ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্যের আয়োজন করেছে। শূকরমাদ্দব শূকরমাংস দিয়ে প্রস্তুত রন্ধনদ্রব্য। খাদ্য ভক্ষণের পরপরই বুদ্ধের শরীরে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। চুন্দকে তিনি আদেশ করলেন শূকরমাদ্দব যা এখনও বাকি আছে তা মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই বুদ্ধদেব পেটে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। আরম্ভ হল রক্তপাত। স্পষ্টভাবে না জানা গেলেও সম্ভবত রক্তক্ষরণটা পেট থেকেই হয়েছিল। পাছে চুন্দ কষ্ট পায়, সেই কারণে বুদ্ধদেব চুপিসারে অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু বেশি দূর অবসন্ন শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। গাছের নীচে উত্তরীয় পেতে বুদ্ধদেব শুয়ে পড়লেন। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে তাঁর। জল খেয়ে একটু সুস্থ মনে হতেই পুনরায় কুশীনগরের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আবারও অবসন্নতা শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে থাকল। পুনরায় তিনি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। বুদ্ধকে ঘিরে গ্রামবাসীদের ভিড় বাড়ল। তখন বুদ্ধদেব গ্রামবাসীদের উদ্দেশে নানা উপদেশ দিতে থাকলেন। উপদেশ দিতে দিতে বুদ্ধদেব শান্ত পরিবেশে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কারণ হিসাবে তিনটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়—(১) গুরুভোজনের পর আকস্মিক অসুস্থতা, (২) প্রবল রক্তপাত, প্রবল তৃষ্ণা ইত্যাদি। আজীবক এ সময় কথায় ছিলেন কে জানে!

(৩) হজরত মোহাম্মদ : পুরো নাম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইসলামের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় বিশ্বাসমতে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবি তথা বার্তাবাহক, যাঁর উপর আল কোরান অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার প্রবর্তক। অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা ও বিশেষজ্ঞদের মতে মোহাম্মদ ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা। তার এই বিশেষত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় জগতেই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন। তিনি ধর্মীয় জীবনে যেমন সফল তেমনই রাজনৈতিক জীবনেও। সমগ্র আরব বিশ্বের জাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে তিনি অগ্রগণ্য। বিবদমান আরব জনতাকে একীভূতকরণ তার জীবনের অন্যতম সফলতা।

এহেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তির বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর হিজরি ১১ সালের সফর মাসে মোহাম্মদ মামুলি জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের তাপমাত্রা প্রচণ্ড হওয়ার কারণে পাগড়ির উপর থেকেও উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছিল। অসুস্থতা তীব্র হওয়ার পর তিনি সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আয়েশার কামরায় অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর কাছে সাত কিংবা আট দিনার ছিল, মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি এগুলিও দান করে দেন। বলা হয়, এই অসুস্থতা ছিল খাইবারের এক ইহুদি নারীর তৈরি বিষ মেশানো খাবার গ্রহণের কারণে। অবশেষে ১১ হিজরি সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সন্ধ্যায় ৬৩ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। আয়েশার ঘরের যে স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, জানা যায় পর সেখানেই তাঁকে "দাফন" করা হয়।

(৪) কান্ট : দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে তিনি বিয়ে পর্যন্ত করেননি। স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্য কান্টের যত্নের খামতি ছিল না কোনো। মোজা আটকানোর জন্য বন্ধনী ব্যবহার করলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় তিনি অনেক ভেবেচিন্তে এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এত সাবধানে থেকেও অনেক কষ্ট পেয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

(৫) মোৎসার্ট : পুরো নাম ভলফগাংগ আমাদেউস মোৎসার্ট। তিনি ১৭৫৬ সালে অস্ট্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সঙ্গীতজ্ঞ মোৎসার্ট জীবনে ৬০০ টির উপর কম্পোজিশন রচনা করেছেন, যেগুলি এখনও মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এই ক্ষণজন্মা সঙ্গীত প্রতিভা রিউমেটিক ফিভারে আক্রান্ত হয়ে ১৭৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

(৬) শ্রীনিবাস রামানুজন : রামানুজনকে গণিতবিদ না বলে গণিতের রাজপুত্র বলাই শ্রেয়। আধুনিক বীজগণিতের অন্যতম কর্ণধার শ্রীনিবাস রামানুজন। সারাজীবন পড়ালেখায় তেমন সুবিধা করতে পারেননি, কিন্তু গণিতের প্রতি অদম্য তাঁকে আসীন

করে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের আসনে। খুব ধার্মিক ছিলেন তিনি। যখন তিনি অধ্যাপক হার্ডির সঙ্গে গবেষণার জন্য ক্যাম্ব্রিজে গমন করেন তখন ধর্মরক্ষার জন্য তিনি অতিরিক্ত শীতের মধ্যে পশমি ও চামড়ার পোশাক বর্জন করেন। ফলে ধীরে ধীরে তিনি যক্ষায় আক্রান্ত হন এবং দেশে ফিরে আসেন। ১৯২০ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে গণিতের এই বরপুত্রের মৃত্যু ঘটে।

শেষ বাণী : জীবন-মৃত্যুর মাহেন্দ্রক্ষণে কী বলে যান মানুষ? তাঁর জীবনের শেষ কথাটি কেমন? সাধারণ মানুষরা তো অনেক কথাই বলেন। কে মনে রেখেছে সে কথা হাতে-গোনা কয়েকটি কাছের মানুষ ছাড়া! আর তাছাড়া সাধারণ মানুষের তো সাধারণ কথা! অসাধারণের কথা অমৃত-সমান, তাই না? মৃত্যুকালীন কথাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে - কেউ জীবন ও সংসার, কেউ ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। কেউ কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। কেউ-বা নিজের রোগ-যন্ত্রণা নিয়ে হা-হুতাশ করেন। মৃত্যুর আকস্মিক আগমনে কেউ ভীত হয়ে পড়েন, অর্ধসমাপ্ত কাজ ও পরিজন ফেলে যাচ্ছে বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারলে আমাদের দেশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তুলসীতলা কিংবা গঙ্গার ঘাট কাশী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

(১) ভগবান বুদ্ধ : "বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা'তি"। "অর্থাৎ সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল, অপ্রমাদের সাথে সর্বকার্য সম্পাদন করো। তথাগত বুদ্ধের এই অন্তিম বাক্য সমগ্র বিশ্বের জন্য অতীব সাবধানমূলক বাণী। তাঁর অন্তিম বাণীর "বযধম্মা সঙ্খারা" অর্থাৎ সংস্কারসমূহ ব্যয়শীল বা ক্ষয়শীল এই বাক্যাংশের দ্বারা পরিস্ফুটিত হয়েছে ক্ষয়শীলতা বা ব্যয়শীলতা যেখানে বিদ্যমান তা নিশ্চয়ভাবে অনিত্য। অনিত্যতা দুঃখদায়ক। সুতরাং অনিত্যতা দুঃখ, আর যা দুঃখ দেয় তা আত্ম বা আমার এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

(২) কাজী নজরুল ইসলাম : " ...বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসেনি, আমি নেতা হতে আসিনি-আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম -সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম.."

(৩) স্টিভ জবস : "Oh wow. Oh wow. Oh wow."

(৪) হজরত মোহম্মদ : "নামাজ এবং যাঁরা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর"।

(৫) মাস্টারদা সূর্য সেন : চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির ৫ ঘন্টা পূর্বে লেখা মাস্টারদা সূর্যসেনের শেষ বাণী : "আমার শেষ বাণী আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলছে। এই তো সাধনার সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করার এইতো সময়।

ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার এই তো সময়। কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি। তোমরা আমরা ভাই-বোনেরা তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচত্রহীন আমার এই জীবনের একঘেঁয়েমিক ভেঙে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতে স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবনভর উৎসাহ ভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো সেই স্বপ্নের পেছনে আমি ছুটেছি। জানি না কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমরা বন্ধুরা এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কখনও পিছিয়ে যেয়ো না। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। কখনও হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের হবেই। ভগবান তোমাদের আর্শীবাদ করুন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম ইস্টার বিদ্রোহের কথা কোনও দিনই ভুলে যেয়ো না। জালালাবাদ, জুলখা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময় মনে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদিমূলে যেসব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো। আমাদের সংগঠনে বিভেদ না আসে এই আমার একান্ত আবেদন। যারা কারাগারের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে, তাদের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ। বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে"।

(৬) ভ্যান গগ্ : "আমি এখন বাড়ি যেতে চাই"।

(৭) গ্যেটে : "আলো! আরও আলো!"

(৮) মাইকেল এঞ্জেলো : "জীবনের পথে চলতে গিয়ে দুঃখ পেলে যিশু বেদনার কথা মনে কোরো"।

(৯) স্যর আইজাক পিটম্যান : " কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তাহলে বোলো, আমি যেন নতুন কাজের সন্ধানে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে গিয়েছি মাত্র"।

(১০) জিশু : "ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?"

(১১) সক্রেটিস : "অমুকের কাছ থেকে একটা মোরগ ধার করেছিলাম, মনে করে সেই ঋণটা শোধ করে দিয়ো"।

(১২) ঔরঙ্গজেব : "আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি, জানি না তার জন্য কী শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে"।

(১৩) চতুর্দশ লুই : ভৃত্যদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : "তোরা কাঁদিস কেন? তোরা কি ভেবেছিলি যে আমি অমর?"

আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। আমিই প্রথম মৃত্যুকে বিষয় হিসাবে নিয়ে প্রবন্ধ লিখছি না। আমার আগে অনেক মানুষ মৃত্যু বিষয়ে বইপত্র লিখেছেন। আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। বইগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করে আর কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। আপনারা যাঁরা পড়তে আগ্রহী তাঁদের জন্য শিরোনামগুলি উল্লেখ করলাম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা হল কিছু অত্যধিক জনপ্রিয় বই — "এমব্রেসড বাই দ্য লাইট", "হাউ উই ডাই", "দ্য টিবেটান বুক অফ লিভিং অ্যান্ড ডাই", "এ নেসেসারি এন্ড", "সেভড্ বাই দ্য লাইট", "ফাইন্যাল গিফট", "ফাইন্যাল একজিট", "লাইফ আফটার লাইফ", "রি-ইউনিয়নস : ভিশনারি এনকাউন্টারস উইথ ডিপার্টেড লাভড ওয়ানস্", "মেলোনি ডাইজ", "নাথিং টু বি ফ্রাইটেন্ড অফ" ইত্যাদি।

এবার উপসংহার টানার সময় হয়েছে। সহায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "কত অসংখ্য কত বিচিত্র জগৎ আছে, তাহা একবার মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া দেখা হউক দেখি! আমার কথা হয়তো অনেকে ভুল বুঝিতেছেন। অনেকে হয়ত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র একটি একটি গণনা করিয়া জগতের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু আমি আর এক দিক হইতে গণনা করিতেছি। জগৎ একটি বই নয়। কিন্তু প্রতি লোকের এক একটি যে পৃথক জগৎ আছে, তাহাই গণনা করিয়া দেখ দেখি! কত সহস্র জগৎ! কত সহস্র জগৎ! আমি যখন রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছটফট করিতেছি তখন কেন জ্যোৎস্নার মুখ ম্লান হইয়া যায়, ঊষার মুখেও শ্রান্তি প্রকাশ পায়, সন্ধ্যার হৃদয়েও অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে? অথচ সেই মুহূর্তে কত শত লোকের কত শত জগৎ আনন্দে হাসিতেছে! কত শত ভাবে তরঙ্গিত হইতেছে! না হইবে কেন? আমার জগৎ যতই প্রকাণ্ড, যতই মহান হউক না কেন, "আমি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকণার উপর তাহার সমস্তটা গঠিত। আমার সহিত সে জন্মিয়াছে, আমার সহিত যে লয় পাইবে। সুতরাং আমি কাঁদিলেই সে কাঁদে, আমি হাসিলেই সে হাসে। তাহার আর কাহাকেও দেখিবার নাই, আর কাহারও জন্য ভাবিবার নাই। তাহার লক্ষ তারা আছে, কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য। এক জন লোক যখন মরিয়া গেল, তখন আমরা ভাবি না যে একটি জগৎ নিভিয়ে গেল। একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌর-পরিবার গেল, একটি তরুলতাপশুপক্ষী-শোভিত পৃথিবী গেল"।

বেশ্যা-বৃত্তান্ত

"বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতির্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ" (বেশ্যাগণের পুরুষগ্রেহণ প্রবৃত্তি বা পুরুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অর্থার্জন সেই সৃষ্টিকাল থেকে চলে আসছে।) - এহেন কথাই বাৎস্যায়ন তাঁর বিরচিত "কামসূত্র" গ্রন্থের চতুর্থ অধিকরণে অবহিত করেছেন। "কামসূত্র", বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থে চতুর্থ অধিকরণটি বরাদ্দ করেছেন বৈশিকদের জন্য। বৈশিক কারা? আসলে বেশ্যাদেরই "বৈশিক" বলা হয়। বেশ্যার অসংখ্য প্রতিপরিচয়, যেমন — পতিতা, বারাঙ্গনা, দেহপসারিণী, দেহপোজীবিনী, রক্ষিতা, খানকি, বারবনিতা, উপপত্নী, জারিণী, সাধশরণী, মহানগ্নী, পুংশ্চলী, পুংশ্চলূ, অতীত্বরী, বিজর্জরা, অসোণ্ড, অতিষ্কন্দরী, গণিকা এবং হাল আমলের যৌনকর্মীও বোঝায়। ইংরেজিতে যার প্রতিশব্দ Domi-monde বা Public Women। Hatairai, Aspasia, Phrynes ইত্যাদি আদিম এবং প্রাগৈতিহাসিক নামও আছে। আরও তিনটি আধুনিক বিশেষণ ঃ Pornstar, Call Girl, Escort Girl.

প্রসঙ্গত বলি, বিশেষ এই পেশার মেয়েদের যে নাম বা যে বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে সেগুলি সবই পেশার রকমফেরের উপর ভিত্তি করেই। সবকটি বিশেষণের ব্যাখ্যা দেওয়া মানে কলেবর বৃদ্ধি করা। তথাপি যেহেতু প্রবন্ধটির শিরোনামে "বেশ্যা" শব্দটি ব্যবহার করেছি (গোটা প্রবন্ধে আমি "বেশ্যা" শব্দটিই উল্লেখ করব), সেইহেতু এই শব্দটিই দেখব কীভাবে পাওয়া যায়।

ভিন্টারনিৎসের মতে ঋগবেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬তম সূক্তের অন্তর্গত পঞ্চম ঋকে যে "বিশ্যা" শব্দটি আছে তার থেকেই নাকি "বেশ্যা" কথাটির উৎপত্তি। ঋকটি হল ঃ "সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐযন্ত পূজাঃ"। ভিন্টারনিৎস ঠিক না বেঠিক, সে ব্যাপারে এই ভারতের কোনো বেদবেত্তা পণ্ডিত কোনো আপত্তি করেছেন বলে জানা নেই।

বেশ্যাবৃত্তির শুরুটা ঠিক কবে থেকে? বেশ্যাবৃত্তির প্রসঙ্গ উঠলেই সবাই বলে "আদিম পেশা"। "আদিম" মানে কী? আদিম জাতি বলতে আমরা সেই সময়ের মানুষের কথা বুঝি, যখনন তারা পোশাকের ব্যবহার জানত না। বেশ্যাবৃত্তি ঠিক তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় সমাজে বেশ্যাবৃত্তি শুরু হয়েছে পোশাকের ব্যবহার জানার অনেক পর। নাগরিক-সভ্যতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ্যাবৃত্তির সূত্রপাত। নাগরিক জীবন শুরু হল বহির্দেশীয় মানুষদের অনুপ্রবেশ বা আগমনের পর, ভারতে যাঁরা "আর্য" পরিচিত। এই বহির্দেশীয়রাই ভূমিকন্যাদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করত। ধনশালী, বলশালী ও উচ্চস্তরের সাদাবর্ণের মানুষগুলো ভূমিকন্যা বা অনার্য কন্যাদের সঙ্গে শারিরীক স্তি হলেও স্বীকৃতি দেয়নি। অনার্য-কন্যাদের সঙ্গে শোওয়া যায়, কিন্তু গ্রহণ করা যায় না। আর তাই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যত যুদ্ধের

কাহিনি পাওয়া যায়, তার সবই আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কাহিনি। আর্যের জয়, অনার্যের পরাজয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের নামে আর্যদের দাদাগিরির কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে মনুসংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি তথাকথিত শাস্ত্রগুলিতে। মনুসংহিতায় এইভাবেই পেয়ে যাই হাজারো জারজ সন্তান। আর্যরা ধর্ষণ করলে অনার্যদের শাস্তির বিধান ছিল। আর্যদের চাইতে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় আদি অনার্যরা সমরাস্ত্রের দিক থেকে কমজোরী ছিল। তারা আর্যদেরর মতো তির-ধনুক, বর্শা, ছোরা, কুঠার ব্যবহার করলেও আর্যদের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ ও কবচের ব্যবহার জানত না। তাই বারবার পরাজয় ঘটেছিল। অসুর, দৈত্য, রাক্ষস-খোক্ষস তকমা পেয়ে বহু সহস্র অনার্য পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। আর অনার্যদের অসহায় রমণীরা আর্যদের দাসী ও যৌনসঙ্গী বা রক্ষিতা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এদেরই একটা বড়ো অংশ যৌনজীবিকার পথ বেছে নিল। সেইসব রমণীরা বুঝল নারী-শরীরের প্রতি পুরুষদের লালসা তীব্র। অতএব এই শরীর মাগনা কেন, মূল্য দিতে হবে।

এরপর যখন সমাজে রাজতান্ত্রিকতার উন্মেষ ঘটেছিল, তখন এইসব রমণীদের শত্রু নিধন এবং গুপ্তচরবৃত্তির কাজে লাগানো হত। বিশিষ্ট্য অতিথি, অমাত্য এবং অপরাপর উচ্চধনীবর্গদের নারী-শরীর উপঢৌকন দিতে হত। বলা যায়, ঠিক এই সময় থেকেই বেশ্যাবৃত্তি রাষ্ট্রানুমোদিত হয়ে যায়। এই বৃত্তি তখন থেকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে পুষ্ঠ হতে থাকে।

অবশ্য প্রচলিত অর্থে বেশ্যা বা গণিকা বা পতিতা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন ভারতে এইসব রমণীরা তেমনটা ছিলেন না। স্বয়ং দেশের রাজা গণিকাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বার্ষিক ১০০০ পণ বেতন দিয়ে রাজা তাঁর প্রাসাদে গণিকাদের নিয়োগ করতেন। গণিকা বা বেশ্যাদের আয়ের একটা অংশ "কর" হিসাবে রাজার কোষাগারে সংগৃহীত হত। প্রাচীন ভারতে গণিকারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। তদুপরি বেশ্যাদের ঘরে যেমন জ্ঞানী-গুণীদের আলোচনা-সভা বসত, আবার প্রাচীন ভারতেও এমন জ্ঞানী-গুণীদের এবং শিক্ষাব্রতীদের বেশ্যালয় ছিল প্রধান আখড়া। আরও জানা যায়, প্রাচীনকালে বেশ্যালয়ে বা গণিকালয়ে গমন খুব একটা গোপনীয় বা লজ্জাকর ছিল না। সেযুগের নাগরিকরা বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দিনে-দুপুরে বেশ্যালয়ে যাতায়াত করতেন।

প্রাচীনকালে বহুভোগ্য নারীদের নানাবিধ নামে উল্লেখ করা হত বেশ্যাবৃত্তির চরিত্রানুসারে। তাই প্রত্যেকটি নামের মাহাত্ম্যও স্বতন্ত্র। যদিও মোটিভেশন একই, সকলেরই পেশা শরীর বিক্রি করা। প্রাচীনকালে "গণিকা" বলতে বোঝাত বহুভোগ্যা নারীকেই। গণ বা দলবদ্ধ হয়ে যে নারী যাপন করে তিনিই গণিকা। অনুরূপ "বেশ্যা" বলতে বোঝাত, যে নারী বেশ বা সাজসজ্জা দ্বারা পুপরুষদের প্ররোচিত করে প্রলোভিত করে তাঁরাই বেশ্যা।

আবার ‘বেশ’ শব্দের আদি অর্থ হল বাসস্থান, এই বিশেষ বাসস্থানে যে নারী বাস করেন তিনিই বেশ্যা। “পণ্যঙ্গনা” বলা হত সেই নারীদের, যে নারীদের পণের বাজি রেখে সম্ভোগ করা হত। “বারস্ত্রী” তাঁরাই, যে নারীরা যুগপৎ মন্দিরের সেবাদাসী ও রাজা ও আমাত্য মর্যাদার রাজকর্মচারীদের ভোগ্যা হতেন। পরিচারিকা বা ক্রীতদাসী রক্ষিতারা হলেন “ভুজিয়া”। যে নারীর চরিত্রের পতন হয়েছে তিনি “পতিতা” ইত্যাদি। অনুমান করা হয়, প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের দৌলতেই ‘পতিতা’ শব্দটি বেশ্যার সুভাষণরূপে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ সালে লেখা ‘বিচারক’ গল্পে রবীন্দ্রনাথও দেখছি ব্যবহার করেছেন। সমর সেন ‘গণিকা’ শব্দটিই বেশি ব্যবহার করতেন। “প্রবাসী” পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় বারবার ‘বেশ্যা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিককালে গণিকা বা বারবনিতাদের মতো “যৌনকর্মী” শব্দটিও একটি জীবিকাকে বর্ণনা করে। “যৌনকর্মী” শব্দটি যেন তাঁদের জীবিকাকে আরও বেশি করে চিহ্নিত করে।

বর্তমানে ধাত্রীবিদ্যা, উদ্যানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি যেমন নানা শিক্ষা আছে, ঠিক তেমনই সেকালে গণিকাবিদ্যাও ছিল এমনই এক শিক্ষণীয় বিষয় এবং সেই শিক্ষা একেবারেই নিন্দনীয় ছিল না। এ বিষয়ে পৃথক বিদ্যালয়ও ছিল। রীতিমতো পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন দ্বারা আগামীদিনের গণিকাদের এইসব শিক্ষালয় থেকে উত্তীর্ণ হতে হত। নৃত্য-গীতবাদ্য ছাড়াও চিত্রকলা, জ্যোতিষশাস্ত্র, অভিনয়, রন্ধনবিদ্যা, ভাষাশিক্ষা, লিখন, মার্জিত ভাষায় কথা বলা, মালাগাঁথা ইত্যাদি এরকম ৬৪ কলায় পারদর্শী করে তোলা হত। ৬৪ কলায় সুশিক্ষিতা রূপবতী বেশ্যা বা গণিকারাই জনসমাজে মর্যাদাপ্রাপ্ত হতেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞা অনুযায়ী, বেশ্যাবৃত্তি হল স্বামী বা বন্ধুকে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে নগদ অর্থ বা অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে বাছবিচারহীনভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া। তসলিম নাসরিন এই পেশা সম্বন্ধে বলেন, “এটাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা বলে লোককে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা হয় বটে, আসলে এটা কিন্তু প্রাচীনতম পেশা নয়, এটা বরং মেয়েদের বিরুদ্ধে ‘পৃথিবীর প্রাচীনতম নির্যাতন’”। এই পণ্য-দুনিয়ার নারী-মানুষকে পণ্য করার নেটওয়ার্কগুলির জোয়ার প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। আর এই সুনামির মূল প্রতিপাদ্য যৌন-বাণিজ্য ও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মুনাফা। বাৎসায়নের “কামসূত্র”-এ বৈশিকাখ্যং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, “রুচি হইতে যে পুরুষগ্রহণপ্রবৃত্তি তা স্বাভাবিক আর অর্থার্জনার্থ যে প্রবৃত্তি তা কৃত্রিম”। বাৎসায়ন উল্লিখিত “অর্থার্জনার্থ” এই কৃত্রিম প্রবৃত্তিই নিন্দার্হ। এই বেশ্যাপ্রবৃত্তিই বর্তমান বিশ্বে এক নম্বরের বাণিজ্য-উপজীব্য, অনেক দেশের রাজকোশের অর্থের বেশ্যাপ্রবৃত্তিই প্রধান উৎস। কৌটিল্য বিভিন্ন কারণে যৌনব্যবসাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অবৈধ নারীসংসর্গ বোঝাতে তিনি ‘বাহ্যবিহার’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই ‘বাহ্যবিহার’-এর

পক্ষে বা বিপক্ষে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি কৌটিল্য। বাৎসায়ন বলেছেন, গণিকা অথবা বিধবাদের সঙ্গে দেহসম্ভোগ সমর্থন করা হয় না, আবার নিষিদ্ধও নয়।

সমাজবিদ লেকির মতে, গণিকাবৃত্তি হল সমাজের মাত্রাতিরিক্ত যৌনকামনা বেরিয়ে যাওয়ার একটি সেফটি-ভালভ। লেকি মনে করেন, নিজে মূর্তিমতী পাপীষ্ঠা হলেও পরিণামে পুণ্যের অধিকারিণী এই গণিকা। এরা না-থাকলে সংখ্যাহীন সুখী পরিবারের প্রশ্নাতীত পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেত। তাহলে কি চিরটাকাল সমাজের বিষ-ক্লেদ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠী হয়ে থেকে যাবে গণিকাশ্রেণি! নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন একটি ব্লগে লিখতে গিয়ে বলেছেন - "ক্রীতদাসপ্রথার সঙ্গে পতিতা প্রথার মূলত কোনো পার্থক্য নেই। ক্রীতদাসরা যখন তুলো ক্ষেতে চাশের কাজ করত, দাসমালিকরা প্রায়ই সশরীরে উপস্থিত হয়ে কিছু ক্রীতদাসীকে যৌনকর্মের জন্য তুলে নিয়ে যেত। ত্বক যাদের একটু কম কালো, সাধারণত তাদেরকেই পছন্দ করত। বাজারে নিয়ে যৌন-ব্যবসার জন্য ভাড়া খাটাত, নয়তো সরাসরি পতিতালয়েই তাদের নগদ টাকায় বিক্রি করে দিত। আঠারো-উনিশ শতকে যে প্রথাটিকে বলা হত ক্রীতদাস প্রথা, বিংশ-একবিংশ শতকে সেই প্রথাকে বলা হচ্ছে পতিতা প্রথা"।

অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বিক্রির ইতিহাস সুপ্রাচীন। ওয়েবস্টার অভিধান মতে, সুমেরিয়ানদের মধ্যেই প্রথম পবিত্র পতিতার দেখা মেলে। প্রাচীন গ্রন্থাদিসূত্রে, যেমন ইতিহাসের জনক হিসাবে খ্যাত হিরোডেটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০/২০)-এর লেখায় এই পবিত্র বেশ্যাবৃত্তির প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেটি প্রথম শুরু হয়েছিল ব্যাবিলনে। সেখানে প্রত্যেক নারীকে বছরে অন্তত একবার করে যৌনতা, উর্বরতা ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে যেতে হত এবং সেবাশুশ্রুষার নমুনা হিসাবে নামমাত্র মূল্যে যৌনসঙ্গম করতে হত একজন বিদেশীর সঙ্গে। এরকমই বেশ্যাবৃত্তির চর্চা হত সাইপ্রাস এবং করিন্থেও। এটি বিস্তৃত হয়েছিল সার্দিনিয়া এবং কিছু ফিনিশীয় সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে ইস্টার দেবতার সম্মানে। ফিনিশীয়দের মাধ্যমে ক্রমশ এটি ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য বন্দর শহরগুলিতেও সংক্রমিত হয়, যেমন সিসিলি, ক্রটন, রোসানো ভাগলিও, সিক্কা ভেনেরিয়া এবং অন্যান্য শহরে। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় এশিয়া মাইনর, লাইদিয়া, সিরিয়া ও এট্রাকসনের প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজে বেশ্যা বা পতিতারা ছিলেন স্বাধীন এবং তাঁরা বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করা ও কর দেওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিল।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" থেকে পতিতা ও পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত ভারতবর্ষীয় চিত্র পাওয়া যায়। কী বলছে অর্থশাস্ত্র? অর্থশাস্ত্র বলছে দেহব্যাবসা একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথা। পুরোপুরি ঘৃণিত বা গোপনীয় নয়। কৌটিল্যের সময় দেহব্যাবসা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয় বলে জানা যায়, যে শিল্পের নাম ছিল বৈশিক কলা। বিশেষজ্ঞরা এ শিল্পের চর্চা করতেন এবং

শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়ে গণিকাধ্যক্ষেরও উল্লেখ আছে। এখানে মৌর্য সামাজ্যের সময়কার বহু পুরুষগামী বারাঙ্গনা নারীদের হাল-হকিকৎ প্রাসঙ্গিক একটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গণিকাধ্যক্ষের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গণিকাদের সংগঠিত ও দেখভাল করা। গণিকাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করতেন দেশের রাজা। গণিকাধ্যক্ষের আর-একটা প্রধান কাজ ছিল গণিকাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখা। কোন্ গণিকার দিনে কত খরিদ্দার আসছে, খরিদ্দার-পিছু পারিশ্রমিক কত, উপরি পাওনা কী এবং কত, তার ব্যয়ই-বা কত - সে সবকিছুই জাবেদা খাতায় নথিভুক্ত করত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কোনো গণিকা যদি তাঁর বৃত্তি ছেড়ে চলে যায় অথবা কোনো কারণে মারা যায়, তাহলে তাঁর মেয়ে বা বোন তাঁর বৃত্তি গ্রহণ করবে। এই কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তিরও সে মালিক হবে। অথবা সেই মৃতা কিংবা বৃত্তিত্যাজা গণিকার মা তাঁর শূন্যস্থান অন্য কোনো যোগ্য মেয়ে দ্বারা পূরণ করতে পারবে। যদি সেই মৃতা কিংবা বৃত্তিত্যাজা গণিকার মেয়ে বা বোন বা মাতৃনিযুক্ত পতিগণিকানা-থাকে সেক্ষেত্রে তাঁর ত্যাজ্য ধন রাজকোশে জমা পড়বে।

কৌটিল্যের সময়ে গণিকাদের তিনভাবে ভাগ করা হত। যেমন - কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কোন্ গুণাবলি বিবেচনা করে এই বিভাজন? বিভাজন হত কোন্ গণিকার কীরকম রূপ, কীরকম শারীরিক গঠন, কীরকম বয়স - সব মিলিয়ে তাঁর পুরুষ আকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের ক্ষমতা কতোখানি এসব দেখে তাকে উত্তম, মধ্যম বা কনিষ্ঠ শ্রেণীর গণিকার স্বীকৃতি দেওয়া হত। এই স্বীকৃত বা সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল একমাত্র গণিকাধ্যক্ষের। কনিষ্ঠ শ্রেণির গণিকার বেতন ছিল ১০০০ পণ, মধ্যম শ্রেণির গণিকার ২০০০ পণ এবং উত্তর শেণির গণিকার বেতন ছিল ৩০০০ পণ। সেসময় কোনো রাজকুলে নিযুক্ত গণিকা যদি রাজসেবা থেকে কোনো কারণে মুক্তি চাইত তাহলে তাঁকে রাজাকে ২৪,০০০ পণ মুক্তিমূল্য দিতে হত। এমনকি গণিকাদের সন্তানদের দাসত্ব (গণিকার সন্তানরা রাজার "দাস" হিসাবে গণ্য হত) থেকে মুক্তি পেতে ১২,০০০ পণ নিষ্ক্রয় দিতে হত। গণিকাদের কাছ থেকে শুধুই নিঙড়ে নিতে ভাবছেন যাঁরা তাঁদের বলি, শুধু নিঙড়ে নেওয়া নয় নিরাপত্তার ব্যাপারটাও কঠোরভাবে দেখা যেত। যেমন - কোনো কামনারহিত কোনো বেশ্যা বা গণিকাকে কোনো পুরুষ (খরিদ্দার) তাঁর ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখে, অথবা কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখে এবং তাঁর শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করে, দাঁত দিয়ে তাঁর বিশেষ বিশেষ স্থানে আঘাত করে তাঁর রূপ নষ্ট করে - তাহলে সেই পুরুষপুঙ্গবটিকে ২৪,০০০ পণ এবং প্রয়োজনে ৪৮,০০০ পণ পর্যন্ত জরিমানা দিতে হত। এখানেই শেষ নয়, যে গণিকা রাজার ছত্র, ভৃঙ্গার (জল ছিটানোর ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ) বহনের কাজে নিযুক্ত হয়েছে তাকে কোনো মারধোর করলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত পুরুষটিকে ৭২,০০০ পণ অর্থদণ্ড করা হত। তবে গণিকাদেরও শাস্তি বা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যেমন — (১) রাজার আজ্ঞা বা আদেশ সত্ত্বেও যদি কোনো

বেশ্যা গণিকা কোনো বিশেষ গুরুষের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় আপত্তি জানায়, তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট বেশ্যাকে ১০০০ চাবুক মারার রীতি ছিল। কখনো-কখনো ৫০০০ পণ পর্যন্ত গুণগারি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। (২) যদি কোনো পুরুষের কাছ থেকে যৌনমিলন করার শর্তে অগ্রিম অর্থ নিয়ে দুর্ব্যবহার করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট গণিকাকে অগ্রিম অর্থের দ্বিগুণ পুরুষটিকে ফেরত দিতে হবে। (৩) যদি কোনো বেশ্যা কোনো পুরুষের কাছ থেকে যৌনমিলন করবে এই শর্তে রাত্রিযাপনের কোনোরূপ আগাম অর্থ নিয়েও যৌনমিলন না-করে, তাহলে উক্ত পুরুষ বা খরিদ্দার বেশ্যাটিকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিল তার ৮ গুণ অর্থ ফেরত দিতে হবে। (৪) কোনো গণিকা যদি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে কোনো পুরুষকে হত্যা করত, তাহলে সেই মৃত পুরুষের জ্বলন্ত চিতায় খুনী গণিকাকেও পুড়িয়ে মারার বিধান রেখেছিলেন অর্থশাস্ত্রের স্রষ্টা।

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে, বিশেষ করে ৩৬ টি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে প্রচুর বেশ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা "স্বর্গবেশ্যা" হিসাবে বিশেষ পরিচিত। যেমন — বিশ্বাচী, পঞ্জিকাস্থলা, সরলা, বিদ্যুৎপর্ণা, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুকেশী, মঞ্জুঘেষা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্ণা, সুবাহু, সুপ্রিয়া উল্লেখযোগ্য। — এরকম কয়েক ডজন স্বর্গবেশ্যার নাম আমরা পাই। সংস্কৃত শব্দ অপ্ (বাংলা অর্থ জল) হতে এদের উৎপত্তি তাই এদের অপ্সরা বলা হয়। আসলে এরাই স্বর্গবেশ্যা বলে পরিচিত। এরা নৃত্যে-সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। এই কারণেই প্রাচীন সাহিত্যে এদের ইন্দ্রের সভা গায়িকা ও নর্তকী হিসাবে দেখা যায়। অপ্সরাদের অধিপতি ছিলেন কামদেব। অপ্সরা বা স্বর্গবেশ্যাদের সংখ্যা মোটামুটি ৬০ কোটি। দেবাসুরের সমুদ্র স্নানের সময়ে এরা সমুদ্রের ভিতর থেকে অসংখ্য নারীর সঙ্গে উঠে আসেন। কিন্তু কোনো দেবতা ও দানবই তাদের গ্রহণ করতে রাজি হননি, কিন্তু পণ্য হতে কারোর বাধা ছিল না। প্রভাবশালী মানুষদের যৌনসুখ বিতরণ করে তাঁদের বিভ্রান্ত করাই ছিল এদের একমাত্র কাজ। তথাকথিত দেবতারা যখনই আসন্ন বিপদের গন্ধ পেতেন তখনই এইসব পরমা সুন্দরী বেশ্যানারীদের কাজে লাগাতেন। এরা মুনি-ঋষিদের ধ্যান নষ্ট করতেন। কিন্তু কেন দেবতারা এই বেশ্যাদের মুনি-ঋষিদের বিবশ করার কাজে লাগাতেন? কারণ হল বৈদিক যুগে কঠোর তপস্যার বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুনি-ঋষিরা দেবতাদের চাইতেও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। যাতে তারা দেবতাদের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে না পারে তাই তারা বেশ্যাদের লেলিয়ে দিতেন। শকুন্তলার জন্ম হয় বিশ্বামিত্র নামক ঋষির ধ্যানভঙ্গের কারণে। হিন্দু ধর্ম মতে ব্রাহ্মণগণ কঠোর তপস্যার ফলে তেবদা পর্যায়ে চলে যেতে পারতেন। বিশ্বমিত্র ঠিক তেমনই একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তার উপর দেবতা ইন্দ্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই দেবতা ইন্দ্র তাকে ঈর্ষা করতেন, ইন্দ্র অনেক সময় তাকে ভয়ও করতেন। কারণ তিনি যদি দেবতাতুল্য হয়ে যান তবে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে এসে বিশ্বমিত্র হানা দিতে পারেন। দেবতা ইন্দ্র তার এই তপস্যা ভঙ্গের জন্য ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত হন। আর এই ষড়যন্ত্রে ইন্দ্র স্বর্গবেশ্যা মেনকাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। বিশ্বমিত্রের তপস্যাতে দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে তার ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য দেবতারা মেনকাকে পাঠায়। পবনদেবের প্ররোচনায় মেনকার শরীর থেমে সমস্ত বস্ত্র খুলে পড়ে। নৃত্যরত নগ্ন মেনকার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সংযম হারিয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়, ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়।

রম্ভা স্বর্গবেশ্যাদের মধ্যে অন্যতম। রম্ভাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি মিথ পাওয়া যায় পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল — (১) রম্ভা কুবেরের পুত্র নবকুলের নিকট অভিসার গমন কালে রাবণ তাকে দেখে কামমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাই রাবণ তাকে ধর্ষণ করেন। রম্ভা নবকুলকে এই ঘটনা বললে নবকুল রাবণকে অভিশাপ দেন, যদি রাবণ কোন নারীর অনিচ্ছায় তার প্রতি বল প্রয়োগ করে ধর্ষণ করতে গেলে রাবণের মাথা সাত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। এই জন্যই সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হয়েও নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন। (২) একবার ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভা শিলাতে পরিণত হয়ে ১০০০ বছর অবস্থান করেন। তখন ওই আশ্রমে শিলারূপে বাস করছিলেন তখন অঙ্গকার নামে একজন রাক্ষসী সেখানে নানা উপদ্রব করতে আরম্ভ করেন। তখন ওই আশ্রমে তপস্যারত শ্বেমুনি বায়ব্য অস্ত্রে ওই শিলাখণ্ড দুই ভাগে ভাগ করে রাক্ষসকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপ করেন। অস্ত্রের ভয়ে ভীত হয়ে রাক্ষসী পলায়ন করে কপিতীর্থে এলে তার মাথায় সেই শিলাখণ্ড পড়ে রাক্ষসের মৃত্যু হয়। এই শিলাখণ্ড কপিতীর্থে নিমগ্ন হলে রম্ভা আবার নিজের রূপ ফিরে পান। (৩) ইন্দ্র সভায় নৃত্যকালে রম্ভার তালভঙ্গ হয়। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভাকে অভিশাপ দেন, রম্ভা স্পন্দনহীন বিকলাঙ্গ হয়ে ভূতলে পতিত হন। পরে নারদের পরামর্শে শিবের পুজো করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। (৪) ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা জাবালি মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে রম্ভার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জাবালি এই কন্যার প্রতিপালন করেন; এই কন্যার নাম ফলবতী।

তিলোত্তমা দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মা এদের অমরত্বের বরদান করতে সম্মত হননি। তবে তিনি বলেন যে, স্থাবর-জঙ্গমের কোনো প্রাণী তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। যদি এদের মৃত্যু হয় তবে পরস্পরের হাতেই হবে। এই বর পাওয়ার পর তারা দেবতাদের উপর নিপীড়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন দেবতারা প্রাণ রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন এদের নিকেশ করার জন্য। ব্রহ্মা এদের নিকেশ করার জন্য পরমা সুন্দর এক রমণীয় সৃষ্টি করলেন। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল

করে সংগ্রহ করে ব্রহ্মা এক অতুলনীয়া নারী সৃষ্টি করেন। তিল তিল সুন্দর বস্তু মিলিত হয়ে এই সুন্দরী সৃষ্টি হয়েছিল বলে এর নাম হয় তিলোত্তমা। তিলোত্তমাকে সৃষ্টির পর ব্রহ্মা সুন্দ ও উপসুন্দরের নিকট পাঠিয়ে দেন। স্বর্গবেশ্যা তিলোত্তমা এদের দুজনের সামনে নগ্ন হয়ে নৃত্য করতে করতে থাকে। সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফলে একে অন্যের হাতে নিহত হন।

উর্বশীও একজন পরমা সুন্দরী স্বর্গবেশ্যা। অভিশাপের ফলে উর্বশী মানুষরূপে জন্ম নেন। স্বর্গবেশ্যা উর্বশীকে দেখে বুধপুত্র পুরূষরা প্রেমাসাক্ত হয়। দুজন দুজনের প্রেমে মগ্ন। উর্বশীকে ছাড়া পুরূরবার চলে না। উর্বশী কয়েকটি শর্তে পুরূরবাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তটি হল — উর্বশী যেন কোনো দিন স্বামী পুরূরবাকে নগ্ন অবস্থান না দেখেন। যদি দেখেন তবে সেদিনই উর্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করবেন। পুরূরবা উর্বশীর সকল শর্ত মেনে নিয়ে বিয়ে করে। সুখেই তাদের দিন কাটছিল। এদিকে স্বর্গের দেবতারা উর্বশীকে ফিরিয়ে আনতে উঠেপড়ে লাগলেন। এক রাতে বিশ্বাবসু উর্বশীর প্রিয় দুটি মেষ চুরি করেন। পুরূরবা মেষদুটি উদ্ধার করতে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থাতেই বিছানা থেকে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক তখনই বিদ্যুতের প্ররোচনায় রাতের অন্ধকার ক্ষণিকের জন্য দূর হয়, সেই ক্ষণকালেই উর্বশী চোখের সামনে নগ্ন পুরূরবা প্রকট হয়ে পড়ে। শর্তমতে তখনই উর্বশী পূরূরবাকে ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে যান। শোকাহত পুরূরবা পাগলের মতো উর্বশীর সন্ধানে দেশবিদেশে ঘুরে-বেড়ায়। অনেকদিন পর অবশ্য সে অপ্সরারূপে উর্বশীর দেখা পায়। চরিত্রবান পুরূরবা বর হিসাবে উর্বশীর সঙ্গে পুরো জীবন কাটাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেলে দেবতারা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন এবং স্বর্গলোকে স্থান দেন।

স্বর্গের আরও একজন প্রসিদ্ধ স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী। ইনি ইন্দ্রের আদেশে নিজের নগ্ন রূপ দেখিয়ে বহু মুনিদের তপস্যা ভঙ্গ করেছেন। ঘৃতাচীকে দেখে ভরদ্বাজ ঋষির শুক্র স্খলিত হওয়ায় দ্রোণের জন্ম হয়। তাই দ্রোণের মাতা না হলেও তাঁর জন্মের মূলে ছিলেন ঘৃতাচী। চ্যাবন ও সুকন্যার পুত্র প্রমতির সঙ্গে ঘৃতাচীর মিলনে রুরুর জন্ম হয়। একবার ব্যাসদেব সুমেরু পর্বত থেকে নিজ আশ্রমে ফিরে একবার যখন হোমের আয়োজন করছিলেন, সে সময় ঘৃতাচী উপস্থিত হন। ঘৃতাচীকে দেখে ইনি অত্যন্ত কামাবিষ্ট হন। ব্যাসদেবের এরূপ অবস্থা দেখে ঘৃতাচী শুকপাখির রূপ ধরে পলায়ন করেন। কিন্তু ব্যাসদেবের প্রবল কামনার কারণে তাঁর বীর্যস্খলন হয় এবং তা অরণির উপর পতিত হয়। ব্যাসদেব উক্ত অরণি মন্থন করতে থাকলে একটি পুত্রের জন্ম হয়। ঘৃতাচী শুকপাখির রূপ ধরে পলায়ন করেছিলেন বলে ব্যাসদেব এর নাম রাখেন শুক।

এইসব বেশ্যারা ছিলেন অনন্তযৌবনা, তাই “দেবরাজ” ইন্দ্র গুপ্তচরবৃত্তি এবং গুপ্তহত্যার

কাজে নিয়োগ করতেন। রামায়ণে তো প্রচুর বেশ্যা এবং গুপ্তচর বৃত্তির কাজে রূপাজীবা নিয়োগের কথা উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় প্রচুর বেশ্যা অংশগ্রহণ করেছিল। রামায়ণের যুগে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় এ রাজপরিবারের মানুষদের মৃগয়ায় বেশ্যা বা গণিকাদের নিয়োগপ্রথা চালু ছিল। গণিকা কর্তৃক ঋষ্যশৃংগের প্রলোভন আখ্যান রামায়ণে সুখ্যাত হয়ে আছে। মহাভারতের যুগে "বিষকন্যা" নামক এক শ্রেণির সুন্দরী গণিকাদের কথা জানা যায়। এরা খুনে গুপ্তচর বাহিনীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কাজ ছিল - যৌনসম্ভোগকালে ওষ্ঠ-চুম্বনে অথবা দন্ত দংশনে এরা হত্যার জন্য প্রেরিত ব্যক্তির শরীরে বিষ ঢেলে দিত। সেই ব্যক্তি জ্ঞান হারালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করত এবং পুরুষাঙ্গটিও কেটে ফেলা হত। বিষকন্যা গণিকাদের সবচেয়ে বেশি আধিক্য দেখা যায় ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়। বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে এক বিষকন্যার উল্লেখ আছে, যে নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষস নিয়োগ করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য)-কে হত্যা করার নিমিত্তে। এহেন বিষকন্যারা একাধারে বহুপুরুষগামী, অপরদিকে হত্যাকারীও।

মহাভারতের যুগে এমন জনা পাঁচেক বিখ্যাত মুনিঋষির নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা "স্বর্গবেশ্যা"-দের দেখে কামার্ত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যৌনসংসর্গে মিলিত হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র, শরদ্বান, ভরদ্বাজ, ব্যাস, বশিষ্ট, পরাশর, দীর্ঘতমা - এরাই সেইসব গুণধর! মহাভারতের যুগে অপরাপর সম্মানজনক বৃত্তিগুলির মধ্যে গণিকাবৃত্তিই ছিল অন্যতম। রাজদরবারে ও বিবিধ রাজকীয় অনুষ্ঠানে গণিকাদের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। এরা মনোহর রত্ন সোনা ও মণিমুক্তাখচিত অলংকারাদি ও মহামূল্য পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁরা রাজপথে অবাধে বিচরণ করতেন। যে-কোনো অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রার আয়োজন হলে পুরোভাগে বস্ত্রালংকারে শোভিত সুন্দরী বেশ্যারা থাকতেন।

শুধু সুরলোকেই নয়, দেবলোকেও বেশ্যাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল যথেষ্ট, উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যণীয়। মহাভারতে ত্বষ্টা নামক এক ঋষির কথা জানা যায়। ত্বষ্টার পুত্র ছিলেন একাধারে মদ্যপ এবং নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তাঁর উদ্দেশ্য স্বর্গজয়। স্বভাবতই স্বর্গরাজ ইন্দ্রের ভয়ের কারণ হল ত্রিশিরা। উপায় খুঁজতে বেশ্যাদের শরণাপন্ন হলেন ইন্দ্র। ত্রিশিরার তপস্যা ভঙ্গ করতে সুন্দরী বেশ্যাদের কাজে লাগালেন দেবরাজ ইন্দ্র। মহাভারতের যুগে সমরসম্ভারের সঙ্গে সৈন্যশিবিরে সুন্দরী বেশ্যাদেরকেও স্থান দেওয়া হত। সেনাদের একঘেয়েমি নিবারণও মনোরঞ্জনের জন্য শত সহস্র বেশ্যা নিয়োগ করা হয়েছিল। পাণ্ডব সেনাশিবিরে যে সব সুন্দরী "বেশস্ত্রী" অর্থাৎ বেশ্যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের সুযোগসুবিধা যা কিছু দেখভালের দায়িত্ব সবই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপরই ন্যস্ত ছিল। রামায়ণের রামচন্দ্রের জন্য যে স্বতন্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন সেই বাহিনীতে বিবিধ সমরসম্ভারেও অজস্র যৌবনবতী নিয়োগ করা হয়েছিল।

প্রাচীন যুগে বেশ্যাদের বিবরণ বণনা করতে চাইব বাৎস্যায়নে "কাম-সূত্রম্" উল্লেখ করব না, তা হয় নাকি! সবার আগে সংক্ষেপে জেনে নিই কী আছে বাৎস্যায়নের "কাম-সূত্রম্"-এ। আছে নরনারীর কামকলার যাবতীয় তথ্য, এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর বিশদ বর্ণনা। আছে লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ও যোনির বিস্তারর অনুসারে নরনারীর প্রকারভেদ, স্বভাব অনুসারে নারীর বৈশিষ্ট্য-চুম্বন-আলিঙ্গনাদি, স্তনমর্দন, দংশনক্ষত, নখক্ষত, যৌনমিলনের বিভিন্ন ভঙ্গি তথা আসন এবং প্রয়োগবিধি, পত্নী নির্বাচন, পত্নী এবং উপপত্নীর লক্ষণ, পরস্ত্রীকে বশীভূত করার উপায়, কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহার, যোনির বিস্তৃতি এবং সংকোচনের উপায়, বিভিন্ন প্রকার বিবাহ, পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন, রতিক্রিয়ার উপযুক্ত স্থান প্রভৃতি। এই "কাম-সূত্রম্"-এর 'বৈশিক' নামে একটি বিস্তৃত অধিকরণে প্রাচীনকালে ভারতীয় বেশ্যাদের জীবনযাত্রার একটি সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকেই সাধারণের মনে বেশ্যাদের সম্পর্কে যে গুমন্তবজ্ঞা, ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধার বিরূপ ধারণা আছে বাৎস্যায়নের উল্লিখিত বেশ্যাদের জীবনযাত্রার বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করলেই সেই বধ্যমূল ধারণার বদল হতে পারে।

বাৎস্যায়ন বেশ্যাদের পরিচয় দিতে গিয়ে কাম-সূত্রের চতুর্থ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলেছেন — "বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতিবৃত্তিশ্চ সর্গাৎ"। অর্থাৎ, "বেশ্যাদের পুরুষ-ধরা বিদ্যা এবং অর্থ উপার্জন সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে"। দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন, "রতিতঃ প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্"। অর্থাৎ রুচি হল রতির প্রতিশব্দ। রুচি থেকে যে পুরুষ গ্রহণে প্রবৃত্তি সেটা স্বাভাবিক, আর তা থেকে বেশ্যাদের যে অর্থোপার্জন প্রবৃত্তি সেটা কৃত্রিম"। এবার বেশ্যাদের উদ্দেশ্যে তৃতীয় শ্লোকটি পড়ুন, "তদপি স্বাভাবিকবদ্রূপরেৎ। কামপরাসু হি পুংসাং বিশ্বাসযোগাৎ"। অর্থাৎ, "তুমি যে পুরুষের কাছে ছল করছ, সেটা যেন বুঝতে না পদ্মনরে। এমন ভাব দেখাবে যে তুমি তাকে আলোবাসো, তাঁর অনুরাগিণী — এরকম হলে পুরুষ তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে"। ষষ্ঠ শ্লোকে উল্লেখ হয়েছে - "ন চানুপায়েনার্থান সাধয়েদায়তিসংরক্ষণার্থম্"। অর্থাৎ, "পুরুষের কাছে অর্থ উপার্জন করবে, কিন্তু খুব কৌশলে"। বাৎস্যায়ন পইপই করে বলেছেন কোন্ কোন্ পুরুষ একজন বেশ্যার কাছে চরম কাম্য হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সাদা বাংলায় বেশ্যারা কোন্ কোন্ পুরুষদের সঙ্গ দিলে মোটা অঙ্কের অর্থ আমদানি হবে। যেমন — (১) ধনী অথচ স্বাধীন যুবক, (২) যে ব্যক্তি প্রজাদের কাছ থেকে শুল্কাদি আদায় করে, (৩) ধনীক শ্রেণির যৌন বিকৃত বৃদ্ধ, (৪) সংঘর্ষবান, অর্থাৎ এক বেশ্যাকে নিয়ে দুজন ধনীর প্রতিদ্বন্দ্বীর কে কত টাকা দিয়ে তাকে নিতে পারে, (৫) সবসময় যাদের হাতে টাকা আসে। যেমন - সুদখোর, কুসীদজীবী ইত্যাদি, (৬) যে পুরুষ দেখতে কালো কুৎসিত, অথচ নিজেকে সে রূপবান এবং রমণীরঞ্জন মনে করে, (৭) আত্মশ্লাঘার বড়াই করে, এমন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আদায় করা খুব সহজ, (৮) ধনী, অথচ ধ্বজভঙ্গ বা নপুংসক পুরুষ, (৯) বাপ-মায়ের অনাদরের ছেলে, (১০)

সঙ্গদোষে দুষ্ট যুবক ইত্যাদি।

এমনকি কোন্ পুরুষদের সঙ্গে বেশ্যারা যৌনমিলন করবেন না, তারও কিছু নির্দেশিকা বাৎস্যায়ন দিয়েছেন। যেমন — (১) যক্ষারোগ হয়েছে এমন পুরুষ, (২) কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পুরুষ, (৩) যে ব্যক্তির শুক্রের সঙ্গে ক্রিমি জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট থাকে, যা নারীর যোনির ভিতর দিয়ে জরায়ুতে পৌঁছে নারীকে জরাগ্রস্থ করবে, (৪) কঠোর ও কর্কশ ভাষী, (৫) কঞ্জুষ বা কৃপণ, (৬) নির্ঘৃণ, (৭) গুরুজনের পরিত্যক্ত পুরুষ, (৮) চোর, (৯) বিশ্বাসঘাতক, (১০) যে পুরুষের মুখে দুর্গন্ধ, (১১) যে পুরুষ বশীকরণ জানে, (১২) বঞ্চক ইত্যাদি।

ঠিক থাকলে একজন বেশ্যা (বর্তমান নিষ্পীড়িতার্থমুৎসৃজন্তী বিশীর্ণেন সহ সন্দধ্যাৎ") একজন পুরুষের অর্থ নিঃশেষ করে ছিবড়ে করে তারপর আর-একজন অর্থবান পুরুষকে পাকড়াও করবে (কাম-সূত্রম ৪/৩/১)। বাৎস্যায়ন মনে করেন, একজন বেশ্যাকে বিভিন্ন রুচির যুবক এবং পৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গ দিতে হবে। যদি ধনবান হয়, প্রয়োজনে বৃদ্ধের সঙ্গেও শুতে হবে বৃত্তির তাগিদে। এমনকি বেশ্যাদের কামশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে সবার আগে ৬৪ কলায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে ৬৪ কলাগুলি জেনে নিতে পারি - (১) সংগীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (৪) অঙ্কন, (৫) তিলক-কাটা (সেই সময়ে ললাটে-কপোলে-স্তনে, এমনকি নাভিও হাতে-পায়ে তিলক কাটার রীতি ছিল), (৬) তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকারের ব্যবহার, (৭) পুষ্পাস্তরণ (যে বিছানায় যৌনক্রিয়া চলবে সেটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে), (৮) দশনবসনাঙ্গরাগ (নিজের দেহবল্লরী চিত্রিত করতে হবে), (৯) মণিভূমিকাকর্ম, (১০) শয়ন রচনা (ঋতু অনুসারে শোওয়ার বিছানা প্রস্তুত এবং সাজাতে হবে), (১১) উদকবাদ্য, (১২) উদকঘাত, (১৩) চিত্রযোগ, (১৪) মালা-গ্রন্থন-বিকল্প (মালা গাঁথা এবং তা দিয়ে সাজাতে হবে শরীর), (১৫) শেখরকাপীড়যোজন, (১৬) নেপথ্য প্রয়োগ, (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ, (১৮) গন্ধযুক্তি, (১৯) ভূষণযোজন, (২০) ঐন্দ্রজাল, (২১) কৌচমার যোগ, (২২) হস্তলাঘব (হাত-সাফাই বিদ্যা), (২৩) বিচিত্রশাক-যূষ-ভক্ষ-বিকার-ক্রিয়া, (২৪) সূচিবানকর্ম, (২৫) সূত্রক্রীড়া, (২৬) বীণা-ডমরুক-বাদ্য, (২৭) প্রহেলিকা, (২৮) প্রতিমালা, (২৯) দুর্বাচক যোগ, (৩০) পুস্তকবাচন, (৩১) নাটকাখ্যায়িকা, (৩২) কাব্য-সমস্যা-পূরণ, (৩৩) পট্টিকা-বেত্র-বাণ-বিকল্প, (৩৪) তক্ষকর্ম, (৩৫) তক্ষণ, (৩৬) বাস্তুবিদ্যা, (৩৭) রৌপ্যরত্ন পরীক্ষা, (৩৮) ধাতুবাদ, (৩৯) মণিরাগাকর জ্ঞান, (৪০) বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, (৪১) মেষকুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি, (৪২) শুকসারিকা প্রলাপন, (৪৩) শরীর মর্দন, কেশ মর্দনাদির কৌশল, (৪৪) অক্ষরমুষ্টিকাকথন, (৪৫) ম্লেচ্ছিত-বিকল্প, (৪৬) নানা প্রাদেশিক ভাষায় জ্ঞান, (৪৭) পুষ্পশকটিকা, (৪৮) নিমিত্তজ্ঞান, (৪৯) যন্ত্রমামৃকা, (৫০) ধারণমাতৃকা, (৫১) সংপাঠ, (৫২) মানসী, (৫৩) কাব্যক্রিয়া, (৫৪) অভিধানকোষ, (৫৫) ছন্দপাঠ, (৫৬) ক্রিয়াকল্প, (৫৭) ছলিতকযোগ, (৫৮) বস্ত্রগোপন, (৫৯) দ্যূতবিশেষ, (৬০) আকর্ষক্রীড়া, (৬১) বালক্রীড়নক, (৬২) বৈনয়িকী বিদ্যা, (৬৩)

বৈজয়িকী বিদ্যা, (৬৪) বৈয়ামিকী বিদ্যা। বাৎস্যায়ন চৌষট্টি বা চতুঃষষ্ঠি কলায় সুশিক্ষিত বেশ্যার উদ্দেশে বলেছেন—"আভিরভূচ্ছ্রিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা। / লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি"।।

বাৎস্যায়নের সময় বেশ্যাদের বিয়ের মধ্যে এক অভিনব ব্যাপার ছিল। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়েদের মতো তাঁদেরও বিয়ে-থা, সন্তান জন্মদান, ঘর-সংসার করতে পারত। তবে কোনো বেশ্যাকেই বিয়ের পর পুরোনো বেশ্যাবৃত্তিকে ত্যাগ করতে হত না। এমনকি স্বামীর দিক থেকেও বেশ্যা-স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করত না। অবশ্য বিয়ের পর প্রথম একটা বছর স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন করা নিষিদ্ধ ছিল। বিয়ের এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেশ্যাবৃত্তিতে আর কোনো বাধা ছিল না। তবে সেক্ষেত্রে শর্ত একটাই - এক বছর পর স্বামী যে রাতে তাঁকে যৌনমিলনের নিমিত্ত বিছানায় আহ্বান করবে সেই মুহূর্তে শত খরিদ্দার ত্যাগ করে সেই রাতে তাঁকে স্বামীর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। (কাম-সূত্রম্ ৭/১/২২)।

বাৎস্যায়ন শেষ করব বেশ্যাদের একটি বিপজ্জনক অপকর্ম দিয়ে - এইসব বেশ্যা বা গণিকারা চতুরতার সাহায্যে মাঝে মধ্যেই শাঁসালো ধনীর ছেলে বা যুবক খুঁজে তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করত। কীসের ক্ষতিপূরণ? গণিকা বা বেশ্যারা তাঁর কোনো সখি বা দাসীর সাহায্যে তাঁর অক্ষতযোনি কন্যার যোনিদেশে সীসা-লৌহাদি নির্মিত কৃত্রিম লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সতীচ্ছদ ছিন্ন করে ক্ষতের সৃষ্টি করত। এরপর ওই যোনি-বিধ্বস্ত মেয়েকে পাখি-পড়া পড়িয়ে মুখিয়ার দরবারে কিংবা বিচারালয়ে পূর্বে নির্দিষ্ট যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হত এবং বেশ মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিত (কাম-সূত্রম্ ৭/১/২০)।

মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্যগুলিতেও বেশ্যানারীর উল্লেখ আছে। বিশেষ করে "মেঘদূতম্"-এ। তবে "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্" নাটকে মহাকবি যে উর্বশীকে নায়িকা করেছেন তিনি একজন বহুভোগ্যা বেশ্যারমণী। অবশ্যই উর্বশী ছিলেন তথাকথিত "স্বর্গবেশ্যা"। "নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতোস্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ় পুষ্পৈঃ কদম্বৈ।। যঃ পণ্য স্ত্রী রতিপরিলোদগারিভির্ন্নাগরানামুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি"।।— এই শ্লোকটি মহাকবির বিরচিত "মেঘদূতম্"-এর পূর্বমেঘের ২৫ অংশ থেকে উল্লেখ করা হল।

শুধু কালিদাস কেন, বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষসম্" গ্রন্থ থেকে জানা যায় - সেকালের গণিকাদের সঙ্গে রাজা সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কাহিনি বর্ণিত আছে। সেকালের গণিকারা যে নানা বসনেভূষণে অলংকৃত হয়ে রাজপথ শোভাবর্ধন করতেন তারও উল্লেখ আছে। শ্রীধরদাস তাঁর "সদুক্তির্ণামৃত" গ্রন্থে তৎকালীন বঙ্গদেশের বেশ্যাদের বিবরণ দিয়েছেন। এখানে "তৎকালীন" বলতে দ্বাদশ শতক বুঝতে হবে। শ্রীধরদাস বলেছেন "বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গ বারাঙ্গনানাম্"। নবম শতকে রচিত "কুট্টনীমত" গ্রন্থে দামোদরগুপ্ত বলেছেন, সেকালের বারানসী নগরীতে মালতী নামে গণিকা বাস করত। সে গণিকা সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয়

উপদেশ নিতে বিকরবালা নাম্নী এক বৃদ্ধা গণিকার কাছে যেতেন। "কুট্টনীমত"-ই বৃদ্ধা গণিকার উপদেশ সংবলিত গ্রন্থ। ভবভূতির "মালতীমাধব"-এ ব্রাহ্মণ মাধব সিংহলে বাণিজ্য করে প্রভূত সম্পদশালী হন। এরপর কুবলয়াবলি নাম্নী এক সুন্দরী গণিকার প্রেমে পড়েন এবং যৌনমিলন কার্য সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মণের মোহাবিষ্টদতার সুযোগ নিয়ে সেই বেশ্যারমণী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। পরে অবশ্য কুবলয়াবলিকে পাকড়াও করে নাক-কান কেটে প্রেমিকা মালতীর কাছে ফিরে যান মাধব। এই হল "মালতীমাধব"-এর উপজীব্য। সপ্তম শতকের লেখক বানভট্ট তাঁর "কাদম্বরী" গ্রন্থে জানিয়েছেন, সেকালে গণিকারা দেশের রাজাকে স্নান করাত। রাজার মাথায় আমলকী ঘষে দিতে। স্নানের পর রাজার শরীরে চন্দন, আতর, কুমকুম ইত্যাদি মাখিয়ে দিত। এমনকি রাজার পরনের যাবতীয় পোশাক বেশ্যারাই পরিয়ে দিতেন। "চারুদত্ত" গ্রন্থে লেখক ভাসের কাহিনি উপজীব্য হল চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেম। এখানে চারুদত্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বেশ্যা বসন্তসেনার বিয়ে হয়। এছাড়া শর্বিলক নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মদনিকা নামক বিয়ের কাহিনিও এই গ্রন্থে আছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও বেশ্যা-বারাঙ্গনা ছিল। গোপীচন্দ্রের গান, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, দোনা গাজির সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, আবদুল হাকিমের লালমতি সয়ফুল মুল্লক, শুকুর মাহমুদের গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস — এইসব নানা কাব্যপুঁথিতে বেশ্যা-সংস্কৃতির সরস বিবরণ রয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জতুগৃহ প্রাচীন গ্রিকের এথেনাইয়ের কবি সোলোন, যিনি তৎকালীন গ্রিকের সাতজন জ্ঞানী লোকের একজন হিসেবে গণ্য হতেন, খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে এথেন্সে প্রথম বেশ্যালয় স্থাপন করেন। এই বেশ্যালয়ের উপার্জন দিয়ে আফ্রোদিতিকে নিবেদন করে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যাপকভাবে পতিতাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং পৌরসভার মাধ্যমে সমস্ত বেশ্যালয় পরিচালিত হতে থাকে। প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদ ও কূটনীতিক মেগাস্থিনিস এক ধরনের পরিদর্শকের কথা বলেছেন, যারা রাজ্যের সকল কার্যক্রমের উপর বেশ্যাদের সহায়তায় নজর রাখতেন এবং রাজার কাছে গোপন রিপোর্ট দিতেন।

ধর্মীয় সংস্কার-আচার-প্রথা ও 'পবিত্র পতিতা'-র জন্ম দিয়েছে। লোকজীবনে দেহসাধনার নামে যে অবাধ যৌনাচার চলে আসছে তাতে ভণ্ড পির, কামুক সাধু কিংবা বৈরাগী-বৈষ্ণবের আখড়াও বাদ যায় না। "তন্ত্রসার" গ্রন্থে ভুরি ভুরি বেশ্যার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে বেশ্যারমণীদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে - যেমন **(১) গুপ্তবেশ্যা ঃ** এই বেশ্যারা সাধারণত তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিকদের বংশজাতা হয়। এরা স্বভাবে নির্লজ্জ এবং অত্যধিক কামাসক্ত হন। এরা পশুভাবাপন্ন স্বামী বা পুরুষ পছন্দ করেন। **(২) মহাবেশ্যা ঃ** এই মহাবেশ্যারমণীরা স্বেচ্ছায় শরীরের পোশাক ত্যাগ করে গুপ্ত-অঙ্গ প্রদর্শন করেন। **(৩) রাজবেশ্যা ঃ** রাজবেশ্যারা স্বাধীনভাবে নগরে বিচরণ করণে এবং রাজার মতোই আচরণ করেন **(৪) দেববেশ্যা ঃ** যে রমণী মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে তান্ত্রিক-চক্রে অধিষ্ঠিতকালে যৌনমিলন সম্পাদনের মাধ্যমে গর্ভবতী হন, সেই নারীর গর্ভজাতা কন্যাই দেববেশ্যা নামে অভিহিত করা হয়।

নিরুত্তরতন্ত্রে আবার মোট ছয় প্রকারের বেশ্যার উল্লেখ আছে। যেমন - (১) গুপ্তবেশ্যা, (২) মহাবেশ্যা, (৩) কুলবেশ্যা, (৪) রাজবেশ্যা, (৫) ব্রহ্মবেশ্যা এবং (৬) মহোদয়া। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে এইসব বেশ্যারা এক-একটি প্রসিদ্ধ তীর্থতুল্য। যেমন - গুপ্তবেশ্যারা অযোধ্যা তীর্থতুল্য, মহাবেশ্যারা মথুরা তীর্থতুল্য, কুলবেশ্যাগণ মায়া তীর্থতুল্য, রাজবেশ্যাগণ দ্বারকা ও অবন্তী তীর্থ তুল্য, ব্রহ্মবেশ্যাগণ দ্বারাবতী তীর্থতুল্য এবং মহোদয়া বেশ্যারা কালিকা তীর্থতুল্য। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে, "স্ত্রী পুংসো সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তং পরমং পদম্"। অর্থাৎ, স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমে যে সৌখ্য বা আনন্দ তাই-ই পরমপদ বা ব্রহ্ম। সেই কারণেই তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে 'পঞ্চ ম-কার' অপরিহার্য অঙ্গ। পঞ্চ ম-কার হল মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন। "বিনা পীত্বা সুরাং ভুক্ত্বা মৎস্যমাংসং রজস্বলাং। / যো জপেদ্ দক্ষিণাং কালীং তস্য দুঃখ পদে পদে"।। —অর্থাৎ "যে বিনা মদ্যপানে, বিন মাছমাসং খেয়ে, বিনা যুবতী সম্ভোগে দক্ষিণা কালীর আরাধনা করবে তাঁর পদে পদে দুঃখ হবে"।

সম্প্রতি কর্ণটক রাজ্যের দেবনগর জেলার উত্তরঙ্গমালা দুর্গা মন্দিরে রাতের বেলায় নারীদের দেবতার নামে 'উৎসর্গ' করার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে - এই মর্মে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন এক বেঞ্চ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই কুপ্রথা কার্যত নারীদের যৌনশোষণ, যা নিষিদ্ধ করা হয় ১৯৮৮ সালে। আশা ছিল, এর ফলে দেবদাসীদের সামাজিক যৌনশোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, মহারাষ্ট্রে, ওড়িশায় এবং গুজরাটে দেবতাকে উৎসর্গ করার নামে দেবদাসীদের প্রধানত দেহভোগের কাজে ব্যবহার করা হয়। দেবতা বা মন্দিরে উৎসর্গ করার পর তাঁদের পরিচয় হয় দেবদাসী। কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁদের বলা হয় যোগিনী।

প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন এই প্রথা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর পেছনে আছে চরম দারিদ্র্য, জাতিভেদ এবং পুরষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। গরিব ঘরের মা-বাবা তাঁদের কুমারী মেয়েকে রজস্বলা হবার আগেই নিয়ে আসে মন্দিরে। প্রথমে কুমারী মেয়েদের নিলাম করা হয়। তারপর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উৎসর্গ করার নামে বিগ্রহের সঙ্গে কুমারী মেয়েদের তথাকথিত "বিয়ে" দিয়ে দেন। এরপর অন্য কোনো পুরুষ ওই মেয়েটির স্বামী হতে পারে না। খাওয়া-পরার বিনিময়ে মন্দিরে থেকেই তাঁদের সারাজীবন কাটে কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থেকে শুরু করে মন্দিরের অন্যান্য পুরুষদের যৌন লালসার শিকার হয়ে। কিংবা সমাজের উচ্চ বর্গীয় ধনী কিংবা সামন্ত প্রভুদের রক্ষিতার ভূমিকা পালন করতে হয়। মন্দিরের পূজারি ব্রাহ্মণ এবং সামন্ত-প্রভুদের যোগসাজশে কৃষক ও কারুশিল্পী বা কারিগরদের উপর ধর্মীয় প্রভাব খাটিয়ে দেবদাসীদের বেশ্যাবৃত্তিকে দেয়া হয় ধর্মীয় শিলমোহর। উৎসর্গের পর দেবদাসীকে ভোগ করার প্রথম অধিকার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের। এই সামাজিক তথা ধর্মীয় প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে নানা কাহিনি, বিতর্ক এবং বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। এর ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিক উৎকীর্ণ আছে বিভিন্ন

মন্দির গাত্রে। গুজরাটে প্রায় চার হাজার মন্দিরে ছিল প্রায় ২০ হাজার দেবদাসী, যাঁদের নাচনিও বলা হত।

শাস্ত্রের পাশাপাশি ইতিহাসের সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। বাংলার তাম্রশাসন আমলের লেখমালায় সংগীত-নৃত্য পটিয়সী রাজনটী ওরফে রাজবেশ্যাদের পরিচয় মেলে। ধর্মীয় আচারের আড়ালেও আবার কখনো বেশ্যা ও বেশ্যাবৃত্তির জীবনযাপন করতে হয়েছে। দেবদাসী প্রথা তার একটি বড়ো দৃষ্টান্ত। কালীঘাটের পটচিত্রে বেশ্যাসম্ভোগের দৃশ্য যেমন আছে, তেমনই অনেক মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ টেরাকোটাতেও এমন দৃশ্য মেলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুকূল্যে উনিশ শতক বাঙালি সমাজের সার্বিক উত্থানের কাল হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এর পাশাপাশি সমাজ-অভ্যন্তরে অনাচারের একটি চোরাস্রোতও বহমান ছিল। ভুঁইফোঁড় নব্যধনী এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যেও চারিত্রিক ভ্রষ্টাচার দেখা দেয়। এমনকি সমাজের নেতৃস্থানীয় খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ এই নৈতিক স্খলন থেকে মুক্ত ছিলেন না। সুরাপান, বেশ্যাসক্তি ও রক্ষিতা-পোষণ সেকালে এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণিকাচর্চা গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হত। আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতার নাগরিক জীবন এমনকি মফস্বল শহরেও গণিকাচর্চা জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠে। নব্যবাবু সমাজে 'বেশ্যাবাজি' ছিল বাবুগিরির প্রধান অঙ্গ। আমাদের রথী-মহারথীদের কিছু নাম জেনে নেই যারা হামেশাই বেশ্যাবাড়ি যেতেন। ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় নিকির নাচ দেখেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বাঁধা রক্ষিতাও ছিল তাঁর। এই যবনী রক্ষিতার গর্ভে তাঁর একটি পুত্রও জন্মে ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগান বাড়ি বিলাস ও বাইজি আসক্তি তাঁর সাধ্বী পত্নী বরদাস্ত করেননি। দ্বারকানাথকে বহির্বাটীতেই রজনী যাপন করতে হত, অন্দরমহলে প্রবেশ তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল। কলকাতার বউবাজারে দ্বারকানাথের পরিবারের কোনো সদস্যের মালিকানায় ৪৩ কক্ষের এক বিশাল বেশ্যাবাড়িও ছিল। কারও কারও ধারণা, নটী সুকুমারী দত্তের প্রেমে মজেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার কারণ নাকি এই অবৈধ সম্পর্ক। ব্যভিচারী রমেশদার আত্মকথায় ঠাকুরপরিবার সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্যের সন্ধান মেলে। প্রতিবেশী সম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ও এই হিন্দু বাঙালি'বাবুদের অনুসরণ করতেন। পদমদীয় নবাব মির মহম্মদ আলি তাঁদেরই একজন। সত্যনিষ্ঠ মশাররফ অকপটে তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন, গ্রামের বাড়ি লাহিনীপাড়ায় থাকায় সহজে শহরে যাওয়ার প্রয়োজন বা সুযোগ হত না। কিন্তু যেদিন হাতের কাছের শহর কুষ্টিয়ায় যাওয়া পড়ত সেদিন ছয়মাসের 'দাদ' একদিনে তুলে নিতেন, নিজে মজে অবিদ্যাদের মজিয়ে, উৎসবের আনন্দে শহরে অবস্থানের প্রায় পুরোটা সময়ই কাটিয়ে আসতেন বেশ্যাপাড়ায়। দেশীয় গণিকা শুধু নয়, 'ইঙ্গ-বঙ্গ বারাঙ্গনা'র প্রতিও হাত বাড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে সন্তানও উপহার দিয়েছিলেন। মরমি কবি হাসন রাজার তো হর হামেশাই পতিতা দর্শনে যেতেন। হাসন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজার বেশ্যাসক্তির বিবরণ তাঁর সফরভিত্তিক আত্মকথায় মেলে। কবি নজরুল তো কাননবালার ঘরে প্রায় নিয়মিতই যেতেন।

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে পতিতা ও বৈধতাও প্রশ্নহীন নয়। সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তও রক্ষিতা পুষতেন।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের বেশ্যামগ্ন পুরুষের চালচিত্র কেমন ছিল, তার বিবরণ সেকালের অনেক প্রখ্যাত কীর্তিমান মানুষের স্মৃতিচর্চায় পাওয়া যায়। এ থেকে বেশ্যা-সংস্কৃতির সামাজিক চিত্রের নিপুণ পরিচয় পাওয়া যায়। মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল আর একাল"-এ লিখেছেন—"এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ্যাসক্ত। যেমন - পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাবে ধারণ করিয়াছে, সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা সভ্যতার চিহ্ন। যতোই সভ্যতা বৃদ্ধি হয় ততোই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে"।

বেশ্যালয় এবং বেশ্যাবৃত্তি মহানগর, মফস্বল শহর, গঞ্জ ছাড়িয়ে গ্রামীণ জনপদেও প্রসারিত হয়েছিল। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সতীমার মেলায় উল্লেখযোগ্য বেশ্যা-সমাগম হত। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় ৪ এপ্রিল জানা যায়, যেখানে 'কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক'। দীনেন্দ্রকুমার রায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, গ্রামীণ মেলা বা আড়ঙে বেশ্যাদের 'টং' জাঁকিয়ে বসত। তাদের শিকার ছিল মোহিনী-মাথায় মুগ্ধ গ্রামের চাষাভূষো ও সাধারণ মানুষ।

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বিবরণে জানা যায় ঃ "দেওয়ানজী তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুরূপ অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিদ্যমান ছিল। সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনোও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে — 'ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ি করিয়া দিয়াছেন, এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ি করিয়া দেওয়া একটা মান-সম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোরেই, দেশের সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল"।

কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নক্সায় উনিশ শতকের কলকাতার বেশ্যাবাজির বিবরণ দিয়েছেন ঃ "বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরির কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাছেন। কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের

বাড়িগুলো আজও মনিমেন্টের মতো তাঁদের স্মরণার্থে রয়েছে — সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে তাঁদের স্মরণ করে"। শুধুমাত্র অধমরাই নয়, যাঁরা ছিলেন সমাজপতি ও কীর্তিমান, পতিতা-রক্ষিতার প্রতি তাঁরাও মোটেই বিমুখ ছিলেন না। অনেক মহাত্মাই (!) সম্মান বাঁচিয়ে গোপনে বেশ্যাদের বাঁধা খরিদ্দার ছিলেন, রক্ষিতা-পোষণ করতেন না উচ্চবর্গের ধনী রাজা-জমিদার-জোতদার-বণিক-ব্যবসায়ী-উকিল-মোক্তার-আমলা এমন ব্যক্তি কমই ছিলেন। বেশ্যাচর্চা সেকালের অনেক বিত্তবান শিক্ষিত বাঙালির কালচারে পরিণত হয়েছিল। নদীয়ার মহারাজার দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্ম-জীবনচরিত-এ "গণিকালয়ের ইতিহাস" নামে অধ্যায়ে এই বিষয়ে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা হল ঃ "কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনবাজারে বেশ্যালয় ছিল। গোয়াড়ীতে কয়েক ঘর গোপ ও মালো গাঁড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ছিল। পরে যখন ইংরেজ গভর্নমেন্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয় সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবরা গোয়াড়ীতে পশ্চিম দিকে, ও তাঁহাদের আমলা উকীল ও মোক্তারের ইহার পূর্ব্ব দিকে, আপন আপন বাসস্থান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথামত অপ্রচলিত থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল, পূর্ব্বে গ্রিস দেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমাদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষত পর্ব্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন"।

মোটামুটি আঠেরো শতক থেকেই কলকাতা তথা বাংলার নবাব-রাজা-জমিদার-বিত্তশালীদের বিনোদবৃত্ত ঘিরে থাকত বেশ্যা-বাইজির উষ্ণ সঙ্গ, যার অনুসঙ্গ ছিল সংগীত - যা বাইজিসংগীত বা বেশ্যাসংগীত নামে পরিচিত ছিল। অতিথি-পুরুষকে কতটা আনন্দ দান করবে, কতটা আনন্দ পাবে তা নিজে পরিমাপ করার অধিকার কার্যত সীমাবদ্ধ ছিল এই বারপল্লিতেই। তাঁদের কর্মসংস্কৃতির তথা বিনোদন চর্চা ছিল সমাজপতি এবং ??? দখলে। তাঁদের আনন্দ-সম্ভোগ ছিল বহু বাধানিষেধে বন্দি। প্রচুর গান লেখা হয়েছিল সে সময়ে। সেসব গান আজই বড়োই অবহেলিত, বিস্মৃত-প্রায়। যেখানে বেশ্যা-বাইজিদের সম্মান নেই, সেখানে তাঁদের গান সম্মান পাবে কীরূপে!

পাঠকের আন্দাজ নেওয়ার জন্য দু-তিনটি বেশ্যাসংগীত পরিবেশন করলাম ঃ (১) তুমি আমার সোহাগ পাখি,/আমি তোমার পিঞ্জরা।/আমায় ছেড়ে যাবে কোথা,/ওহে কালো ভ্রমরা।/যে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতরা।/হৃদয়খানি খুলে দেখ, হয়ে গেছে ঝাঁঝরা।

(২) তোর পিরিতে সব খোয়ালাম/বাকি কেবল টুকনি নিতে।/পাতা লতা কুড়িয়ে মলাম, /পারলাম না আগুন পোয়াতে।/তোর পিরিতে এমনি মজা,/ঘর থাকতে বাবুই ভেজা,/যেমন মজা, তেমন সাজা,/দিলি রে তুই বিধিমতে। (৩) বেশ্যাগিরি কী ঝকমারি করব করব নাকো আর/জেনে শুনে প্রাণে প্রাণে সমজিঝি এবার।/গিয়াছে যৌবন কেটে,(দিতে) একমুঠো ভাত পেটে,/জোটে নাকো মোটে/(এখন)ছাত পিটি পট পট, করি খিদের জ্বালায় ছটফট,/নাচার হয়ে আচার হারা, হারিয়েছি বিচার।

আঠারো শতকের শেষের দিকে বিশেষ করে বাঙালি সমাজের তলায় যে ঘুণ ধরতে শুরু করেছিল তার একটা ইংরেজ বণিকদের আনুকূল্যে কিছু মানুষের হঠাৎ করে নবাব হয়ে যাওয়া। মদ্যপান, মেয়েমানুষ রেখে, বেশ্যাবাড়ি গিয়ে, লক্ষ টাকা দিয়ে বেড়ালের বিয়ে দিয়ে, মাইফেলি ও বাইজিদের মুজরা বসিয়ে এঁরা সমাজটাকে পাঁকপূর্ণ করতে চেয়েছিল। ১৮৭২ সালে স্থাপিলত হল বঙ্গ রঙ্গালয়ের সাধারণ মঞ্চ। শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন একসঙ্গে চার-চারটি বেশ্যানারী। প্রসঙ্গত জানাই, সে সময় ভদ্র সমাজের মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে (একা একাও নয়) মঞ্চে অভিনয় করবেন, এটা ভাবাই যেত না। যাই হোক,বাঙলার রঞ্চমঞ্চে প্রথম চার বেশ্যানারীরা হলেন — গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যামা। উপেন্দ্রনাথ দাসের ''শরৎ-সরোজিনী'' নাটকে গোলাপসুন্দরী সুকুমারীর ভূমিকায় এমন প্রাণবন্ত অভিনয় করেছিলেন যে, তিনি 'সুকুমারী' নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন। বেশ্যার মেয়ে এবং নিজে বেশ্যা হলেও সুকুমারী স্ত্রীর মর্যাদা পেয়ে গেলেন উপেন্দ্রনাথ দাসের মধ্যস্থতায় তাঁরই দলের অভিনেতা সুদর্শন গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিয়ে হয়। পবদিহীন বেশ্যা হয়ে গেলেন মিসেস সুকুমারী দত্ত। এই কারণে গোষ্ঠবিহারী তখন সমাজে পতিত হয়ে গেলেন সত্যই, কিন্তু ভদ্রপল্লিতে সংসার পাতলেন। এইরকম বেশ্যাদের মধ্যে আর-একজন প্রখ্যাত বিনোদিনী দাসী। চৈতন্যলীলায় তিনি নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সাড়া জাগান। পরে শ্রী রামকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁর 'চৈতন্য' হয়ে বলে কথিত আছে। বর্তমানে স্টার থিয়েটারের নামের সঙ্গে বিনোদিনীর নামও বিজড়িত হয়ে আছে।

ইহুদি ধর্ম গোত্রের ভেতরে সদস্য-সদস্যাদের কাউকেই গণিকাবৃত্তিতে উৎসাহিত করত না। বরং সেটা তাদের নৈতিক আইন অনুসারের জঘন্য অপরাধ বিবেচিত হত, তবুও ইতিহাসে খুব অল্প সময়ের জন্যই তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল, তাই তাদের নিজস্ব গোত্রে তারা বেশ্যাবৃত্তি দমন করতে পারলেও নগর থেকে পতিতাদের উচ্ছেদ করতে পারেনি। যত বড়ো নগর, তত বেশি গণিকা, তত বেশি ব্যাভিচার, এমনটাই বাস্তবতা। গ্রিক সভ্যতাও একটা পর্যায়ে শুধুমাত্র গণিকাবৃত্তির জন্যই বিখ্যাত। তাদের নগরে যদিও বেশ্যাদের নাগরিকত্বের অধিকার ছিল সামান্য, তবে নগরের অধিকাংশ সম্পদের মালিক ছিল এই গণিকারা, তারাই নগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের বিলাস ও ব্যভিচারের অর্থ প্রদান করত। উচ্চাভিলাষী যে-কোনো নারী সে সময়ে স্ব-ইচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি অংশগ্রহণ করত এবং তাঁরা অর্থে-বিত্তে-সম্মানে পিছিয়ে ছিল

না। বরং সামনের কাতারেই ছিল। ভারত উপমহাসাগরের নারীরা যে সবাই দক্ষ গণিকা বা বেশ্যা হয়ে উঠতে পেরেছিল তা কিন্তু নয়। বরং চৌষট্টি কলায় দক্ষ যে রমণী, তাঁর শয্যাসঙ্গী হতে যে পরিমাণ আর্থিক সংগতি লাগত তা যোগান দিতে পারত শুধুমাত্র উচ্চতর রাজকর্মচারীগণ। সম্রাট নিজেই নিজের নগরে একজনকে উপঢৌকনসহ বহাল রাখতেন, যখনই অন্য দেশের কোনো সম্ভ্রান্ত নাগরিক কিংবা সম্রাট নগরে আসতেন, তখনই এই গণিকাগণ তাদের মনোরঞ্জন করত।

অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বিক্রির ইতিহাস সুপ্রাচীন। ওয়েবস্টার অভিধান মতে, সুমেরিয়ানদের মধ্যেই প্রথম পবিত্র বেশ্যা বা পতিতার দেখা মেলে। প্রাচীন গ্রন্থাদিসূত্রে, যেমন ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাত হিরোডেটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০/২০)-এর লেখায় এই পবিত্র বেশ্যাবৃত্তির বহু নমুনা পাওয়া যায়, যেটি প্রথম শুরু হয়েছিল ব্যাবিলনে। সেখানে প্রত্যেক নারীকে বছরে অন্তত একবার করে যৌনতা, উর্বরতা ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে যেতে হত এবং সেবাশুশ্রূষার নমুনা হিসাবে একজন বিদেশির সঙ্গে নামমাত্র মূল্যে যৌনসঙ্গম করতে হত। একই ধরনের বেশ্যা বৃত্তির চর্চা হত সাইপ্রাস এবং করিন্থেও। এটি বিস্তৃত হয়েছিল সার্দিনিয়া এবং কিছু ফিনিশীয় সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে ইস্টার দেবতার সম্মানে। ফিনিশীয়দের মাধ্যমে ক্রমশ এটি ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য বন্দর শহরগুলোতেও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। যেমন—সিসিলি, ক্রটন, রোসানো ভাগলিও, সিক্কা ভেনেরিয়া এবং অন্যান্য শহরে। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় এশিয়া মাইনর, লাইদিয়া, সিরিয়া ও এট্রাকসনের নামও। ইসরায়েলে এটি একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার জতুগৃহ প্রাচীন গ্রিকের এথেনাইয়ের কবি সোলোন (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৯০), যিনি তৎকালীন গ্রিকের সাতজন জ্ঞানী লোকের একজন হিসাবে গণ্য হতেন, খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে এথেন্সে প্রথম বেশ্যালয় স্থাপন করেন। এই বেশ্যালয়ের উপার্জন দিয়ে আফ্রোদিতিকে নিবেদন করে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যাপকভাবে বেশ্যাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং পৌরসভার মাধ্যমে বেশ্যালয়গুলি পরিচালিত হতে থাকে।

বেশ তো চলছিল — হঠাৎ কী এমন হল, যে বেশ্যাবৃত্তি ছিল প্রাচীন যুগে এত আদরের-কদরের ছিল, সেই বেশ্যাবৃত্তি এত নিন্দনীয় এবং ঘৃণিত হল কীভাবে? কবে থেকে? যখন বেশ্যা এবং বেশ্যাবৃত্তির বিবর্তন নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব ভাবছিলাম - ভাবছিলাম কেন, যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম সেই সময় আমার এক বন্ধু একটি মূল্যবান গ্রন্থ আমার হাতে তুলে দিল। বইটি আনন্দ পাবলিশার্সের "বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ" গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁদের সৈন্যরা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেইসব সৈন্যদের ব্যাপকভাবে বেশ্যাদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করায় তাঁদের মধ্যে যৌনরোগের হার মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যা সরকারের কাছে হয়ে উঠেছিল একটি বিপর্যয়ের কারণ। সেই সময়কার সরকারি রিপোর্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে সেই যৌনরোগের হার ১৮২৭ সালে ২৯ থেকে বেড়ে ১৮২৯-এ ৩১-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

আর ১৮৬০ সালে দেখা যায় এই মাত্রা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৭০। ..... অনেক সৈন্যদের অক্ষম বলে বরখাস্ত করতে হয়। ....বেশ্যাবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তাই সমস্ত দিক বিচার করে ইংরেজ সরকার ১৮৬৪ সালে পাশ করালেন 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' ঙ্কহ্ঠ ৩৩৩৩৩৩ ত্র ১৮৬৪। সেনাছাউনিগুলোতে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তৈরি হল আলাদ্য বেশ্যালয়, সেখানে যেসব বেশ্যারা আসতেন তাঁদের রেজিস্ট্রিভুক্ত করে পরিচয়পত্র স্বরূপ 'কার্ড' দেওয়া হত। যৌনরোগ থেকে তাঁদের মুক্ত রাখার জন্য 'লক হসপিটাল' নামে বিশেষ হাসপাতালে স্থাপন করা হয় প্রধান সেনাছাউনিতে। ....সরকারি নিদের্শে পুলিশ লালবাতি এলাকায় বাড়িগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে মেয়েদের ডক্তারি পরীক্ষা করতে নিয়ে যেত। সামাজিকভাবে সরকারের তাঁদের প্রতি এই ব্যবহার ক্রমশই নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তার ফলে প্রচুর বেশ্যা কলকাতা ছেড়ে গ্রামে বা অন্য কোথাও পালাতে শুরু করলেন। যাঁরা হাসপাতালে গেলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ফিরে এসে আর পুরোনো পেশায় ফিরতে সাহস পেলেন না। তাঁদের যেন পেশায় টিকে থাকাটাই দায় হয়ে পড়েছিল। এমনকী শেষপর্যন্ত খদ্দেরদের মধ্যে একটা অংশের অনীহা জন্মাল লালবাতি এলাকায় যাওয়ায়। এত হেনস্থা সহ্য করে তাঁরাও খানিকটা বিমুখ হয়ে পড়েছিলেন। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে না-হলেও পরোক্ষভাবে যেন একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বেশ্যাবৃত্তিকে তুলে দেওয়ার।

উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে এই বেশ্যা সমস্যাকে কেন্দ্র করে মূলত দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদল এই বেশ্যাবৃত্তির এবং বেশ্যাদের দুর্গতির সহমর্মী, যাঁদের মধ্যে সেকালের বিখ্যাত লোকেরা ততটা ছিলেন না, যতটা ছিলেন সাধারণ মানুষ। বিখ্যাত মানুষদের 'ইমেজ' রক্ষার দায়বদ্ধতা ছিল বলে তাঁরা প্রকাশ্যে অনেকেই বেশ্যাদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারেননি। .....অন্যদিকে মূল ক্ষমতাকেন্দ্রে বা জ্ঞানচর্চার মূল বৃত্তে বেশ্যাদের বিপক্ষে তৈরি হয়েছিল প্রবল বিরোধ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের দৃষ্টান্তমূলক চিত্র। এখানে সংগঠিত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রচুর নামকরা বুদ্ধিজীবী, মনীষী, সমাজ-সংস্কারক। এঁরা মনে করতেন বেশ্যাদের বাড়বাড়ন্ত সমাজকে কলুষিত করবে"।

অবশেষে নানা টালমাটাল ও অস্থিরতার পর "বেশ্যাদের সম্পর্কে নানাধরনের আপত্তির ফলে ১৮৬৮ সালে যে 'চোদ্দো আইন'-এর প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে ইংরেজ সরকার এদেশীয় ভদ্রলোকদের দাবিকে যে শুধুমাত্র রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তা নয়, তাঁদের সেনাবাহিনীতে যাতে কোনও বেশ্যা সংসর্গে যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব না ঘটে সে বিষয়েও সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে বেশ্যাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরীক্ষা করিয়ে রেজিস্ট্রি করে পেশা চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারিভাবে বেশ্যাদের স্বীকৃতি"।

কেমন ছিল সেই কুখ্যাত 'চোদ্দো আইন'? শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগ্রহীত "বেশ্যা গাইড" গ্রন্থে সংকলিত "১৪ আইন" হুবহু তুলে ধরলাম ঃ "(১) ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রিল তারিখে তাহার পর অবধি কলিকাতায় কিম্বা সহর তলিতে কোন স্ত্রীলোক কিম্বা কোন

ব্যক্তি আপন২ বাসস্থান যে থানার অধীন সেই থানায় রেজিষ্টরি না করিয়া বেশ্যাবৃত্তি এবং বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম করিতে পারিবে না। (২) প্রত্যেক থানায় ইনস্পেক্টর আপন থানার এলাকায় যে সামান্য বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক বাস করে তাহাদের রেজিষ্টরি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। (৩) কোন স্ত্রীলোক সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিলে আপন নাম, বয়স, জাতি বা ধর্ম্ম, জন্মস্থান, বাসস্থান, ও যে সময়ে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যদ্যপি সে কোন বেশ্যালয়ে বাস করে তাহা হইলে সেই বাটীর কর্ত্তারও রক্ষকের নাম এবং পরে লিখিত জেনরেল রেজিষ্টারি বহিস্থ তাহার নম্বর এই সকল বৃত্তান্ত থানায় নিজে আসিয়া লেখাইতে হইবেক। (৪) থানার ইনস্পেক্টর উক্ত সকল বিবরণ পাইবামাত্র থানায় রেজিষ্টরি বহি (ফারম ঙ) রাখা হইবে সেই বহিবে তাহা লিখিয়া ঐ টিকিট কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহার আপিসে পাঠাইয়া দিবেন। (৫) থানায় রেজিষ্টরি বহির ন্যায় সমুদায় সহর ও সহরতলির জন্য পুলিশ আপীসে যে জেনরেল রেজিষ্টরি বহি রাখা হইবে সেই বহিতে কমিশ্যনার সাহেব ঐ স্ত্রীলোককে রেজিষ্টারি করিবেন, জেনরেল রেজিষ্টরি বহিতে ঐ স্ত্রীলোকের যে নম্বর পড়িবে সেই নম্বর রেজিষ্ট্রেসন টিকিটের প্রথম ঘরে লিখিতে হইবে। ইহা লেখা হইলেই উক্ত টিকিট কমিশ্যনার বা ডিপুটি কমিশ্যনার সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া থানার ইনস্পেক্টরের নিকট প্রেরিত হইবে। ইনস্পেক্টর আপন রেজিষ্টরি বহিতে উক্ত রেজিষ্টেসন টিকিটে লিখিত নম্বর লিখিয়া যাহার টিকিট তাহাকে দিবেন। (৬) প্রত্যেক বেশ্যালয় রক্ষক যে থানার এলাকায় আপন কর্ম্ম চালায় সেই থানায় তাহাকে রেজিষ্টরি করিতে হইবেক আর রেজিষ্টরি করিবার সময় আপন নাম, বাসস্থান এবং যে বাটীতে, কি ঘরে, কি স্থানে, আপনার বৃত্তি চালায় তাহা যে স্থানে থাকে তাহা লেখাইতে হইবেক থানার ইনস্পেক্টর উক্ত বিবরণ থানায় যে রেজিষ্টরি বহি (ফারম ঙ) রাখা হইবে সেই বহিতে লিখিয়া লই-বেন। তৎপরে রেজিষ্টরি টিকিট (ফারম ঙ) লিখিয়া ঐ টিকিট কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহার আফিসে পাঠাইয়া দিবেন। (৭) কমিশ্যনার সাহেব তাঁহার আফিসে এক বহিতে প্রত্যেক বেশ্যালয় রক্ষকের নাম এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত লেখাইয়া রাখিবেন। (৮) কমিশ্যনার সাহেবের আফিসের জেনেরেল রেজিষ্টরি বহিতে বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্ট্রসনের যে নম্বর হইবেক টিকিটেও সেই নম্বর দেওয়া হইবেক, আর ঐ টিকিট কমিশ্যনার কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখত হইলে যে থানার এলাকায় ঐ বেশ্যালয় রক্ষক আপন বৃত্তি চালাইতে চাহে সেই থানার ইনস্পেক্টরের নিকটে পাঠান হইবেক। (৯) কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা টিকিটে যে নম্বর দেওয়া হইবেক সেই নম্বর ইনস্পেক্টর রেজিষ্টরি বহিতে লিখিয়া যাহার টিকিট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। (১০) যদি কোনো স্ত্রীলোক কিম্বা কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টরি না করিয়া এবং পূর্ব্বমতে রেজিষ্ট্রেসন টিকিট না লইয়া বেশ্যাবৃত্তি করে কিম্বা বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম চালায় তাহা হইলে তাহার বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার হইয়া ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনমতে বিচার হইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সোপরর্দ্দ হইবেক। (১১) কোন রেজিষ্টরি করা বেশ্যা আপন বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে কমিশ্যনার বা ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের

সমীপে স্বয়ং কিম্বা ইংরাজি দ্বারা যে গলিতে উঠিয়া যাইতে মানস করে তাহার নম্বর ও নম্বর জানাইতে হইবেক, আর রেজিষ্ট্রেসন টিকিট ফিরাইয়া দিতে হইবেক। যদ্যপি কোন বেশ্যালয়ে থাকিতে মানস করে তবে সেই বেশ্যালয়ের রক্ষকের নাম ও রেজিষ্টেসন নম্বর লেখাইতে হইবেক। (১২) এরূপ দরখাস্ত পাইলে কমিশ্যনার সাহেব রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে ও জেনেরেল রেজিষ্টরি বহিতে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত টিকিট ঐ স্ত্রীলোককে ফিরাইয়া দিবেন এবং পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোক যে থানায় রেজিষ্টরি হইয়াছে সেই থানা হইতে তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যে থানার এলাকায় সে উঠিয়া যাইতে মানস করে সেই থানায় তাহাকে পুনরায় রেজিষ্টরি করিতে আদেশ করিবেন। (১৩) কোন বেশ্যা রেজিষ্টার করিয়া অত্র সহরে কিম্বা সহরতলীতে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে স্বয়ং কিম্বা ইংরাজি দরখাস্ত দ্বারা কমিশ্যনার সাহেবকে জানাইতে হইবেক যে তাহার নাম রেজিষ্টরি হইতে উঠাইয়া ফেলা হয় এবং ঐ স্ত্রীলোক যথার্থ বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে এমত প্রমাণ পাইলে কমিশ্যনার সাহেব তাহার নাম জেনেরল রেজিষ্টর ও থানার রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিবেন এবং তাহার রেজিষ্ট্রসন টিকিট ফিরাইয়া লইবেন। এবং যে পর্যন্ত ঐ দরখাস্তের চূড়ান্ত হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত কমিশ্যনার সাহেব যদি উচিত বিবেচনা করেন তাহা হইলে স্ত্রীলোককে ডাক্তারের পরীক্ষা হইতে মুক্ত করিতে পারিবেক। (১৪) যদি কোন বেশ্যালয়-রক্ষক আপন বাসস্থান কিম্বা ব্যবসার স্থান পরিবর্ত্ত করিতে চাহে তাহা হইলে সে যে স্থানে উঠিয়া যাইবেক তাহার নাম ও নম্বর দিয়া বেশ্যালয়-রক্ষক আপন বাসস্থান কিম্বা ব্যবসার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহে তাহা হইলে সে যে স্থানে উঠিয়া যাইবেক তাহার নাম ও নম্বর দিয়া কমিশ্যনার সাহেবের নিকট এক ইংরাজি দরখাস্ত করিতে হইবেক আর সেই দরখাস্তের সহিত রেজিষ্ট্রেশন টিকিট দাখিল করিতে হইবেক"—ইত্যাদি।

ফরাসি, পোর্তুগিজ এবং সবশেষে ব্রিটিশ উপনিবেশ গড়ে ওঠার ফলে ভারত উপমহাদেশে এক অদ্ভুত পরিবর্তন বেশ্যাদের পেশায়। বিদেশিদের অসংযমী এবং অবাঞ্ছিত যৌনজীবন দরুন নতুন কিছু কালান্তক যৌনরোগের আমদানি হল। বেশ্যাবাড়ি যাওয়া যাঁদের কাছে স্ট্যাটাস-সিম্বল হয়ে দাঁড়াল, যাঁদের বেপরোয়া যৌন-সম্ভোগে সিফিলিস এবং গনোরিয়ার মারণরোগ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র - সেই সময় থেকেই বেশ্যা এবং বেশ্যাবাড়ি ক্রমশ ঘৃণিত ও নিন্দিত হতে থাকল। কারণ সিফিলিস এবং গনোরিয়া অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ ছিল। সংক্রমিত হত শরীর থেকে শরীরে। শোনা যায়, সিফিলিস যৌনরোগটি নাকি ফরাসিদের থেকেই আমদানি হয়েছিল। যাই হোক, এই দুটি রোগই যৌনাঙ্গটিকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করে দিত। যৌন-সংসর্গের মধ্য দিয়েই এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ নারীর কাছ থেকে এবং নারী পুরুষদের কাছ থেকে সঙ্গমকালে এই রোগটি ছোঁয়াচ পায়। পুরুষেরা বহুগামী বেশ্যাদের কাছ থেকে, আর সংশ্লিষ্ট সেই পুরুষটির কাছ থেকে তার স্ত্রী এই রোগ শরীরে গ্রহণ করে থাকে। এইসব রোগগুলি থেকে অব্যাহতি পেতে হলে যাঁদের এই রোগগুলি আছে তাঁদের সঙ্গে এক্কেবারে যৌন-সংস্পর্শ করা চলবে না। অবিশ্বস্ত, অজ্ঞাত, অচেনা যৌনসঙ্গী মানেই সাক্ষাৎ সন্ত্রাস

প্রতিপন্ন হল। বেশ্যা এবং বেশ্যাপল্লি মানেই সিফিলিস ও গনোরিয়ার আতুরঘর! যতই বেশ্যাগণ ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য গণ্য হতে থাকল, ততই প্রান্তিক হতে থাকল। বেশ কয়েক যুগ কেটে গেল এইভাবে। এরপর রসিক-রসকিনীদের চোখেমুখে আলো দেখা গেল। সিফিলিস আর গনোরিয়া নির্মূলের অব্যর্থ প্রতিষেধক মেচনিকফ মলম, পেনিসিলিন এবং সালফাথিয়াজোল চলে এত হাতে। তখনও পর্যন্ত কন্ডোমের ব্যবহার তেমনভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। অতএব মেচনিকফ মলম, পেনিসিলিন এবং সালফাথিয়াজোলের আর্বিভাবে যৌনজীবনে নতুন করে বিপ্লব এলেও বিংশ শতাব্দীতে উদয় হল "এইডস" নামক ত্রাস। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি সুযোগ পেলে।

ভারতের কয়েকটি প্রদেশে রাজাদের অধীনে 'নাইক' নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। নাইক মেয়েরা সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য বেশবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হত। এনসাইক্লোপিডিয়ার ভাষ্য মতে, নগরসভ্যতা বিকাশের ফলে ক্রমশ যৌনতার প্রসার ঘটতে থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লিভিয়ান ও সাইপ্রিয়ান জাতির মেয়েরা দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে গিয়ে বেশাবৃত্তি করে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। পুরোহিতরা সে সময় ধর্মের নামে কখনো-কখনো মেয়েদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করত। চিনে তাঙ রাজবংশ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বেশ্যাবৃত্তি চালু করেছিল। পরবর্তী "সাঙ" রাজবংশ বিভিন্ন স্থান থেকে পতিতাদের সংগ্রহ করে "হাঙ চৌ" শহরে সীমাবদ্ধ করে দেয়, অর্থাৎ তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট পতিতালয়। সেটা একাদশ শতাব্দীর ঘটনা। বহু আগে প্রাচীন গ্রিস ও রোমে এ ধরনের পতিতাবৃত্তির উৎপত্তি। এ ধরনের মানে হল নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রেখে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি আলয় নির্মাণ করেছিলেন। প্রাচীন হেল্লাস বা গ্রিস দেশের আথেনাই বা এথেন্সে বেশ্যালয় ছিল-ছিল ব্যাপকভাবে বেশ্যাবৃত্তি। পৃথিবীতে প্রথম বেশ্যাবৃত্তি পেশার মতো লাইসেন্স বা নিবন্ধন দেওয়া ও কর ধার্য করা হয় রোমান আমলেই। সে আমলে চিন, ভারতবর্ষ সহ অনেক দেশেই পতিতাবৃত্তি ধর্মীয় উপাসনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মহাভারতের সমাজে প্রান্তবাসিনী ছিলেন না। শহুরে সংস্কৃতিতে বেশ্যারা যে এক তাৎপর্যময় স্থান অধিকার করেছিল সে কথা মেলে মহাভারতের অনেক গর্বে, সে কথা আগেই বলেছি। বল্লালসেনের রাজত্বকালে প্রবর্তিত হয় কৌলিন্য প্রথা। মূলত এটাই এক ধরনের পতিতাবৃত্তি বলে মনে করে অনেকে। কুলীন ব্রাহ্মণ পুরুষেরা অর্থের বিনিময়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিয়ে করে আসত। এভাবে একেক জনের শতাধিক স্ত্রী থাকত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সবাইকেই সময় দিতে পারত না। ফলে কখনো-কখনো অতৃপ্ত যৌবনবতী স্ত্রীরা লিপ্ত হত ব্যাভিচারে, মেতে উঠত বেশ্যাবৃত্তিতে।

আদিম সমাজে পতিতাবৃত্তি আয়ের উৎস হিসাবে যথেষ্ট আদৃত হত। ধর্মের দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে, পিতা-মাতা, স্বামীর পক্ষ থেকে কোনোদিন ঘৃণা করা হত না। তা ছাড়া মেয়ের উপর পিতা বা স্বামীর একছত্র অধিকার ছিল বলে দুর্দিনে তারা আর্থিক উন্নতির জন্য তাদের কর্তৃত্বাধীন মেয়েদের যৌন ব্যবসায়ে উৎসাহ দিত। ঈশ্বরের পরেই স্বামীর স্থান, তাই স্বামীকে সাহায্য করা মানেই ধর্মীয় কাজ হিসাবে পরিগণিত হত। রোমানরা

বেশ্যালয়কে নুপানরিয়া (Lupanaria) বলত। তারা ক্রীতদাসীকে সবসময় বেশ্যা হিসাবে কাজ করাত। যখন এদের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন বেশ্যাদের আলাদা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। অনেকসময় বেশ্যাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে রোমান যুবকেরা বিয়ে করতে শুরু করল। তখন রক্তের পবিত্রতা ও বংশের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বেশ্যালয় তুলে দেওয়ার জন্য বিপ্লব দানা বেঁধে উঠে। কিন্তু সম্রাট বেশ্যালয় থেকে প্রচুর খাজনা পেত বলে আর্থিক দিক চিন্তা করে পতিতাবৃত্তি একেবারে নিষিদ্ধ করা সম্ভব হল না। প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে খুবই মেলামেশা করত। প্রীচীন যুগে বিভিন্ন স্থানে যে বেশ্যবৃত্তি প্রচলিত ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ওল্ড টেস্টামেন্ট। পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দীতে বেশ্যাবৃত্তির প্রসারে বাঁধা সৃষ্টি হয়। তখন ইউরোপের সর্বত্র সিফিলিস রোগ দেখা দেয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে প্যারিসে রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা স্থাপিত হয়। পতিতাবৃত্তির প্রসার যেভাবে ব্যাপক আকার ধারণ করছে, তা বাংলা সংস্কৃতির মূলধারায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। নারীর শরীর নিয়ে বিকিকিনি করার এই বর্বর চর্চার উনুনে। নিঃশব্দে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আজ সারাবিশ্বের সমাজব্যবস্থায় পতিতাবৃত্তি নিচুতলা থেকে উঁচুতলায় প্রসারমাত্র এক দূরারোগ্য সামাজিক সংস্কৃতি। মূলত শিল্প বিপ্লব পরোক্ষভাবে বেশ্যাবৃত্তিকে উৎসাহিত করেছে। এ বিপ্লবের ফলে ব্যাপক নগরায়ণ ঘটে। অর্থনৈতিক শোষণের দরজা খুলে যায়। আধুনিক পতিতাবৃত্তি উন্মেষ ঘটে সঙ্গে সঙ্গে। নগরায়ন, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার — এই ত্রিবিধ কারণে আধুনিক বেশ্যাবৃত্তি বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবাব সিরাজউদদৌলার পতনের পর এই ভূখণ্ডে পতিতারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমদানি হতে থাকে। ইংরেজ এবং তাদের রাজকর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রভৃতি প্রদেশ থেকে বেশ্যাদের ঝাঁকে ঝাঁকে এই বাংলায় নিয়ে আসা হয়।

'কোম্পানি আমলে ঢাকা' গ্রন্থে জেমস টেলর উল্লেখ করেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ঢাকা শহরে সংগঠিত আকারে পতিতাবৃত্তির অস্তিত্ব ছিল। ১৯০১ সালের ব্রিটিশ আদমশুমারিতে পতিতাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'অদক্ষ শ্রমিক', যারা কৃষি কাজে নিয়োজিত নয় বলে। বাংলাদেশে ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের আদম শুমারি পতিতাদের পতিতা পরিচিতিকে তুলে ধরা হয় পেশা হিসাবে। বাংলাদেশের প্রায় ৩ লাখ নারী ভারতের পতিতালয় এবং ২ লাখ নারী পাকিস্তানের পতিতালয়ে কাজ করছে। ৬০ থেকে ৬৫ হাজার তালিকাভুক্ত পতিতা রয়েছে বাংলাদেশে। নিষিদ্ধপল্লিতে থেকে দেহব্যাবসা করার মতো রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হলেও দেশব্যাপী প্রায় লক্ষাধিক পতিতার আবাসস্থল এখন নিষিদ্ধপল্লিতে। এছাড়া প্রায় অর্ধলাখ পতিতা রয়েছে ভাসমান।

অর্থনৈতিকভাবে, নারীর দেহ এবং নারীর যৌনতা এক মূল্যবান পণ্য। অর্থনৈতিক পণ্য হিসাবে নারীর এই অবমূল্যায়ন হ্রাস করতে কেউ পছন্দ করুক-বা নাই করুক, দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজেই এই ব্যবস্থা বাস্তবিক এবং নিত্য — তাই তা কোন্ স্থানের, সমাজের এবং সংস্কৃতির উট, গোরু, ভেড়া কিংবা ঘোড়াই হোক না-কেন অথবা অন্যদিকে ডলার, ইউরো,

ইয়েন বা ইউয়ানের চুক্তি।

প্রাচীন যুগে বেশ্যাদের প্রকারভেদ পূর্বেই আলোচনা করেছি। সময় বদলেছে, সময় বদলেছে সর্বত্র। বেশ্যাবৃত্তির ধরনেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। এসেছে নতুন ধরনের বিভাজন।

(১) **Street Prostitute** ঃ এরা ক্লায়েন্ট বা খরিদ্দার ধরার জন্য বিভিন্ন রাস্তায়, পার্ক বা অন্যান্য পাবলিক জায়গা, রাস্তায় পাশে, যানবাহন বা সংকীর্ণ কোনো ঘুপচিতে যৌনক্রিয়া বা যৌন-পরিসেবা সম্পন্ন করে থাকে। (২) **Brothel** ঃ **Brothel** বা বেশ্যালয় বা কোঠিতে ঘর ভাড়া দিয়ে বা ঘর ভাড়া নিয়ে ঘোষিতভাবে যৌনকাণ্ড চালানো হয়। এখানকার রাস্তার তুলনায় উন্নত নিরাপত্তা এবং রোজগারের নিশ্চয়তা বেশি। কোনো কোনো দেশে এরা কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাইসেন্সকৃত। (৩) **Escort** ঃ এই যৌনকর্মীরা ফোন করে বা হোটেল কর্মীদের মাধ্যমে বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা সেক্রেটারি বা এজেন্টের মাধ্যমে খরিদ্দারের সঙ্গে পারিশ্রমিকে রফা করে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। এটি হল যৌনকর্মের সবচেয়ে গোপন এবং আধুনিক ফর্ম। এরা ক্লায়েন্টের বাড়ি অথবা হোটেল-রিসর্ট, সার্কিট হাউসে মিলিত হন। তবে যে-কেউ এদের শরীর-সঙ্গ লাভ করে পারেন না। সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের মধ্যেই সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ এরা তুলনামূলকভাবে কস্টলি বা ব্যয়বহুল। (৪) **Private** ঃ এরা ব্যক্তিগতভাবে শাঁসালো ক্লায়েন্ট খুঁজে নিয়ে স্বাধীনভাবে কোনো বিলাসবহুল হোটেলে যৌনক্রিয়া করেন এবং তা অত্যন্ত গোপনে সম্পন্ন হয়। এঁদের পারিশ্রমিকও বেশ তুঙ্গে থাকে। এঁরা ভ্রমণসঙ্গী হিসাবেও ক্লায়েন্ট সংগ্রহ করে ক্লায়েন্টের ঘাড় ভেঙে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। (৫) **Window or doorway** ঃ জানালা বা প্রবেশপথের মাধ্যমে বেশ্যালয়ের বেশ্যারা ক্লায়েন্টকে আহ্বান করেন। উইন্ডোরা সাধারণত উষ্ণ জায়গা পছন্দ করে এবং ডোরওয়েরা সাধারণত ঠান্ডা জায়গাই পছন্দ করে। (৬) **Club, Pub, Bar, Karaoke Bar, Dancehall** ঃ এই ধরনের বেশ্যারা ক্লাব, পাব, বার, কারাওকে বার, নাচ হল, মদ ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস খুচরো বিক্রির স্থানগুলি থেকে ক্লায়েন্টদের যৌনমিলনের জন্য আবেদন রাখেন। (৭) **Other all-made venues** ঃ এইসব বেশ্যারা যেখানেই নিয়মিত পুরুষের সমাবেশ (যেমন সেনা-ছাউনি, বাজার-ঘাট, ব্যস্ত রেলস্টেশন ও বাসস্টপ, খনি-ক্যাম্প, অপেক্ষারত ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি) সেখানেই হাজির হয়ে ছুকছুকে পুরুষদের কাছাকাছি এসে যৌনমিলনে আহ্বান করে। (৮) **Door knock or hotel** ঃ এঁরা হোটেলে বসবাসরত পুরুষদের যৌনমিলনে আহ্বান করে। (৯) **Transport (Ship, Truck, Train)** ঃ এইসব বেশ্যাগণ চলমান বাস, ট্রেন, জাহাজে উঠে ভ্রমণরত যাত্রীদের যৌনমিলনে আহ্বান করে। (১০) **CB radio** ঃ এইসব যৌনকর্মীগণ সম্ভাব্য ট্রাক ড্রাইভার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ (অপভাষা) বার্তা CB রেডিও ব্যবহার করে হাইহয়ে বরাবর ড্রাইভ করে ট্রাক স্টপ বা পার্কিং এলাকায় যৌন-পরিসেবা দেয়। (১১) **Other methods of solicitation** ঃ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে, যেমন নোটিশ বোর্ড এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, মোবাইল ফোন নম্বর সহ

'যৌন কর্মী ক্যাটালগ', ইন্টারনেট মাধ্যমে ভার্চুয়াল পতিতালয় এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ স্থানগুলিতে যৌন-পরিসেবা বিতরণ করা হয়। **(১২) Phone-Sex with Recharge ঃ** এই এক ধরনের যৌনকর্মীর দেখা মেলে যাঁরা মোটা অঙ্কের মোবাইল রিচার্জের শর্তে রগরগে ফোন-সেক্স করে থাকে। **(১৩) Massage Parlour ঃ** বিভিন্ন ম্যাসাজ পার্লার, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, নামি-দামি বিউটিপার্লারে মেল টু মেল, মেল টু ফিমেল, ফিমেল টু মেল, ফিমেল টু ফিমেল ম্যাসাজ দেওয়া হয়। প্রথমে মিনিট দশেক ক্লায়েন্টকে নগ্ন করে শুইয়ে ম্যাসাজ করা হয়। এই ম্যাসাজটুকু ক্লায়েন্ট সন্তুষ্ট হলে তার মূল্য একরকম হয়, যদি ক্লায়েন্ট আরও বেশি চায় বা যৌনমিলনে আগ্রহী হন তবে তার মূল্য একটু চড়াই হয়। এ পর্যায়ে প্রতি ঘন্টায় স্লাভে মূল্য নির্ণয় হয়। আজকাল বেশ্যালয়ের অন্দরমহলেও এরকম ম্যাসাজ পার্লারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এখন প্রশ্ন হল কারা বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নেন? সমাজতাত্ত্বিকরা প্রচুর গবেষণা করেছেন কোন্ শ্রেণির মেয়েরা এই পেশা বেছে নেন। তাতে দেখছি প্রায় একবগ্গা সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে বারবার। সমাজতাত্ত্বিকরা সেই ভাঙা রেকর্ডের মতো দুঃখের কাহিনি শোনাতে থাকে। সাহিত্যিক, কলামিস্ট, সাংবাদিকরাও একই গল্প শোনাতে থাকেন। দুঃখ বাজারে ভালো বিকোয়। তাই এরা শুধুই দুঃখ বেচেন। শুধু সাহিত্যিক, কলামিস্ট, সাংবাদিকরা কেন-বেশ কিছু এনজিও সংস্থাও দুঃখ-উদ্ধারকারী সেজে মোটা অঙ্কের বিদেশি মুদ্রা ঘরে তুলছেন। বেশ্যারা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থাকেন। তবে দুঃখ যে একেবারেই নেই একথা আমি একবারও বলব না। দুঃখ অবশ্যই আছে। বিভিন্ন শ্রেণির বেশ্যাদের কাছাকাছি গিয়ে সমীক্ষা করে দেখেছি এই পেশায় আগতরা সবাই দুঃখী নয়। তবে মেয়েলি স্বভাবজাত কারণে "দ্যাখো, আমি কত সতী" বাধ্য হয়েই এসেছি এমন একটা গল্প শোনানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায় কারোর কারোর মধ্যে। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি অনেক বেশ্যাদের ঘরবাড়ি কীরকম আলিশান, সম্ভ্রান্ত। আর্থিক অবস্থাও যথেষ্ট সচ্ছল। গ্ল্যামার দুনিয়ার কত স্বনামধন্য মেয়েরা এসকর্ট গার্লের সার্ভিস দেয় তাঁর খবর কে রাখে? টলিউড, বলিউড, কলিউড, হলিউড, মলিউড - সব জায়গাতেই একই ছবি লক্ষ করা যাবে। এরা কেউ গরিব নন, আর্থিক অনটনে দিন গুজরান করেন না। রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভ ও যথেচ্ছ যৌনতার অত্যন্ত গোপনে দেহব্যাবসা অব্যাহত রাখেন এরা। ইচ্ছাকৃতভাবে যাঁরা দেহব্যাবসায় আসেন তাঁদের কথায় পরে আসছি। তবে অনিচ্ছাকৃত যাঁদের বেশ্যাবৃত্তিতে এসে পড়তে হয় তাঁদের কথা দিয়েই শুরু করব।

(১) প্রতারক কর্তৃক পাচারকৃত বেশ্যা ঃ বেশ্যালয়ে যে সমস্ত বেশ্যারা বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো প্রতারকের হাত ধরে পতিত হয়েছেন। এই মহামান্য প্রতাকরা কখনো সৎ বাবা বা সৎ মা, কখনো দাদা-কাকা-মামা, কখনো-বা প্রেমিকপ্রবর, কখনো স্বামী, কখনো ওয়েল উইশারের ছদ্মবেশে সুজনবন্ধু। এরা দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে চাকরি বা কাজের বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শহরে এনে বেশ্যাপল্লিতে

মোটা টাকায় মেয়েদেরকে বিক্রি করে দেয়। অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এই নারীদেহ পাচারের ব্যবসা - গুণ্ডা, দালাল থেকে শুরু করে বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মানুষ মিলে এই জাল বিস্তার করেছে।

পণ্য সর্বস্য আগ্রাসী দুনিয়ায় সবচেয়ে লোভনীয় পণ্য হল মানুষ - লোভনীয় মানুষের চাইতে সবচেয়ে লোভনীয় পণ্য কী? অবশ্যই মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের ব্যাবসা অত্যন্ত লাভজনক ব্যাবসা। প্রায় বিনিয়োগহীন ব্যাবসা, তাই এই ব্যাবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সমাজের হতদরিদ্র নিম্নস্তর থেকে সমাজের উঁচুস্তরের মহামান্য মানুষজনও। বেশ্যাপল্লির নারীর জোগান মিটবে কীভাবে? কীভাবে সমৃদ্ধ হবে বেশ্যাপল্লি "নয়া চিড়িয়া"-য়? অতএব পাচার - এ পাচার-যজ্ঞ আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, মাতৃগর্ভের কন্যাসন্তানটিও পাচার হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীল বাবা-মায়েরাও মেয়ে-সন্তানদের বিক্রি করে থাকে। এইসব বাবা-মায়েদের কাছে প্রতিটি সন্তানই রোজগারের যন্ত্র। পুরুষ-সন্তানদেরও ঠেলে দেওয়া হয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কর্মজীবনে, শৈশবেই। মেয়ে-সন্তানদের অগতির গতি পাচারকারী প্রাচীন যুগেও ছিল, এরাই "বিট" নামে পরিচিত ছিল - এখন এরা "আড়কাঠি"। একদা যেটা সম্রাট বা রাজা বা জমিদাররা নিজস্ব লেঠেল বাহিনীদের কাজে লাগিয়ে মেয়েদের তুলে আনত বাইজি বা বেশ্যা বা রক্ষিতা বানানোর জন্য, আজও মেয়েদের ফুসলিয়ে আনা হচ্ছে প্রলোভন দেখিয়ে। ভারতে ব্রিটিশ আমলে ইংরেজশাসকগণের এবং সেনাদের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন নতুন বেশ্যাপল্লি গড়ে ওঠে। সেই বেশ্যাপল্লিগুলি ফলেফুলে ভরিয়ে তুলতে ইংরেজদের পা-চাটা কতিপয় নারী-পুরুষ প্রত্যন্তগ্রামে পাড়ি জমাত অসহায় মেয়েদের সংগ্রহ করতে। তার বিনিময়ে পাওয়া যেত প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন। এমনকি অতি লোভে দেবদাসীদের (যদিও দেবদাসীদের দিয়েও বেশ্যাবৃত্তি করানো হত মন্দিরে মন্দিরে) পর্যন্ত তুলে আনা হত এই বেশ্যালয়গুলিতে। ১৯৬০ সালের এক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, ভারতে দেহব্যাবসা এক ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এই ব্যাবসার রূপ ও চরিত্র বদলে যায়, বদলে যায় খরিদ্দারদের রুচি ও ধরন। একদা যে স্ফূর্তি শুধু রাজরাজড়া, জমিদার এবং উচ্চ শ্রেণিদের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল, ক্রমে ক্রমে তা হল সাধারণেরও স্ফূর্তির ব্যাপার। যত পয়সা ফেললেই নারী-শরীর এক্কেবারে হাতের মুঠোয় কে নয়-ব্যাগ কাঁধে ছাত্র, বাস-লরির চালক, রিক্সাচালক থেকে শুরু করে পুরু চশমাধারী পড়ন্ত-যৌবন পুরুষ, ধুতি-পাঞ্জাবি লপেটাবাবু, জিনস, সাফারি, আদালতের সামলা-পরিহিত তাবৎ পেশার লোকজনদের দেখা মেলে বেশ্যাদের পাড়ায় পাড়ায়। ভারতের প্রধান প্রধান শহর কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাইতেই বেশ্যালয় সীমাবদ্ধ রইল না - প্রধান প্রধান শহর ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে একেবারে জেলায় জেলায় জেলার বিভিন্ন শহর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। আর যত প্রসার পাচার। যত চাহিদা ততই জোগান - যেমন চাহিদা চড়চড় করে বাড়ছে, তেমনি জোগানও তড়তড় করে আসছে। প্রথম প্রজন্মের মেয়েরা ছিল বেশিরভাগই বিধবা বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বা এমন গৃহবধূ যাদের প্রেমিকারা মায় পরিচিত জনেরা প্রতারণা করে এই পথে পাচার করে। উনিশ শতকের বেশিরভাগ সময়

জুড়ে মূল কারণ এরকমটা থাকলেও পরবর্তীকালে দারিদ্রই মূল কারণ হয়ে ওঠে। প্রায় ৪৪ শতাংশ মেয়েই দারিদ্রের জন্য বেশ্যাবৃত্তির পথে এসে পড়ে। ধীরে ধীরে পাচারকারীদের হাত লম্বা হতে থাকে। এতটাই লম্বা যে, পাচারকারীদের সেই হাত আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পাচার-বাজারে অসহায়-হতদরিদ্র মেয়েরা মুড়ি-মুড়কির মতো বিকিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত- প্রতিক্ষণ। কারণ বিনাপুঁজিতেই এই ব্যবসা শুরু করে দেওয়া যায় - কে নেই এই পাচারের ব্যাবসায়? অন্তিম-যৌবনা প্রাক্তন বেশ্যারমণী থেকে শুরু করে সাধারণ ঘরের পুরুষ, সাধারণ ঘরের নারী, পাশের বাড়ির বউদি, পাশের বাড়ির দাদা, ধনীঘরের লালটুস প্রেমিকপ্রবর, পাড়াতুতো জেঠিমা-কাকিমা সবাই এ কাজে নেমে পড়েছেন। শ্রমিক জোগান দেওয়া ঠিকাদার এবং কর্মনিয়োগকারী এজেন্টরাও এখন মেয়ে সাপ্লাইয়ের কাজে নেমে পড়েছে।

(২) যুদ্ধ-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশভাগের পরিণতিতে বেশ্যা ঃ আদিম কাল থেকে যুদ্ধের নামে বর্বরতার শিকার নারী — এটা সর্বত্র সত্য, সব দেশেই। মধ্যযুগের ইউরোপেও কোনো গোষ্ঠী যুদ্ধে হেরে গেলে মহিলাদের ধরে ধরে ধর্ষণ করা হত। ইতিহাসেও দেখা যাবে মেয়েদের জোর করে ধর্ষণ করে নিজেদের ধর্মে আনার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন ধর্মাশ্রিত শাসক-সম্প্রদায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রচুর বাঙালি রমণী। ঠিক কতজন যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান কারোর জানা নেই। বীণা ডি' কস্টা তার "Bangladesh's erase past" প্রবন্ধে জানাচ্ছেন যে, সরকারি হিসাব অনুযায়ী একাত্তরে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল দুই লক্ষ নারীকে। একটি ইটালিয়ান মেডিক্যাল সার্ভেতে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা বলা হয়েছে চল্লিশ হাজার। লন্ডন ভিত্তিক International Planned Parenthood Federation (IPPF) এই সংখ্যাকে বলেছে দুই লাখ। অন্যদিকে যুদ্ধ শিশুদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সমাজকর্মী ডঃ জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি। সুজান ব্রাউনমিলারও ধর্ষিতার সংখ্যা চার লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাত্তর বছরের ঠাকুরমা-দিদিমার বয়সি বৃদ্ধাও এই ধরনের লালসার শিকার হয়েছিল। পাকসেনারা ঘটনাস্থলেই তাদের পৈচাশিকতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; প্রতি একশো জনের মধ্যে অন্তত দশ জনকে তাদের ক্যাম্প বা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হত সৈন্যদের জন্য। রাতে চলত আর-এক দফা নারকীয়তা। কেউ কেউ হয়তো আশিবারেও বেশি সংখ্যক ধর্ষিত হয়েছে! এই পাশবিক নির্যাতনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আর কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা হয়তো কল্পনাও করা যাবে না (Brownmiller, p. 83)। কতজন ধর্ষিতা নারী গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল তার পুরোপুরি অনিশ্চিত। সামাজিক অপবাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক মা-ই সেইসময় আত্মহত্যা করেছিলেন। অসংখ্য গর্ভবতী মহিলা চলে গিয়েছিলেন ভারতে বা অন্য কোথাও গোপনে সন্তান প্রসব করার জন্য। অনেক শিশু জন্মেছিল ঘরে দাইয়ের হাতে, যার কোনো রেকর্ড নেই। সরকারি এক হিসাব জন্মগ্রহণকারী

শিশুর সংখ্যা বলা হয়েছে তিন লাখ। কিন্তু সেই পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ডঃ ডেভিসের মতে প্রায় দুই লক্ষ রমণী গর্ভবতী হয়েছিলেন। শেখ মুজিব ধর্ষিতা নারীদেরকে বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত এবং তাদেরকে নিজের মেয়ে হিসাবে উল্লেখ করলেও সেই মেয়েদের সন্তানদের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই ছিল না। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, পাকিস্তানীদের রক্ত শরীরে আছে এমন কোনো শিশুকেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া যাবে না। যে-কোনো যুদ্ধের বাস্তবতা এই যে, যুদ্ধ করেন পুরুষরা। বিজয়ী বা পরাজিত কোনো পক্ষে নারী-যোদ্ধা নেই। যুদ্ধে নারী লুণ্ঠিত হয়, নারী ধর্ষিত হয়, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে নারীধর্ষণের তাণ্ডব চালায়। কারণ নারীরা হয় অধিকার স্থাপনের চূড়ান্ত উপায়। যুদ্ধের প্রান্তরে নয়, জয়-পরাজয় নারীর শরীরে হয় নির্ধারিত। ধর্ষণের গল্প বলছি না, বলতে চাই ট্র্যাজেডির কাহিনি। যাঁদের জন্য নারীর সম্মান ধুলিস্যাৎ হল তাঁরাই প্রত্যাখ্যান করল ঘৃণাভরে। সেইসব বীরাঙ্গনা নারীর বেশিরভাগটাই বারপল্লির বারাঙ্গনা হয়েই থেকে যেতে হল। দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, সম্মান পায় না ধর্ষিতা বীরাঙ্গনা। মনে রাখতে চায় না কেউ। সমাজ "বেশ্যা" বলে তিরস্কার করে তাঁদের। অতএব অভাগাদের আশ্রয়ের শেষ ঠিকানা - বেশ্যালয়। সমৃদ্ধ হয় বেশ্যালয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বীরাঙ্গনা নারীদের মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সন্তানদের মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের এখন 'বেশ্যা' বললে আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়! ১৯৪৬-এ রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে ভারতের পাঞ্জাব এবং বাংলা ভেঙে পাকিস্তান হল। লাখো লাখো হত্যার মধ্য দিয়ে দুটি স্বতন্ত্র দেশের নতুন পতাকা উড়ল, লাখো লাখো নারীর ধর্ষণের বিনিময়ে শান্ত দুই যুযুধান সম্প্রদায়। কে মনে রেখেছে, তাঁদের কথা, যে মহিলারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার অপরাধে সমাজে ঠাঁই না-হয়ে প্রান্তিক হয়ে গেল? যুদ্ধ-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশভাগের পরিণতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন মেয়েরা। মেয়েদের দিকেই প্রথম আক্রমণটা নেমে আসে বুলডোজারের মতো। কারণ মেয়েরাই সবচেয়ে নরম শিকার — জাতে মারা যায়, ধর্মনাশ করা যায়। বেশ্যাপল্লিগুলি ভরে ওঠে।

(৩) উপনিবেশের ফলে বেশ্যা ঃ শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর এমন কোনো অবশিষ্ট দেশ নেই, যে দেশ কোনো-না-কোনো লুটেরা দ্বারা উপনিবেশ হয়নি। বিশেষ করে যদি ভারতের কথাই ধরি, তাহলে বলা যায় - সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোধহয় ভারতই ধর্ষিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের আর্য আগমন থেকে শুরু করে সর্বশেষ ব্রিটিশ আগমন পর্যন্ত - সর্বযুগে যুগান্তরে ধর্ষিত হয়েছে নারী, লুণ্ঠিত হয়েছে নারী। নারী অপহরণ আর ধর্ষণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা বা জব্দ করেছে আক্রমণকারী প্রতিপক্ষ। স্থানীয় প্রতিপক্ষকে বশে আনতে ধনসম্পদ করায়ত্ত এবং নারী অপহরণ হারেম ভরানোই ছিল আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের কৌশল। সময়ের পথ ধরে ইতিহাসের নানা চড়াই-উতড়াই অতিক্রম করে অখণ্ড ভারত উপমহাদেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তৈরি হয়েছে আজকের ভারত, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস জুড়ে রয়েছে বিদেশি শক্তির আগ্রাসন,

পরাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদ। লুণ্ঠিত হয়েছে নারী, বারবার। নারী ধর্ষিতা হয়েছে অত্যন্ত নির্দয়তায়। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বেশ্যাবৃত্তির অন্ধকার গলিতে।

(৪) **পর্নোছবির বেশ্যা ঃ** পর্নোবেশ্যামি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে? দেখব Wikipedia কী বলছে - "Production of erotic films commenced almost immediately after the invention of the motion picture. Two of the earliest pioneers were Frenchmen Eugene Pirou and Albert Kirchner. Kirchner (under the name "Lear") directed the earliest surviving erotic film for Pirou. The 7-minute 1896 film 'Le Coucher de la Mariee' had Louise Willy performing a bathroom striptease. Other French filmmakers also considered that profits could be made from this type of risque films, showing women disrobing. Also in 1896 'Fatima's Coochie-Coochie Dance' was released as a short nickelodeon kinetoscope/film featuring a gyrating belly dancer named Fatima. Her gyrating and moving pelvis was censored, one of the earliest films to be censored. At the time, there were numerous risque films that featured exotic dancers. In the same year, 'The May Irwin Kiss' contained the very first kiss on film. It was a 47-second film loop, with *a* close-up of a nuzzling couple followed by a short peck on the lips ("the mysteries of the kiss revealed"). The kissing scene was denounced as shocking and obscene to early moviegoers and caused the Roman Catholic Church to call for censorship and moral reform - because kissing in public at the time could lead to prosecution. Perhaps in defiance and "to spice up a film", this was followed by many kiss imitators, including 'The Kiss in the Tunnel' (1899) and *The Kiss* (1900). A 'tableau vivant' style was used in short film *The Birth of the Pearl* (1901) featuring an unnamed long-haired young model wearing a flesh-colored body stocking in a direct frontal pose that provides a provocative view of the female body. The pose is in the style of Botticelli's The Birth of Venus. In Austria, cinemas would organise men-only theatre nights (called *Herrenabende)* at which adult films would be shown. Johann Schwarzer formed his Saturn-Film production company which between 1906 and 1911 produced 52 erotic productions, each of which contained young local women fully nude, to be shown at those screenings. Before Schwarzer's productions, erotic films were provided by the Pathe brothers from French produced sources. In 1911, Saturn was dissolved by the censorship authorities which destroyed all the films they could find, though some have since resurfaced from private collections. There were a number of American films in the 1910s which contained female nudity in film. Because Pirou is nearly unknown as a pornographic filmmaker, credit is often given to other films for being the first. In 'Black and White and Blue' (2008), one of the most scholarly attempts to document the origins of the clandestine 'stag film' trade, Dave Thompson

recounts ample evidence that such an industry first had sprung up in the brothels of Buenos Aires and other South American cities by the turn of 20th century, and then quickly spread through Central Europe over the following few years. However, none of these earliest pornographic films are Known to have survived. According to Patrick Robertson's *Film Facts,* "the earliest pornographic motion picture which can definitely be dated is *A 'Ecu d'Or ou la bonne auberge"* made in France in 1908. The plot depicts a weary soldier who has a tryst with a srvant girl at an inn. The Argentinian 'El Satario', whose original title could have been *El Sdtiro (The Satyr),* night be even older; it has been dated to somewhere between 1907 and 1912. He also notes that "the oldest surviving pornographic films are contained in America's Kinsey Collection. One film demonstrates how early pornographic conventions were established. The German film 'Am Abend' (1910) is a ten-minute film which begins with a woman masturbating alone in her bedroom, and progresses to scenes of her with a man performing straight sex, fellatio and anal penetration."

নারী ও শিশুদেহের বাণিজ্যিক ব্যবহারের আর-এক ভয়াবহ রূপ পর্নোগ্রাফি। এর চর্চা প্রযুক্তির হাত ধরে গোটা পৃথিবীব্যাপী মহামারীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ খতটিরও অর্থনৈতিক বাজার অনেক বড়ো, অর্থাৎ বিলিয়ন ডলারের। বিশ্বখ্যাত নারীবাদী নেত্রী ও আইনজীবী ক্যাথরিন ম্যাককিননের মতে, পর্নোগ্রাফি শিল্প হিসেবে হলিউডের চেয়ে অনেক বড়ো। স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যার দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ঘরে ইন্টারনেট কানেকশন এখন আর বিস্ময়কর কিছু না। চাইলেই তারা সেক্স সাইট ব্রাউজ করতে পারছে, ডাউনলোড করে নিতে পারছে যে-কোনো পর্নো ফুটেজ। যাদের ঘরে সে সুবিধে নেই তাদের জন্য রয়েছে অলিতেগলিতে গজিয়ে ওঠা সাইবার ক্যাফে। এক ঘন্টা ব্রাউজ করার জন্য ক্যাফেগুলোতে চার্জ নেয়া হয় মাত্র ২০ থেকে ২৫ টাকা এবং এর বিনিময়ে একটিমাত্র ক্লিকেই পৌঁছে যাওয়া যায় ভারচুয়াল যৌনমিলনের জগতে। পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে যারা যৌনসঙ্গম করে তারাও আর-এক ধরনের বেশ্যামি করে থাকে। এ ধরনের বেশ্যামি ভারত-বাংলাদেশসহ প্রায় সব বিশ্বেই নির্মাণ হয়ে থাকে। কোথাও গোপনে, আবার কোথাও ওপেনে। আমেরিকায় পর্নো-ইন্ডাস্ট্রি রাষ্ট্র-স্বীকৃত। বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মহিলারা পর্নোফ্লিমে অংশগ্রহণ করেন মোটা টাকা রোজগারের কারণে। পর্নো ইন্ডাস্ট্রিতে অসংখ্যা মহিলারা প্ররোচনার শিকার হয় নিশ্চয়, একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। একইভাবে অসংখ্যা মহিলা মোটা টাকা রোজগারের টানে চোখ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা বিশ্বে কত রেভিনিউ আদায় হয় এই সেক্স-অ্যাডভেঞ্চার থেকে? Wikipedia বলছে —Globally, pornography is a large scale business with revenues of nearly $100 billion which includes the production of various media and associated products and services. The industry employs thousands of perform-

ers along with support and production staff. It is also followed by dedicated industry publications and trade groups as well as the mainstream press, private organizations (watchdog groups), government agencies, and political organizations. According to a 2005 Reuters article, “The multi-billion-dollar industry releases about 11,000 titles on DVD each year.” Pornographic films can be sold or rented out on DVD, shown through Internet and special channels and pay-per-view on cable and satellite, and in adult theaters. However, by 2012, widespread availability of pirate content and other low-cost competition on the Internet had made the pornographic film industry smaller and reduced profitability .The global pornographic film industry is dominated by the United States, with the San Fernando Valley area of Los Angeles, California being the heart of the industry. This being the case, most figures on the size of the industry refer solely to the United States. Pornographic film studios are also centered in Houston, Las Vegas Valley, New York City, Phoenix and Miami. These produce primarily amateur or “independent” porn films. In 1975, the total retail value of all the hardcore pornography in the United States was estimated at $5-10 million. The 1979, Revision of the Federal Criminal Code stated that “in Los Angeles alone, the porno business does $100 million a year in gross retain volume.” According to the 1986 Attorney General’s Commission on Pornography, American adult entertainment industry has grown considerably over the past thirty years by continually changing and expanding to appeal to new markets, though the production is considered to be low-profile and clandestine. The total current income of the country’s adult entertainment is often estimated at $10-13 billion, of which $4-6 billion are legal. The figure is often credited to a study by Forrester Research and was lowered in 1998. In 2007 *“The Observef* newspaper also gave a figure of $13 billion. Other sources, quoted by Forbes(Adams Media Research, Veronis Suhler Communications Industry Report, and IVD), even taking into consideration all possible means (video networks and pay-per-view movies on cable and satellite, web sites, in-room hotel movies, phone sex, sex toys, and magazines) mention the $2.6-3.9 billion figure (without the cellphone component). *USA Today* claimed in 2003 that websites such as Danni’s Hard Drive and Cybererotica.com generated $2 billion in revenue in that year, which was allegedly about 10% of the overall domestic porn market at the time. The adult movies income (from sale and rent) was once estimated by AVN Publications at $4.3 billion but the figure obtaining is unclear. According to the 2001 Forbes data the annual income distribution is : Adult Video $500 million to $1.8 billion, Internet $1 billion, Magazine $1 billion, Pay-per-view $128 million, Mobile $30 million. *The Online Journalism Review,* published by the

Annenberg School of Communication at the University of Southern California, weighed in with an analysis that favored *Torbes'* number. The financial extent of adult films, distributed in hotels, is hard to estimate—hotels keep statistics to themselves or do not keep them at all. The world's largest adult movie studio Vivid Entertainment generates an estimated $100 million a year in revenue, distributing 60 films annually and selling them in video stores, hotel rooms, on cable systems, and on the internet. Spanish-based studio Private Media Group was listed on the NASDAQ until November 2011. Video rentals soared from just under 80 million in 1985 to a half-billion by 1993. Some subsidiaries of major corporations are the largest pornography sellers, like News Corporation's DirecTV. Comcast, the nation's largest cable company, once pulled in $50 million from adult programming. Revenues of companies such as Playboy and Hustler were small by comparison.

মোটা টাকার হাতছানি এড়ানো যে খুব কঠিন, তা বিশ্বের পয়লা নম্বর পর্নস্টার সানি লিওন একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তাঁর সেক্স করাটা প্যাশন। তিনি স্ব-ইচ্ছায় এই পেশা বেছে নিয়েছেন। স্টেইট, লেসবো - সব ধরনের সেক্স করতে সানি লিওন সমান পারদর্শী। পর্ন-বাজারে সানি লিওন মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। কোটি টাকা তাঁর দাম। ন্যুড ফোটো-সেশন দিয়ে তাঁর যৌনজীবন শুরু করেছিলেন, তার পর বিশ্বের এক নম্বর পর্নস্টার। ৩৫ ঊর্ধ্ব প্রায় বিগত যৌবনা সানি লিওন বর্তমান বলিউডে অভিনেত্রী হিসাবে বাকি জীবনটা কাটাতে চান বলে অনেকে মনে করেন। স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবর সহ সানি লিওন প্রায় ৫৬টি পর্নছবিতে সেক্সপ্লে করেছেন এবং ৫৯ ব্লুফ্লিমও পরিচালনা করেছেন। শুধু সানি লিওন নয় - প্রিয়া অঞ্জলি রাই, দেবিকা, রেশমা, শাকিলা, Peta Jensen, Lisa Ann, Hitomi Tanaka, Christy Mack, Natasha Dalce, Kristina Rose, Holli Sweet, Alexa Loren, Olivia Lovely প্রমুখ পর্নস্টাররা রোজগারের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সেলুলয়েডে যৌনমিলন করেছেন। বিশ্বাস না-হয় Wikipedia দেখুন। রেড লাইট এরিয়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে পর্নস্টারদের বেশ্যামির মূলগত পার্থক্য হল - রেড লাইট এরিয়ার বাসিন্দারা নির্ধরিত অর্থের বিনিময়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতরে খরিদ্দারদের সঙ্গে যৌনমিলন করেন, পর্নস্টাররা কোটি কোটি মানুষদের দেখানোর জন্য আর্থিক চুক্তিতে মুভি ক্যামেরার সামনে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শনসহ সহ যৌনাচার করেন। পর্নস্টাররা লিখিত চুক্তির মাধ্যমেই তাঁদের যৌনকর্ম সেলুলয়েড বন্দি করেন, রেড লাইট এরিয়ার বাসিন্দারা সম্পূর্ণ মৌখিক চুক্তিতে যৌনমিলন করেন।

(৫) সেলুলয়েডের বেশ্যা ঃ রাজকাপুর খুব কায়দা করে সেলুলয়েডে নারীর শরীর বিক্রি করেছেন। সেটাই সংশ্লিষ্ট ছবির জন্য সংশ্লিষ্ট নায়িকার প্রতি পরিচালকের মোলায়েম শর্ত। যেমন 'সত্যম শিবম সুন্দরম' ছবিতে জিনাত, রাম তেরি গঙ্গা মৈলি' ছবিতে মন্দাকিনী।

এরপর নির্মাতাদের আর পিছন ফিরে তাঁকাতে হয়নি। গুটি গুটি পায়ে সেলুলয়েডের পর্দায় যৌনমিলনের দৃশ্যও ক্যামেরা-বন্দি করার সাহস জুগিয়ে ফেলেছেন। সেইসব দৃশ্য সেন্সরের জ্যাঠামিতে (!) বাণিজ্যিক রিলিজ না হলেও ইন্টারনেট রিলিজ হতে কোনো বাধা নেই। গাণ্ডু, মাশরুম (ছত্রাক), রঙ রসিয়া, কামসূত্র, কামসূত্র থ্রিডি, সিদ্ধার্থ, মচালতা জওয়ানি, রেশমি কি জওয়ানি, গোলাবি রাতে, হর রাত নই খিলাড়ি ইত্যাদি। গাণ্ডুর নায়িকা, ছত্রাকের নায়িকা, রঙ রসিয়ার নায়িকা, কামসূত্রের নায়িকাদের সাধারণ মানুষ 'বেশ্যা' বলেই অভিহিত করেন। এইসব মুভির নায়িকা-পরিচালকরা প্রায়ই একটা মজার কথা বলে থাকেন, তা হল - "চিত্রনাট্যের ডিম্যান্ড"। কী এই চিত্রনাট্যের ডিম্যান্ড"? কে বানায় এই চিত্রনাট্য? কে ক্রিয়েট করেন ডিম্যান্ড? স্বর্গ থেকে কি আসে ডিম্যান্ড? ঈশ্বর-প্রেরিত? শিল্পের নামে বেশ্যামি! সেন্সর ছাড়পত্র না দিলেও ওই যৌনমিলনের দৃশ্যগুলি টেক করা হয়। দৃশ্যগুলি যে সেন্সর ছাড়পত্র দেবে না, দৃশ্যগুলি যে দিনের আলোর মুখ দেখবে না - সেটা কি প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জানেন না? কোন ধনকুবেরদের জন্য এই সেলুলয়েড ভরতি যৌনমিলন? শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই সিনেমার নামে এক শ্রেণির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যৌনমিলনের দৃশ্য সেলুলয়েড-বন্দি করেন। 'গাণ্ডু' ও 'কসমিক সেক্স' মুভির অভিনেত্রী ঋ এক সাক্ষাৎকারে কী বলছেন শুনুন, "আমার শরীরের মালিকানা আমার। দোকান সাজিয়ে বসেছি। বেচতে লজ্জা কিসের! আমার বাবু আর দালাল আমি নিজেই। যাঁরা আমার শরীর দেখে লজ্জা পান, উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তাঁরা হোন। কিন্তু এই যে প্রতিনিয়ত তাঁদের আদিম সত্তাকে 'ট্রিগার' করি, এটাই 'কানেকশন উইথ মাই অডিয়েন্স' (সূত্র : http://eisamay.indiatimes.com/city/kolkata/an-interview-with-rii-and-parno-mitra-about-tollygunge-nudity-by-starupa-basu/articleshow/45591512.cms)"।

(৬) শিল্পের ক্যানভাসে বেশ্যা ঃ 'রং রসিয়া' মুভিতে দেখানো হয়েছে চিত্রশিল্পী রবি ভার্মার চিত্রশিল্পের মডেল সুগন্ধিকে, যিনি চিত্রশিল্পীর চিত্রশিল্পের জন্য নগ্ন হতেন এবং কখনো-সখনো চিত্রশিল্পীর সঙ্গে যৌনমিলনও করতেন। সুগন্ধি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন তিনি শিল্প এবং প্রেমের জন্য নগ্ন হলেও রবি ভার্মা, রক্ষণশীল সমাজ, রাষ্ট্র তাঁকে 'বেশ্যা' হিসাবেই দেখত। স্বীকৃতিহীন এক নারী সুগন্ধির পরিণতি হল গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা। চিত্রশিল্পীরা ছবি আঁকবেন, ভাস্কররা ভাস্কর্য গড়বেন - এ তো সুখের ব্যাপার। শিল্প মনের বিকাশ ঘটায়, চেতনার মুক্তি দেয়। তাই বলে কথায় কথায় নগ্ন নারী কেন, নারীর শরীর কেন? Wikipedia বলছে — The 'nude' figure is mainly a tradition in Western art, and has been used to express ideals of male and female beauty and other human qualities. It was a central preoccupation of Ancient Greek art, and after a semi-dormant period in the Middle Ages returned to a central position in Western art with the Renaissance. Athletes, dancers, and warriors are depicted to express human energy and life, and nudes in various poses

may express basic or complex emotions such as pathos. In one sense, a nude is a work of fine ar that has as its primary subject the unclothed human body, forming a subject genre of art, in the same way as landscapes and still life. Unclothed figures often also play a part in other types of art, such as history painting, including allegorical and religious art, portraiture, or the decorative arts. While there is no single definition of fine art, there are certain generally accepted features of most definitions. In the fine arts, the subject is not merely copied from nature, but transformed by the artist into an aesthetic object, usually without significant utilitarian, commercial (advertising, illustration), or purely decorative purposes. There is also a judgement of taste; the fine art nude being part of high culture rather than middle brow or low culture. However, judgements of taste in art are not entirely subjective, but include criteria of skill and craftsmanship in the creation of objects, communication of complex and non-trivial messages, and creativity. Some works accepted as high culture of the past, including much Academic art, are now seen as imitative or sentimental otherwise known as kitsch. Modern artists have continued to explore classical themes, but also more abstract representations, and movement away from idealization to depict people more individually. During most of the twentieth century, the depiction of human beauty was of little interest to modernists, who were concerned instead with the creation of beauty through formal means. In the contemporary, or Post-modern era, the nude may be seen as passe by many, however there are always artists that continue to find inspiration in the human form. Naked female figures called Venus figurines are found in very early prehistoric art, and in historical times, similar images represent fertility deities. Representations of gods and goddesses in Babylonian and Ancient Egyptian art are the precursors of the works of Western antiquity. Other significant non-Western traditions of depicting nudes come from India, and Japan, but the nude does not form an important aspect of Chinese art. Temple sculptures and cave paintings, some very explicit, are part of the Hindu tradition of the value of sexuality, and as in many warm climates partial or complete nudity was common in everyday life. Japan had a tradition of mixed communal bathing that existed until recently, and was often portrayed in woodcut prints. The earliest Greek sculpture, from the early Bronze Age Cycladic civilization consists mainly of stylized male figures who are presumably naked. This is certainly the case for the kouros, a large standing figure of a male mude that was the mainstay of Archaic Greek sculpture. The first realistic sculptures of nude males, the kouroi depict naked youths who stand rigidly posed with one foot forward. By the fifth century BCE, Greek sculptors' mastery of anatomy resulted in greater naturalness and more

varied poses. An important innovation was contrapposto—the asymmetrical posture of a figure standing with one leg bearing the body's weight and the other relaxed. An early example of this is Polykleitos' sculpture *Doryphoros* (ca. 440 BCE). In the convention of heroic nudity, gods and heroes were shown naked, while ordinary mortals were less likely to be so, though athletes and warriors in combat were often depicted nude.

In Ancient Greece, where the mild climate was conducive to being lightly clothed or nude whenever convenient, and male athletes competed at religious festivals entirely nude, and celebrated the human body, it was perfectly natural for the Greeks to associate the male nude form with triumph, glory, and even moral excellence. The Greek goddess Aphrodite was a deity whom the Greeks preferred to see clothed. In the mid-fourth century BC, the sculptor Praxiteles made a naked Aphrodite, called the Knidian, which established a new tradition for the female nude, having idealized proportions based on mathematical ratios as were the nude male statues. The nudes of Greco-Roman art are conceptually perfected ideal persons, each one a vision of health, youth, geometric clarity, and organic equilibrium. Kenneth Clark considered idealization the hallmark of true nudes, as opposed to more descriptive and less artful figures that he considered merely naked. His emphasis on idealization points up an essential issue: seductive and appealing as nudes in art may be, they are meant to stir the mind as well as the passions.

ঠিক কবে থেকে শিল্পীদের নগ্ন নারী প্রয়োজন হয়েছিল তা ঠিকঠাক সাল-তারিখ জানা না-গেলেও একথা বলাই যায়, পুরুষ-পরিচালিত পুরষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষরা নারীদের নগ্ন করতে নগ্ন দেখতে নানা অছিলায় লালায়িত ছিল। শুধু ছিল বলব কেন? আছে এবং থাকবে যতদিন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যস্থা থাকবে। নগ্নচর্চা শুরু হয়েছে সম্ভবত রাজাদের ইচ্ছাপূরণে শিল্পীদের নিয়োগে। রাজারা নগ্নতা খুব পছন্দ করতেন। তাঁরা আদিরসাত্মক কাহিনি পছন্দ করতেন বলেই প্রাচীন সাহিত্য রগরগে যৌনকাহিনিতে ভরপুর। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরসাত্মক এতটাই যে, মূল ভাষার কাহিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠ করা নিষিদ্ধই। শুধু অক্ষর-লেখনিতেই নয়, তুলিতে-ছেনিতেও নারীকে নগ্ন করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। সমালোচনার ঝড় এড়াতে মাহাত্ম্য জুড়ে দেওয়া হল শিল্পের নামে। শিল্প, তাই নারীকে যত খুশি নগ্ন করো আর সামনে বসাও, শোয়াও এবং দাঁড় করাও। নারীর নগ্নতা কি শুধু শিল্পই? দেখি তো Wikipedia কী বলছে - "Kenneth Clark noted that sexuality was part of the attraction to the nude as a subject of art, stating "no nude, however abstract, should fail to arouse in the spectator some vestige of erotic feeling, even though it be only the faintest shadow—and if it does not do so it is bad art and false morals." According to Clark, the explicit temple sculptures of tenth-century India "are great works of art

because their eroticism is part of their whole philosophy." Great art can contain significant sexual content without being obscene. However sexually explicit works of fine art produced in Europe before the modern era, such as Gustav Courbet's *L 'Origine du monde,* were not intended for public display. The judgement of whether a particular work is artistic or pornographic is ultimately subjective and has changed through history and from one culture to another. Some individuals judge any public display of the unclothed body to be unacceptable, while others may find artistic merit in explicitly sexual images. Public reviews of art may or may not address the issue."

শিল্পীদের কাছে এঁরা 'মডেল' নামে পরিচিত। কোথা থেকে এইসব মডেল-নারীরা? কেন আসে? কোনো বাছবিচার নেই - এরা সাধারণত সামান্য রোজগারের আশায় নিম্নবিত্ত থেকে এলেও মধ্যবিত্ত থেকেও প্রচুর মেয়েরা আসছে। জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীদের স্ত্রীরাও নগ্ন মডেল হয়ে থাকে। তবে বেশিরভাগই মেয়েরা দারিদ্রতার কারণে সংসারে অভাব মেটানোর তাগিদে মডেল হতে আসে আর্ট একাডেমীগুলোতে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই পেশায় আসেন মেয়েরা। মেয়েরা বলতে গৃহবধূ বুঝে নিন। এইসব গৃহবধূরা কলকাতা বা শহরে কাজে যাচ্ছেন বলে শিল্পীদের সামনে নগ্ন হন। তবে শুধু যে নারীদেরই নগ্ন করা হয়, তা কিন্তু নয় — সংখ্যায় নগণ্য হলেও পুরষরাও ন্যুড স্টাডিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শিল্পরসিকদের বাজারে নারীদের চাহিদাই বেশি, কারণ নগ্ন নারীদের চিত্র-ভাস্কর্য খুব চড়া দামেই বিকোয়। নারীর শরীরী বিভঙ্গ ক্রমশ পণ্য হয়ে ওঠে। শিল্পীরা 'ন্যুড আর্ট'-এ যে মাহাত্ম্যই আরোপ করুক না-কেন, আসলে এঁরা সমাজে ঘৃণিতই। এঁদের সমাজ 'বেশ্যা' বলেই চিহ্নিত করে, দেবী নয়।

(৭) দেবদাসী প্রথায় বেশ্যা ঃ দক্ষিণের তিরুপতি মন্দিরে দেবদাসী সংগ্রহের প্রাচীন পদ্ধতি সম্পর্কে খ্রিস্টান মিশনারি অ্যাবে জে এ দুঁবা এক সমীক্ষায় লিখেছেন, বছরের একটি বিশেষ দিনে এই মন্দিরের পুরোহিতরা ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের প্রতিমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করতেন এবং পথে যত সুন্দরী মেয়ে দেখত তাদেরকে দেবদাসী করার দাবি জানাত। এমনকি শুধু কুমারী নয়, বিবাহিত মহিলাদেরও দাবি করত তারা। এ থেকেই বোঝা যায়, দেবদাসী করার জন্য অনেক মেয়েকে জোর করেই তুলে আনা হত। দুঁবার এহেন অনুধাবনযোগ্য।

শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের অনেক জায়গাতেই দেবদাসী ব্যবস্থা চালু ছিল। গবেষক পণ্ডিত জি জি ফ্রেজার পশ্চিম আফ্রিকায় দেবদাসী সংগ্রহের যে অভিনব উপায়ের উল্লেখ করেছিলেন তাতেও জানা যায় যে, মেয়েদের জোর করে তুলে এনে দেবদাসী বেশ্যা বা গণিকা বানানো হত। ফ্রিজার লিখেছেন, পুরোহিতরা একটা বিশেষ দিনে নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়াত দিনে এবং সেদিন দুয়ারের বাইরে যত কুমারী মেয়ে পেত তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যেত মন্দিরে দেবদাসী করার জন্য।

রাজ্য জয় করে রাজারা যেমন গোরু-ছাগলের মতো মেয়েদের ধরে নিয়ে আসত, তেমনই সেইসব মেয়েদের ধরে ধরে এনে দেবদাসীও বানানো হত। এভাবেই দেবতার বউ বানানোর ছলে মেয়ে তুলে এনে বেশ্যা বানানো হত। ১৮৬৭-৬৮ সালে জন শর্ট লন্ডনের অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটিতে ভারতের দেবদাসীদের নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মন্দিরের দেবদাসীদের কুমারীত্ব বহিরাগত ধনীদের কাছে বিক্রি হত চড়া দামে। তারপর তারা বেশ্যাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

"সুতনুকা নাম দেবদাসিক্যী তং কাময়িত্থ বালানশেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদকখে"। "দেবদাসী" শব্দটির এটিই প্রথম ঐতিহাসিক দলিল। কৌটিল্য 'দেবদাসী ' শ্রেণির আইনকানুন লিপিবদ্ধ করেননি বলেছেন, সে দায়িত্ব পুরোহিততন্ত্রের। অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকেই দেবদাসীদের উপর ওই পুরোহিতকুলের অধিকার ইতিহাস স্বীকৃত। দেবদাসীদের ভালোমন্দ নিয়ে কোনো আলোচনা পুরোহিততন্ত্র বরদাস্ত করত না। তাঁরা নিজেরা যেসব আইনকানুন বা বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তা অতি সযত্নে গোপন রাখা হত। পুরোহিততন্ত্র নিজেদের স্বার্থেই দেবদাসীদের লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চাইত। যা কিছু আড়ালে-আবডালে তাতেই মানুষের মোহ। ভবিষ্যপুরাণে "বেশ্যাকদম্বকং যস্তু দদ্যাৎ সূর্যায় ভক্তিতঃ সগচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র তিষ্ঠতি ভানুমান" উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাস তাঁর "মেঘদূতম্" মহাকাব্যে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে চামরহস্তা যে দেবদাসীদের পাওয়া যায়, কবিবর তাঁদের 'বেশ্যা' বলেই পরিচিত করিয়েছেন। দেবদাসী সৃষ্টির পিছনে ছিল সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা - সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল আত্মজাকে দেবদাসী পদে অভিষিক্ত করলে শুধু দাতার নয়, কন্যারও স্বর্গলাভের ব্যবস্থা পাকা হয়।

দেবদাসীদের মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন - (১) বিক্রিতা, (২) ভৃত্যা, (৩) ভক্তা, (৪) দত্তা, (৫) হৃতা এবং (৬) অলংকারা।

(১) বিক্রিতা ঃ অর্থের বিনিময়ে এদের কিনে নেওয়া হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা অত্যন্ত গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে। একাধিক মেয়ের পিতা অর্থের বিনিময়ে এরকম দু-একটি মেয়েকে তুলে দিত পুরোহিতদের মালিকানায়। দেবদাসীদের গর্ভজাতা মেয়েও এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইসব মেয়েরা যৌবনপ্রাপ্তা হলে মন্দিরের পুরোহিত নিজে অথবা তাঁর প্রিয়পাত্রকে দিয়ে কৌমার্য খতম করে দেবদাসী পদে নিয়োগ করত।

(২) ভৃত্যা ঃ বিশেষণ পড়েই বুঝতেই পারছেন এরা ভৃত্য, মানে ভত্যশ্রেণির। তাই স্বাভাবিকভাবেই এরা পদমর্যাদায় দেবদাসীর নিচে। যৌবনাদের কর্তব্য ছিল মন্দিরের অতিথিবর্গকে দেহদানের মাধ্যমে শরীরী-পরিসেবা দিতে হত।

(৩) ভক্তা ঃ স্বেচ্ছায় কোনো রমণী (কুমারী, সধবা, স্বামী পরিত্যক্তা) মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে যখন দেবদাসী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে সে ভক্তা। ভক্তিই এঁদের আধার। এঁরা অতি উচ্চ সম্মানের পদাধিকারী। এঁদেরকে দেহদানে লিপ্ত হতে হত না।

(৪) দত্তা ঃ কোনো ধর্মান্ধ পুণ্যলোভী পিতা মনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য, মানত রাখার জন্য, স্বেচ্ছায় নিজের মেয়েকে মন্দিরে দান করলে সেই মেয়ে দত্তা হয়।

(৫) হৃতা ঃ এই মেয়েদের মূলত চুরি করে আনা হত। নিরদ্দিষ্টার সন্ধান পেত না। সেই অঞ্চলের নগর-কোটাল। সেই মেয়ে বহু দূর দেশে মন্দিরের অন্ধকূপে বন্দিনী হিসাবে থাকত।

(৬) অলংকারা ঃ যে-কোনো শ্রেণির দেবদাসীই রূপ-গুণ নৃত্যগীত পারদর্শিতার বিচারে ওই শীর্ষপদে উন্নীতা হতে পারে। ঐহিক বিচারে এই মেয়েরা শীর্ষস্থানীয় হলেও শ্রদ্ধা ও সম্মানের দিক থেকে ভক্তা শ্রেণির নিচে।

দেবদাসী প্রথা নির্মূল হয়ে গেছে বলে অনেকে নিশ্চিন্তের ঢেঁকুর তোলেন। না, ঢেঁকুর তুলবেন না। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কিছু মন্দিরে এখনও বিগ্রহের কাছে মেয়েদের বিসর্জন দেওয়া হয়। আজকের দেবদাসীরা আর দেবতার দাস নয়, তাঁরা লোলুপ পুরষের লালসার শিকার। আর এই লালসা তৃপ্ত করতে এগিয়ে এসেছেন যেসব মন্দিরের রক্ষক, সেগুলির মধ্যে কর্ণাটকের ইয়েলাম্মা মন্দির। যেহেতু মন্দিরকন্যাদের বিয়ে হয় না, তাঁদের বিনা দ্বিধায় সম্ভোগ করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের পুরষেরা। যে পূজারী দেবদাসী অর্পণের কাজে লিপ্ত, তিনি মোটা অর্থ প্রাপ্ত হন। যাঁরা এই প্রথাকে তাঁদের জাতিগত ঐতিহ্যের অংশ মনে করেন, তাঁরা বড়োই তৃপ্ত হন। তা ছাড়া ইয়েলাম্মা মন্দিরের মেয়েরা প্রকৃত অর্থে দেবদাসী নন। এঁরা না বোঝেন চৌষট্টি কলা, না কোনো ধনীব্যাক্তির রক্ষিতা। একপ্রকার খোলাখুলিভাবেই দেহবিক্রিই তাঁদের কাজ।

মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের প্রান্তিক জেলাগুলি থেকে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার হরিজন শ্রেণির মেয়েদের ইয়ালাম্মার কাছে অর্পণ করা হয়। এই প্রথার পিছনে শুধু বহু যুগের বিশ্বাস এবং অজ্ঞতা আছে তা নয় - আছে আর্থিক কারণ, আছে পুরোহিতদের প্ররোচনা। প্রাচীন প্রথার এই দুঃসহ আধুনিকীকরণ সব থেকে বেশি প্রচলিত কর্ণাটকের বেলগাঁও, ধারওয়ার, বিজাপুর, গুলবর্গা ও বেলারি জেলায়। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের সিতারা, কোলাপুর, শোলাপুর ও ওসমানাবাদ অঞ্চলে এই প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। জানা গেছে, অন্ধ্রের নিজামাবাদ অঞ্চলে এবং তেলেঙ্গানাতে যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ২৫ হাজার দেবদাসী আছে। বংশপরম্পরায় এই মেয়েরা পুরুষদের গ্রাস হয়েই থাকল।

সর্বোপরি যেটা না বললে অন্যায় হবে, তা হল - দেবদাসীরা ভারত-সংস্কৃতিকে দিয়েছে অনেক সম্পদ। কথাকলি, ভারতনাট্যম, মোহিনী-আট্টম, কুচিপুডি এ সবই দেবদাসী-সংস্কৃতি। যুগে যুগে এঁর দেবদিন্নদের উদ্বুদ্ধ করেছে মন্দিরগাত্র অলংকরণে - কোণারক, খাজুরাহো, বেলুড়, হালেবিড থেকে বাঁকুড়ার মন্দিরেই রয়ে গেল শাশ্বত প্রমাণ। তাঁদের নাম অবিনশ্বর।

(৮) আকর্ষণীয় পেশা হিসাবে বেশ্যা ঃ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড — এই চারটি দেশে পরিচালিত জরিপ তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, নিরক্ষর ও অদক্ষ

মেয়েদের পক্ষে যেসব কাজ করা সম্ভব তার মধ্যে যৌনকর্মই সবচেয়ে বেশি অর্থাগম ঘটায়। যেমন মালয়েশিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কাজ করে ১৯৯০-এ একজন দক্ষশ্রমিক বছরে উপার্জন করত ২৮৫২ আমেরিকান ডলার এবং অদক্ষ করত ১৭১১ ডলার। বিপরীতে সে সময়ের হিসেবে কোনো নিম্নমানের হোটেলে যৌনপরিষেবা দিয়ে একজন যৌনকর্মী সপ্তাহে মাত্র একদিন বারো ঘন্টা কাজ করেই বছরে আয় করতে পারত ২০৮০ ডলার। স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা এবং গৃহবধূরা আজকাল এই পেশায় আসছেন, স্বেচ্ছায়। খুব গোপনে প্রচুর টাকা রোজগারের নেশায় এখন ছুৎমার্গ ঘুচিয়ে ফেলছেন অনেকেই। দারিদ্রতার কারণে বা প্ররোচনায় মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তিতে এসে পড়ে, তা কিন্তু সবসময় ঠিক নয়। শাঁসালো পুরুষদের ফাঁসিয়ে রাতারাতি ধনী হয়ে যাওয়ার জন্য অনেক মেয়ে-গৃহবধূরা এটাকে সংযত-পেশা হিসাবে নিচ্ছেন। তাই সমাজে ছুকছুকে পুরুষদের উদ্দেশে 'গা-ঢলানি' মেয়ে-বউদের থেকে 'সাবধান বাণী' শোনা যায়। সমাজের কানাচে-আনাচে চলছে এই নিরন্তর কর্মযজ্ঞ, আর যত দোষ নন্দ ঘোষ!

ঠিকানা ঃ ভারতের একটি শহর। থানায় এসে এক মহিলা সটান বললেন, আমি বাজারের মেয়েছেলে নই, আমি যৌনকর্মী, এটাই আমার পেশা। পুলিশ অফিসারদের তো তখন ভড়কে যাওয়ার দশা। সম্প্রতি মুম্বইয়ের এক কলগার্ল উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। শহরে কয়েকজন বিত্তবান ব্যক্তি এক পাঁচ তার হোটেলে ওই মহিলার সঙ্গে ফুর্তি করে। এরপর কলগার্লকে পারিশ্রমিক দেওয়া তো দুরের কথা, তার কাছে থাকা টাকাপয়সা সহ অন্যান্য সামগ্রী লুঠ করে পালায় ওই ব্যক্তিরা। মুখে ব্যক্তিরা। মুখে ইংরেজির ফুলঝুরি। এমন মেয়ের অভিযোগ শুনে তো হতবাক থানার আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর বেপরোয়া কথাবার্তায় ততক্ষণে থ বনে গিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। নিজের পুরো কাহিনী শুনিয়ে ওই মহিলা বলেন, আমি বাজারের মেয়েছেলে নই, আমি যৌনকর্মী, এটাই আমার পেশা। তিনি আরও বলেন, এই পেশা থেকে দুই কোটি টাকা আয় করে একটি বিউটি পার্লার খুলতে চান। তিনি পুলিশ আধিকারিকদের জানান, শরীরের ফিটনেস ধরে রাখতে তাঁর একজন প্রশিক্ষক রয়েছেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মেনে চলেন। শুধু তাই নয়, প্রতি ছয় মাস অন্তর মেডিক্যাল চেকআপও করান।

(৯) মধুচক্র ঃ শত শত আবাসিক হোটেলের ফ্ল্যাট এবং নির্জন বাড়ি এখন একেকটি যৌনমস্তির লীলাভূমি হয়ে উঠেছে। এইসব স্থান নিষিদ্ধপল্লিগুলির চেয়ে অনেক বেশি সাফসুতরো, সহজগম্য এবং অনেকটা ফ্রেস এবং ঘরোয়া পরিবেশ এবং গায়ে বেশ্যা বা বেশ্যালয় নামটি সাঁটা নেই বলে মেয়েরা এবং রসিকপুরুষরা বেশি পছন্দ করেন। নিষিদ্ধপল্লিগুলির চেয়ে মধুচক্রগুলিতে রেস্ত অনেক গুণ বেশি গুণতে হলেও একটু পয়সাকড়ি যাদের পকেটে আছে তারা মধুচক্রই পছন্দ করছেন। তার উপর এখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রায় সকলেই উঁচুতলার মানুষ হয়ে থাকেন। এখানকার শরীরবিক্রেতারা আসেন বিনিময়ে

অর্থ নেন, তা কিন্তু নন। এরা সাধারণত পছন্দের পুরুষের সঙ্গে বা গ্রুপ সেক্স করেন। এন্টারচেঞ্জ (একে-অপরের স্বামী-স্ত্রী বদলাবদলা) সেক্সও সম্পন্ন হয়। এখানে তারাই আসেন যারা তাদের পছন্দের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে নিজের নিজের জায়গায় যৌনক্রিয়া সম্পাদন করতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তবে এইসব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে অর্থ লেনদেন না-হলে হোটেল বা ফ্ল্যাটের মালিক বা বাড়ির কর্তাকে অবশ্যই মোটা টাকার থাউকো ভাড়া দিতে হয়। সেই কারণে পতিতালয় ও রাস্তাঘাটের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ খরচ করেও যৌনপরিসেবা ক্রয়ের জন্য শহরের আবাসিক হোটেলসমূহে ২৪ ঘন্টা ধরেই কী ভয়ানক চাপ পড়ে তা হঠাৎ পরিচালিত পুলিশ রেইডে ধরা পড়া নারী ও পুরুষদের সংখ্যার দিকে তাকালেই অনুমান করা যায়। আর ফ্ল্যাটবাড়ির আশ্রয়ে পরিচালিত হওয়া যৌনব্যাবসার চিত্রটি আমাদের কাছে আড়ালেই থেকে যায়, থেকে যাচ্ছে, থেকে যাবে। এইসব নারী এবং পুরুষদের গায়ে 'বেশ্যা' লেবেল না-থাকায় সমাজে বুক ফুলিয়ে চলতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অভিযোগ না-উঠলে কিংবা ওসব স্পটে কেউ খুন না-হলে সাধারণত সেগুলি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং গণমাধ্যমের আড়ালেই থাকে। উল্লেখ্য, এসব স্পট, স্পটের কর্তা এবং স্পটের গ্রাহকরা প্রায়শই হন উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তেরা এবং হোমড়া-চোমড়া দুনিয়ার। সেই কারণে ঘটনার কথা জেনেও কেউ আগ বাড়িয়ে কাঠি দিতে যায় না। সম্প্রতি জানা গেছে, মুম্বাইয়ে নামজাদা এক চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর নিজ দেওয়া ফ্ল্যাটে মধুচক্র চলত। সংশ্লিষ্ট অভিনেত্রী মধুচক্র পরিচালনা করতেন কি না তা যথাযথ জানা যাবে বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগে হায়দ্রাবাদের বানজারা হিলসের একটি বিলাসবহুল হোটেলে মধুচক্র থেকে শ্বেতা (শ্বেতা বসু প্রসাদ) নামে এক মুম্বাইয়ের প্রাক্তন অভিনেত্রীকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। এই রাতে তার রেট ছিল ৫ লাখ, ১ লাখ টাকা অগ্রিমও পেয়ে গিয়েছিল। গ্ল্যামার জগতের খ্যাতির ছোঁয়া পেয়ে অভিনেত্রীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়! অন্য পেশার মতো অভিনেত্রীদেরও সবসময় সুদিন থাকে না। দু-হাতে সমানে ডলার ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন কেউ কেউ সুদিন হারাতে থাকে তখনই এসে যায় শরীর-ব্যবসার মতো লাভজনক ব্যাবসার হাতছানি। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় এবং আম-ইচ্ছায় এই গোপন লীলায় সঁপে দেন নিজেদের। সেলিব্রেটি হওয়ার সুবাদে শরীর-মূলও অনেক চড়া হয়। শুধু শ্বেতা নয়, এর আগেও বেশ কয়েকজন অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে দেহব্যাবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এরা হলেন ঐশ আনসারি, ভুবনেশ্বরী, সায়রাবানু, শ্রাবণী, যমুনা, দিব্যাশ্রী প্রমুখ। ২০০৯ সালে তামিল সিনেমার সুপারস্টার ভুবনেশ্বরী গ্রেফতার হয়েছিলেন, ইনি নিজের মোহময়ী রূপকে কাজে লাগিয়ে খরিদ্দার ধরতেন শুধু তা নয় - গ্ল্যামার জগতে উঠতি তারকাদের নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে যৌনকর্ম করতেন। শোনা যায়, ভুবনেশ্বরী নীল ছবির অভিনয়েও যুক্ত ছিলেন। ২০১৩ সালে যোধপুরের একটি হোটেল থেকে আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন অভিনেত্রী ঐশ আনসারি। ২০১৩ সালেই আর-এক তামিল অভিনেত্রী সায়রাবানুও গ্রেফতার হন দেহব্যাবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে। দক্ষিণী ছবির আরও দুইজন অভিনেত্রী শ্রাবণী এবং

যমুনাকে মধুচক্র চালালোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। শ্বেতার গ্রেফতারের পর মিডিয়া যখন তোলপাড় শুরু করে দিল তখন আর-এক বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেত্রী শ্বেতাদের হয়ে জোরদার সওয়াল করলেন। বললেন, "শ্বেতাকে দোষের ভাগীদার বানানো হচ্ছে। তার দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে। অথচ তাঁর বিত্তশালী খরিদ্দারদের নাম আড়াল করে যাচ্ছে পুলিশ। শ্বেতার পাশাপাশি ওইসব লোকগুলির নামও সামনে আসা উচিত। তাদের ঘরের মা-বোন-মেয়েরা জানুক তাদের ঘরের পুরুষ কত বিচিত্র চরিত্র"। পুলিশ চুপসে গেল, মিডিয়া হড়কে গেল। ২০১৩ সালে পুলিশ এবং মিডিয়ার এমনই পরিস্থিতি হয়েছিল শ্রাবণীকে গ্রেফতার করার পর। জানা যায়, শ্রাবণীর খরিদ্দারদের বেশিরভাগই হল অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন মন্ত্রী। এটা জানার পরই পুলিশ ও মিডিয়ারা রণে ভঙ্গ দেয়। পরে অবশ্য হায়দ্রাবাদের নামপল্লির মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত শ্বেতাকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ হয়েছে। তাই বলে কি শ্বেতার কলঙ্ক ঘুচল!

(১০) যৌন-পর্যটন বা সেক্স ট্যুরিজম ঃ বিশ্বায়নের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে যৌনবাণিজ্যের আরও নানা রূপ ও চেহারা স্পষ্ট হয়েছে। তার বড়ো ক্ষেত্র সেক্স ট্যুরিজম। প্রতিদিনই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অপরিণত ও পরিণত বয়সি নারী পাচার হয়ে আন্তর্জাতিক এসব যৌনবাণিজ্যের কবলে পড়ছে। পাচারকারী ও যৌনবাণিজ্যের সমাজের বড়ো বড়ো মাথাওয়ালা হর্তাকর্তা শ্রেণির নেটওয়ার্ক এতই বিস্তৃত ও শক্তিশালী যে তাদের শক্তিমত্তার সঙ্গে পেরে ওঠার চেষ্টা প্রায়ই রাষ্ট্রগুলি করে না, কারণ অনেক রাষ্ট্রের মোটা আয়ই নির্ভর করে এ পেশার উপরে, বিশেষ করে, সেক্স ট্যুরিজম বা যৌন-পর্যটন যেসব রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, সেক্স ট্যুরিজম বা যৌনপর্যটন হল অর্থের বিনিময়ে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ স্থানে ভ্রমণ করা। জাতিসংঘের বিশেষ এজেন্সি বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, পর্যটন খাত কর্তৃক আয়োজিত অথবা এই খাতের বাইরের কারও আয়োজনে পর্যটন খাতের কাঠামো ও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে গন্তব্যস্থানের বসবাসস্থলে পর্যটক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকেই সেক্স ট্যুরিজম বা যৌন-পর্যটন বলে। জাতিসংঘ যৌনপর্যটনকে সমর্থন করে না এই কারণে যে, এর মাধ্যমে পর্যটকের নিজের দেশ ও গন্তব্য দেশ উভয়েরই স্বাস্থ্যগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে বিশেষ করে পর্যটকের নিজের দেশের চেয়ে গন্তব্যদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং পর্যটকের নিজের সঙ্গে ওখানকার মানুষের লৈঙ্গিক-বায়সিক অবস্থার বৈভিন্ন্যই এর জন্য দায়ী। যৌন-পর্যটকদের জন্য কখনো-কখনো গন্তব্য দেশে স্বল্পমূল্যে যৌন-পরিসেবা পাওয়ার আকর্ষণ থাকে। এমনকি সেসব দেশের থাকে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আইনগত শৈথিল্য এবং শিশু যৌনকর্মী পাওয়ার আকর্ষণও।

যৌন-পর্যতনের তন্য পর্যতকদের প্রথম বাছাই দেশগুলি হল থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, ডমিনিকান রিপাবলিক, কোস্তারিকা, কিউবা, জার্মানি, মেক্সিকো, আর্জেন্তিনা, নেদারল্যান্ডস এবং কম্বোডিয়া। সমাততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া, হাঙ্গেরি, ইউক্রেন, পোল্যান্ড

এবং চেক রিপাবলিকের নামও ওই তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে। অবশ্য এসব গন্তব্যের খুব কমসংখ্যক যৌনকর্মীই কেবল যৌন-পর্যতকদের সেবা দিয়ে থাকে। ওসব দেশের মোত যৌনকর্মীর সিংহভাগই স্থানীয় পুরুষকুলের চাহিদা মেতায়। নির্দিষ্ট কোনো দেশের কেবল এক বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থানই কেবল যৌন-পর্যতকদের গন্তব্য হয়। যেমন নেদারল্যান্ডের আমস্তারডাম, থাইল্যান্ডের ব্যাকংক, পাট্টায়া ও পুকেত। আমেরিকায় স্থানীয়রা নেভাদায় যৌন-পর্যতনে যায়। এছাড়া অন্যান্য কিছু শহরে স্থানীয় পর্যতকরা বিশেষ আইনগত অনুমোদন নিয়ে যৌন-পর্যতনে বেরয়। এসব পর্যতকের অধিকাংশেরই ঝোঁক থাকে শিশুর প্রতি, যদিও অধিকাংশ দেশেই শিশুদের যৌনকাতে ব্যবহার করা আইনসম্মত নয়। বিশ্ববাণিত্য সংস্থা যৌন-পর্যতন ও শিশু যৌন-পর্যতনকে আলাদা করে দেখে। সংস্থার মতে, যেসব পর্যতক শিশুদেরকে যৌনকাতে ব্যবহার করে তাঁরা 'কনভেনশন অন দ্য রাইতস অব দ্য চাইল্ড' এবং 'অপশনাল প্রতোকল অন দ্য সেল অব চিলড্রেন', 'চাইল্ড প্রস্টিটিউশন অ্যান্ড চাইল্ড পর্নোগ্রাফি' লঙ্ঘন করে। অনেক দেশই 'ওরস্ট ফর্ম অব চাইল্ড লেবর কনভেনশন, ১৯৯৯'-এ স্বাক্ষর করেছে এবং নিজেদের দেশে সেটা বাস্তবায়ন করছে। সিঙ্গাপুরের এরকম কোনো আইন নেই বলে তারা ইতিমধ্যে অনেক নিন্দা করেছে। ইন্দোনেশিয়ার বাটামও ওরকম একটি গন্তব্য, যেখানে প্রচুর পরিমাণে কমবয়সি শিশুকে যৌনকাজে ব্যবহারের জন্যে পাওয়া যায়। "ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক"-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৮ ইস্যুতে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডের যৌনবাণিজ্যে কী পরিমাণ অর্থাগম ঘটে তার কিছু পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। ওই প্রবন্ধে স্বীকার করা হয় যে, যৌনখাত একটি অর্থনৈতিক খাত হিসাবে অফিসিয়াল পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। ওই প্রবন্ধে স্বীকার করা হয় যে, যৌনখাতে একটি অর্থনৈতিক খাত হিসাবে অফিসিয়াল পরিসংখ্যান, উন্নয়ন পরিকল্পনা বা সরকারের বাজেটে এখনও স্বীকৃত নয়। কিন্তু এ খাতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন ঘটে। বলা যায়, যৌনখাতে এই চারটি দেশে প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ নারী যুক্ত আছেন তা পেশাটি অনৈতিক ও গোপন হওয়ার কারণে বলা একেবারেই মুশকিল। তবে ধরে নেয়া যায়, দেশসমূহের মোট নারী জনগোষ্ঠীর ০.২৫ থেকে ১.৫ শতাংশ এ পেশায় যুক্ত। ১৯৯৩-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি একটি হিসাব অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ায় যৌনকর্মীর সংখ্যা দেখানো হয় ১৪০,০০০ থেকে ২৩০,০০০ জন। মালয়েশিয়ায় এই সংখ্যা ৪৩,০০০ থেকে ১৪২,০০০ জন, তবে আইএলওর মতে সে সংখ্যা আরও বেশি। ফিলিপাইনে যৌনকর্মীর সংখ্যা জানানো হয় ১০০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ জন, তবে ৫০০,০০০ হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই একমত বলে জানানো হয়। থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের হিসাব করা জরিপ অনুযায়ী যৌনকর্মীর সংখ্যা দেখানো হয় ৬৫,০০০, কিন্তু আনঅফিসিয়াল সূত্র দাবি করে এ সংখ্যা ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ জন। এর বাইরে থাই এবং ফিলিপিনো আরও ১০ হাজার নারী, শিশু এবং হিজড়ে যৌনকর্মী বিদেশে কর্মরত আছে। বলা হয়, যৌনতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিনোদনমূলক স্থাপনা এবং যৌনপর্যটনের সঙ্গে যুক্ত মালিক,

ব্যবস্থাপক, দালাল, সহযোগী, ক্যাশিয়ার, নিরাপত্তারক্ষী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে এ বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনধারণ করে থাকে। প্রতিবেদনটি বলছে, এই চারটি দেশের জিডিপির ২ থেকে ১৪ শতাংশই আসে যৌনখাত থেকে। সরকারি কর্তৃপক্ষ বৈধ-অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ করও আদায় করে থাকে সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলি থেকে। থাইল্যান্ডের শহরে যৌনকর্মে নিবিষ্ট গ্রামীণ নারীরা বছরে তাঁদের উপার্জন থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার গ্রামে তাঁদের পরিবারের কাছে পাঠান। ১৯৯৩-১৯৯৪ মেয়াদে দেশগুলি যৌনকর্ম বাবদ বছরে ২২.৫ থেকে ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। ইউনিসেফের তত্ত্বাবধানে হওয়া সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় আফ্রিকার দরিদ্র দেশ কেনিয়ায় শিশু পতিতাবৃত্তির এক ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশটির উপকূলীয় এলাকায় যৌন-পর্যটন চালু থাকায় সেখানকার অজস্র শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার মেয়েশিশু দেশটির মালিন্দি, মোম্বাসা, কালিফি এবং দিয়ানি উপকূলীয় এলাকায় বাস করে, যারা মাঝে মাঝেই অর্থের বিনিময়ে যৌনকর্ম করে। এছাড়াও ২ থেকে ৩ হাজার শিশু ছেলেমেয়ে অর্থের বিনিময়ে সার্বক্ষণিক যৌনপরিসেবা দিয়ে থাকে। উপকূলীয় যৌনপেশায় কর্মরতদের ৪৫ শতাংশই আসে দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে, যারা পূর্বেই এ কাজে হাতেখড়ি নিয়ে নেয়। অধিকাংশই আগে নিজেদের এলাকার বারে এ কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ও প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়, সাজগোজ করার কসমেটিক-গার্মেন্টস ও চুলের স্টাইল আধুনিককরণ করার জন্য অর্থ উপার্জন করে তারপর পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য আসে। এখানে শিশুদের মধ্যে যৌনকর্মের প্রাদুর্ভাব এমনই বেড়ে গেছে যে, প্রতি দশজন শিশুর একজন এ কাজে যুক্ত হয় তাদের বয়স বারোতে পৌঁছানোর আগেই। চরম দারিদ্র্যের কারণে কেনিয়ায় এখন এটি সামাজিকভাবেও অনেকাংশে স্বীকৃতি পাচ্ছে। শিশুদের একটা অংশ সাধারণত সেসব পরিবার থেকে আসে যেসব পরিবার উপাজনক্ষম কেউ নেই, অথবা কম উপার্জন করে কিংবা সেসব শিশু যাদের বাবা মা উভয়েই প্রয়াত হয়েছেন। তবে আগতদের ৫০ শতাংশের মা-বাবাই কর্মজীবী এবং তারা স্কুলেও যায়, তবে তারা চায় হাতখরচের জন্য বাড়তি কিছু টাকা। অবশ্য এরা সতর্ক থাকে যাতে সমাজের বয়সি কেউ বিষয়টি টের না-পেয়ে যায়। সূত্র জানায়, কেনিয়ার সৈকতে শিশু যৌন-পর্যটনে আগতদের ১৮ শতাংশ ইতালিয়ান, ১৪ শতাংশ জার্মান এবং ১২ শতাংশ সুইস। এরপরেই আছেন উগান্ডান, তাঞ্জানিয়ান, ব্রিটিশ এবং সৌদি আরবীয়রা। তবে দেশের ভিতরেও এই শিশুদের গ্রাহক প্রচুর। পর্যটকদের আগমন যে সময়ে কম হয় বা একেবারেই হয় না, তখনও এই শিশুরা একেবারে কর্মহীন থাকে না।

নাকি ঘৃণার সব ক্লেদ মাখবেন ওই জাতে উঠতে-না-পারা রেড লাইট এরিয়ার বাসিন্দারা অর্থাৎ বেশ্যাপল্লির বেশ্যারা? হয় সব রকমের বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হোক, নতুবা সব রকমের বেশ্যাবৃত্তি বৈধ করা হোক। নাচ আর ঘোমটা - দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

এই ভারত উপমহাদেশে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বহিরাগতদের উপনিবেশের ফলে

ভারতীয় সংস্কৃতি বারবার ছিন্নভিন্ন হয়েছে। শুরু আর্য তথা এরানীয় থেকে, শেষ হয়েছে ব্রিটিশরাজে। উপর্যুপরি পরীক্ষানিরীক্ষার পর আজকের ভারত, আজকের ভারতের সংস্কৃতি। সবচেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে প্রায় ৭০০ বছরের মুসলিম (মধ্যপ্রাচ্য, মঙ্গোলীয়) শাসনে, পরের ধাপে প্রায় ২০০ ব্রিটিশ শাসনে। ধর্মের এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বড়ো একটা প্রভাব পড়েছে এই উপমহাদেশের মানুষদের জীবনচর্চায়। সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম বা পৌরাণিক ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম - সব মিলিয়ে এক্কেবারে এক জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি হয়ে জেগে রইল এই উপমহাদেশ। ফলে প্রাচীন যুগে যে পেশা ছিল বৈধ, স্বীকৃত, সম্মানীয় - সেই একই পেশা না-ঘরকা না-ঘাটকা, না-বৈধ না-অবৈধ, ন যযৌ ন তস্থৌ। তাই বৃত্তি আছে, থাকবে - নিরাপত্তাহীনতাও আছে, আছে পুলিশের অনধিকারচর্চা-অনুপ্রবেশ, আছে মাস্তানের অপ্রত্যাশিত দৌরাত্ম্য। ঝেড়ে কাশেননি অনেক দেশের আইন-প্রণেতারা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না দেহব্যাবসা অবৈধ, না বৈধ। বৈধও না, আবার অবৈধও না - এটা কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাষ্ট্রেক কর্তব্য হতে পারে না।

পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ কোনোদিন ছিল না যে দেশে বেশ্যা-বেশ্যাবৃত্তি-বেশ্যালয় নেই। বর্তমানে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে বেশ্যা-বেশ্যাবৃত্তি-বেশ্যালয় আইনত বৈধ - সেখানে সকল নারীপুরুষ যেমন বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা করেনি, ঠিক তেমনই এমন অনেক দেশ আছে যেখানে বেশ্যা-বেশ্যাবৃত্তি-বেশ্যালয় আইনত অবৈধ - সেখানেও বেশ্যা-বেশ্যাবৃত্তি-বেশ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে এমন কথা শুনিনি। বেশ্যাবৃত্তি ১০০টি দেশের মধ্যে ৫০ ভাগ দেশে বৈধ, ৩৯ ভাগ অবৈধ এবং ১১ ভাগ দেশে সীমাবদ্ধ বৈধ। বৈধ, অবৈধ এবং সীমাবদ্ধ বৈধ দেশগুলি জেনে নিতে পারি-

৩৯ টি অবৈধ দেশ ঃ (১) আফগানিস্থান, (২) আলবেনিয়া, (৩) অ্যাঙ্গোলা, (৪) অ্যান্টিগা ও বারবুদা, (৫) বাহামা, (৬) বারবাডোজ, (৭) কাম্বোডিয়া, (৮) চিন (তাইওয়ান সহ), (৯) ক্রোয়েশিয়া, (১০) কিউবা, (১১) ডোমিনিকা, (১২) ইজিপ্ট, (১৩) গ্রেনাডা, (১৪) গুয়ানা, (১৫) হাইতি, (১৬) ইরান, (১৭) ইরাক, (১৮) জামাইকা, (১৯) জর্ডন, (২০) কেনিয়া, (২১) উত্তর কোরিয়া, (২২) দক্ষিণ কোরিয়া, (২৩) লাইবেরিয়া, (২৪) লিথুয়ানিয়া, (২৫) মাল্টা, (২৬) ফিলিপিনস, (২৭) রোমানিয়া, (২৮) রুয়ান্ডা, (২৯) সেন্ট কিটস ও নেভিস, (৩০) সেন্ট লুসিয়া, (৩১) সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, (৩২) সৌদি আরব, (৩৩) সালভেনিয়া, (৩৪) দক্ষিণ আফ্রিকা, (৩৫) সুরিনাম, (৩৬) থাইল্যান্ড, (৩৭) ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, (৩৮) উগান্ডা, (৩৯) সংযুক্ত আমির শাহি।

৫০টি বৈধ দেশ ঃ (১) আর্জেন্টিনা, (২) আমেরিকা, (৩) অস্ট্রিয়া, (৪) বেলজিয়াম, (৫) বেলিজ, (৬) বলিভিয়া, (৭) ব্রাজিল, (৮) কানাডা, (৯) চিলি, (১০) কলম্বিয়া, (১১) কোস্টারিকা, (১২) সাইপ্রাস, (১৩) চেক রিপাবলিক, (১৪) ডেনমার্ক, (১৫) ডোমেনিকান রিপাবলিকান, (১৬) ইকুয়াডর, (১৭) এল সালভাদর, (১৮) ইস্টোনিয়া, (১৯) ইথিয়োপিয়া,

(২০) ফিনল্যান্ড, (২১) ফ্রান্স, (২২) জার্মানি, (২৩) গ্রিস, (২৪) গুয়াতেমালা, (২৫) হন্ডুরাস, (২৬) হাঙ্গেরি, (২৭) ইন্দোনেশিয়া, (২৮) আয়ারল্যান্ড, (২৯) ইজরায়েল, (৩০) ইটালি, (৩১) কিরগিজস্তান, (৩২) লাটভিয়া, (৩) লুক্সেমবার্গ, (৩৪) মেক্সিকো, (৩৫) নেদারল্যান্ডস, (৩৬) নিউ জিল্যান্ড, (৩৭) নিকারাগুয়া, (৩৮) পানামা, (৩৯) পারাগুয়া, (৪০) পেরু, (৪১) পোল্যান্ড, (৪২) পোর্তুগাল, (৪৩) সেনেগাল, (৪৪) সিঙ্গাপুর, (৪৫) স্লোভাকিয়া, (৪৬) সুইজারল্যান্ড, (৪৭) তুরস্ক, (৪৮) ইউনাইটেড কিংডম (স্কটল্যান্ড সহ), (৪৯) উরুগুয়ে, (৫০) ভেনেজুয়েলা।

১১টি সীমাবদ্ধ বৈধ দেশ ঃ (১) অস্ট্রেলিয়া, (২) বাংলাদেশ, (৩) বুলগেরিয়া, (৪) আইসল্যান্ড, (৫) ভারত, (৬) জাপান, (৭) মালয়েশিয়া, (৮) নরওয়ে, (৯) স্পেন, (১০) সুইডেন, (১১) ইউনাইটেড স্টেট।

বেশ্যাবৃত্তি প্রসঙ্গে ভারতীয় আইন কী বলছে? **Prostitution law** varies widely from country to country, and between jurisdictions within a country. Prostitution or sex work is legal in some parts of the world and regarded as a profession, while in other parts it is a crime punishable by death. In many jurisdictions prostitution is illegal. In other places prostitution itself (exchanging sex for money) is legal, but surrounding activities (such as soliciting in a public place, operating a brothel, and pimping) are illegal. In other jurisdictions prostitution is legal and regulated. In most jurisdictions which criminalize prostitution, the sex worker is the party subject to penalty, but in some jurisdictions it is the client who is subject to a penalty.

Prostitution has been condemned as a single form of human rights abuse, and an attack on the dignity and worth of human beings, while other schools of thought state that sex work is a legitimate occupation; whereby a person trades or exchanges sexual acts for money and/or goods. Some believe that women in developing countries are especially vulnerable to sexual exploitation and human trafficking, while others distinguish this practice from the global sex industry, in which “sex work is done by consenting adults, where the act of selling or buying sexual services is not a violation of human rights.” The term “sex work” is used interchangeably with “prostitution” in this article, in accordance with the World Health Organisation (WHO 2001; WHO 2005) and the United Nations (UN 2006; UNAIDS 2002).

In India, prostitution (the exchange of sexual services for money) is legal, but a number of related activities, including soliciting in a public place, keeping a brothel, pimping and pandering, are outlawed. Rajeshwari (1999) asserts that realistic accounts of prostitution in research contextualize it in the broad frame of the Indian socio-economic structure, adverting to the rural poverty and bonded labor, the gross exploitation of

tribal, lower-caste and refugee women, urban red-light areas, disease, policy brutality and corruption, and the increasingly controversial issue of prostitutes[1] children. The country is a significant source, transit point, and destination for trafficked women. According to UNICEF, India contained half of the one million children worldwide who enter the sex trade each year. Many indigenous tribal women were forced into sexual exploitation. In recent years, prostitutes began to demand legal rights, licenses, and reemployment training, especially in Mumbai, New Delhi, and Calcutta. In 2002, the Government signed the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) *Convention on Prevention and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.* The country is a significant source, transit point, and destination for many thousands of trafficked women. There was a growing pattern of trafficking in child prostitutes from Nepal and from Bangladesh (6,000 to 10,000 annually from each). Girls as young as seven years of age were trafficked from economically depressed neighborhoods in Nepal, Bangladesh, and rural areas to the major prostitution centers of Mumbai, Calcutta, and New Delhi. NGOs estimate that there were approximately 100,000 to 200,000 women and girls working in brothels in Mumbai and 40,000 to 100,000 in Calcutta.

The traditional argument supporting prostitution as a phenomenon invokes male sexual need as a "natural" phenomenon that requires fulfillment outside of monogamous marriage - and the prostitute as servicing this need. Its theoretical defense is given in what is termed the "contractarian" argument, according to which the need for sexual gratification is a need similar to the need for food and fresh air (and hence should be as readily available) and, further, that under conditions of "sound" prostitution, sexual services may be freely sold in the market place (Ericsson: 1980). Feminists reject the notion that the powerful male impulse must be satisfied immediately by a co-operative class of women, set aside for the purpose. This is seen as an adrocentric view of sexuality and as reinforcing the psychology of obtaining sexual satisfaction, by rape if necessary. In legal terms, the Indian Immoral Traffic (Prevention) Act 1956, criminalized the volitional act of "a female offering her body for promiscuous sexual intercourse for hire whether in money or in kind". But, under the revised 1986 Act, "prostitution" means " the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purpose, and the expression 'prostitute' shall be constructed accordingly" - so there is not only no criminality if there is "offering by way of free contract", there is not even prostitution. More problematic is the status of the transgendered who eke out a living by begging, dancing or prostitution.Until 2014,Indian law recognized only two biological sexes. The PUCL (K) Report (2003), highlights, "The dominant dis-

course on human rights in India has yet to come to terms with the production/reproduction of absolute human right are less of transgender communities. At stake is the human right to be different, the right to recognition of different pathways of sexuality, a right to immunity from the oppressive and repressive labeling of despised sexuality. Such a human right does not exist in India."

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বেশ্যাবৃত্তি এযুগে আর শিল্পের পর্যায়ে নেই। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে বেশ্যামির ভাষা বদলাতে থাকল। নারী এখন স্রেফ পণ্য। পনারীও নিজেকে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভ এবং লালসায়। স্কুল-কলেজের ছাত্রী, গৃহবধূ, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত - সব শ্রেণি থেকে এখন নতুন খেলায় মেতেছেন। শরীরটাকে উত্তরণের সিঁড়ি বানিয়ে নারী ক্রমশ আধুনিকতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সরাসরি দেহব্যাবসার মাধ্যম বিলিয়ন ডলার মুনাফা করা হচ্ছে। Havocscope সূত্রে জানা যাচ্ছে, সারাবিশ্বে শুধু শরীর বিক্রিতেই রেভিনিউ সংগ্রহ হয় প্রায় ১৮৬ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাব শুধুমাত্র পেশাদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, সারাবিশ্বের ১৩,২৬৫,৯০০ দেহব্যাবসায়ীদের হিসাবে। নথিভুক্ত নয় এমন দেহব্যাবসায়ীদের হিসাব আরও কয়েক গুণ। কথা হচ্ছিল বেশ্যাবৃত্তির বিষয়ে। বিশ্বের অনেক দেশ, যাদের প্রধান অনুমোদন করে যাচ্ছে পতিতাবৃত্তিতে আগ্রহী যে-কোনো আঠারো বছর বয়সোত্তীর্ণ নারীকে দেহব্যাবসা চালাবার জন্য লাইসেন্স দিয়ে, সারাদেশে ১৪টি পতিতালয় পরিচালনা করে এবং সেখান থেকে রেভিনিউ গ্রহণ করে।

শুধু কি মহিলারাই বেশ্যাবৃত্তিতে আসে বা আসতে বাধ্য হয়? তা কেন? পুরুষরাও এখন রোজগার করতে বেশ্যাবৃত্তিতে আসছেন। সংখ্যায় তাঁরাও কিছু কম নন। ক্রমশ বাড়ছে মুক্ত অর্থনীতির বাজারে। যৌন-বাজারে আবার আর-এক শ্রেণির আর্বিভাব হয়েছে, এরা ব্যক্তিগত যৌন-অতৃপ্ততা থেকে অন্য পুরুষের কাছে শরীর সমর্পণ করে। এরা মূলত বিবাহিত মহিলা, এরা নিজেদের পছন্দমতো যৌনসঙ্গী খুঁজে নেন, যে পুরুষ এই নারীকে শরীরী-সুখে তৃপ্ত করতে পারবে সে পাবে পর্যাপ্ত অর্থমূল্য। ছুৎমার্গকে সরিয়ে দিয়ে সমাজে এক মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে, যাঁরা যথেষ্ট অর্থের বিনিময়ে পুরুষদের কাছ থেকে যৌন-পরিসেবা নিচ্ছেন। এইসব মহিলারা বেশিরভাগই উচ্চবিত্ত পরিবার থেকেই আর্বিভাব হচ্ছে। এইসব মহিলাদের যেসব পুরুষরা যৌনসুখ দান করেন তাঁদের 'জিগোলো' বলা হয়। এই বাজারে পুরুষক্রেতারা যেমন তার বয়সের থেকে তুলনামূলক অনেক কম বয়সি মেয়েদের পছন্দ করে, তেমনই নারীক্রেতারাও তার বয়সের থেকে তুলনামূলক কম বয়সি ছেলেদেরকে যৌনসঙ্গী হিসাবে বেশি পছন্দ করে। এখানে নারী ক্রেতা, পুরুষ পরিসেবাদাতা। আপাতত এরা সংখ্যায় অল্প হলেও এ ব্যাপারটা নারী-ক্ষমতায়নেরই ইঙ্গিত দেয়।

দেহব্যাবসার ইতিহাসে পুরুষ-বেশ্যা শব্দটি একটু নতুন হলেও সমকালীন সমাজতত্ত্বের এক নৈমিত্তিক অধ্যায়। 'যৌনকর্মী' হিসাবে অনেকপরে পুরুষের প্রবেশ। তাই পুরুষ-বেশ্যাদের

জন্য বিশেষণের বড়োই অভাব। পুরুষের যৌনকর্মী হিসাবে জীবিকায় আসা নারী যৌনকর্মীদের মতো নয়। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে পুরুষ যৌনব্যাবসায় দালালের কোনো ভূমিকা নেই। এমন কি আমাদের দেশেও পুরুষ-বেশ্যাবৃত্তি দালালনির্ভর নয়। জার্মান মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্শফেল্ড যেসব গণিকালয় ঘুরে দেখেছেন সেসবই নারী গণিকালয়েরই অনুরূপ। খুবই সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে এই ব্যাবসা চলত। সমুদ্রোপকূলের করাচী শহরের যৌনব্যাবসার ইতিহাস সুপ্রাচীন। এখানে অনেক পুরুষ বেশ্যালয় ছিল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যের একদল নারীবেশী পুরুষ যৌনকর্মীদের দেহব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, এ অঞ্চলে পুরুষ যৌনব্যাবসার প্রচলন ছিল।

আলোচনার সুবিধার্থে পুরুষ-বেশ্যাদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি। (১) শিমেল এবং (২) জিগোলো।

(১) শিমেল (Schemale) ঃ এরা মূলত সমকামী বা রূপান্তকামী। সমকামী পুরুষ যৌনব্যাবসায় প্রচলন ঠিক কবে থেকে হয় তার ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই যে সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার অনেক দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ইতিহাস ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

শিমেল বা লেজিবয়দের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। (ক) পুরুষ অঙ্গে নারী চেতনায় এবং (খ) উর্ধাঙ্গ নারী ও নিম্নাঙ্গ পুরুষ। প্রকৃতিগতভাবে এই দুই শ্রেণিরই খরিদ্দার পুরুষ। তাহলে পার্থক্য কোথায়?

(ক) পুরুষ অঙ্গে নারী চেতনায় ঃ এরা বহিরঙ্গে পুরুষ, অন্তরঙ্গে নারী। এরা মেয়েলি ভাবের পুরুষ। এরা সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে যৌনমিলনে তৃপ্ত হতে পারেন না, তাই পুরুষরাই এদের যৌনসঙ্গী। চাপে পড়ে মেয়েদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করলেও সংসার সুখের হয় না। দু-চারদিন যেত-না-যেতেই মনের মতো পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়। এরা পুরুষ-শরীরে নারীর পরিধানে সজ্জিত হয়ে পুরুষ শিকার করে। এরা পুরুষ খরিদ্দারের সঙ্গে যৌনমিলনের জন্য নারীর যৌনাঙ্গের বিকল্পে তাঁর পায়ুপথ ব্যবহার করেন। পায়ুকামীদের কাছে এঁদের খুব চাহিদা। প্রসঙ্গত জানাই, গ্রিক ধর্মশাস্ত্রে জিউস ও গানাইমেডির বৃত্তান্তে সমলিঙ্গের প্রেম-ভালোবাসার কথা জানা যায়। রোম সম্রাট নিরো ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং খামখেয়ালি। তিনি একবার এক তরুণকে বিয়ে করার কথা ভাবেন এবং বিয়ে করেও ফেলেন। অবশ্য বিয়ের পরে সেই তরুণ সম্রাটের নির্দেশে স্ত্রীবেশ ধারণ করেছিল। জুলিয়াস সিজারেরও সমলিঙ্গের প্রতি ঝোঁক ছিল। হায়দ্রাবাদের নবাব টিপু সুলতানও কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হতেন। পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ মাঝেমধ্যেই বালকদের সঙ্গে যৌনক্রীড়া করতেন। শরিয়তি নির্দেশকে উপেক্ষা করেই মুসলিম শাসনাধীন রাষ্ট্র শেখরা অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখতেন। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ইরানীয় এক প্রশাসকের মুখ্য সহকারী ছিলেন মুতাজিলি ইসলাম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। তিনি আমজনতার কাছে ঘোষণা

রাখেন - মুতাজিলি হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পুরুষ সম্ভোগই যৌন-আনন্দের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

অবশেষে নিত্যনৈমিত্তিক বহুগামী যৌন-অভ্যাসের মধ্যেই একসময় অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটে। অর্থে বিনিময়ে যৌন-আনন্দ পেতে কেউই পিছ-পা হন না। পুরুষ-যৌনতাকে নিয়ে শুরু হয় ব্যাবসা। এই ব্যাবসার একটি বিশেষ রূপ হল সমকামী যৌন-ব্যাবসা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন গ্রিসেই খুব বিক্ষিপ্তভাবে এই ব্যাবসা শুরু হয়।

এ পথ মসৃণ নয়, দোষী হিসাবে পুরুষ যৌনকর্মীদের উপর কঠিন শাস্তি নেমে আসে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশে পুরুষ যৌনকর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। শুরু হয় গ্রেফতার। পুরুষ যৌনকর্মীদের এই সময় অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা হয়। পুরুষ যৌনকর্মীদের ফাঁসি পর্যন্ত দেওয়া হয়।

(খ) উর্দ্ধাঙ্গ নারী ও নিম্নাঙ্গ পুরুষ ঃ এদের উর্দ্ধঙ্গে নারীদের মতো সুডৌল এবং পুষ্ট স্তন থাকে। নিম্নাঙ্গে পুরুষের সতেজ লিঙ্গ। একই অঙ্গে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে। খোদার উপর খোদগারি! এঁরা যেমনই লেসবিয়ানদের সঙ্গে যেমন যৌনসম্পর্ক করেন, তেমনই হোমোসেক্সচুয়ালদের সঙ্গেও সেক্স করে রোজগার করেন। এরা সাধারণত ধনীদের যৌনসঙ্গী হয়ে থাকে। এছাড়া পর্নোছবিতেও এঁদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইন্টারনেট দুনিয়ায় এদের পর্নোছবির ছড়াছড়ি।

(২) জিগোলো (Gigolo) ঃ জিগোলো শব্দটি ফরাসি। কী বলছে Wikipedia? "A **gigolo** is a male escort or social companion who is supported by a woman in a continuing relationship, often living in her residence or having to be present at her beck and call. The gigolo is expected to provide companionship, to serve as a consistent escort with good manners and social skills, and often, to serve as a dancing partner as required by the woman in exchange for the support. Many gifts such as expensive clothing and an automobile to drive may be lavished upon him. The relationshipo may include sexual services as well, when he also would be referred to as "a kept man". The term *gigolo* usually implies a man who adopts a lifestyle consisting of a number of such relationships serially, rather than having other means of support. The word *gigolo* may be traced to a first use as a neologism during the 1920s as a back formation from a French word, *gigolette*, a woman hired as a dancing partner."

আদতে যা Gigolo, তাই-ই Callboy। Callgirl-রা পুরষ এবং নারীদের (যদি লেসবিয়ান) যৌনসুখ বেচেন, Callboy-রা নারীদের এবং পুরুষদের (যদি হোমোসেক্সচুয়াল) যৌনসুখ বেচেন। মধ্য চল্লিশের নিঃসঙ্গ মহিলা হোন কিংবা যৌনসুখে আসক্ত যুবতী সহ যেসব মহিলারা অর্থের বিনিময়ে উদ্দাম যৌনসুখ পেতে চায়, তাঁরা সোজা বাংলায় যাকে বলে ''পুরুষ যৌনকর্মী''-দের "Call" করেন। এইসব পুরুষ-বেশ্যারা অধিকাংশই কম বয়সি,

ফড়ফড় করে ইংরেজিতে কথা বলিয়ে, সৌম্যদর্শনযুক্ত এবং ফ্যাশন-দুরস্ত। কোনো কোনো পুরুষদের এটাই একমাত্র পেশা, কারোর কারোর আবার সাইড ইনকামের জন্য পার্ট-টাইম। কেউ অবিবাহিত, কারোর আবার স্ত্রী-সন্তানও আছে। মোটা টাকার রোজগার সহ স্রেফ স্ফূর্তির জন্য অনেকে এ পেশায় করতে করতে তারপর নেশায় পরিণত হয়ে যায়। জিগোলো বা কলবয়ের পেশায় চলে আসছে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। মধ্যবয়সি মহিলাদের কাছে এইসব কম বয়সি ছেলে-ছোকরা ব্যাপক চাহিদা। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় খরিদ্দারদের বয়স যত বেশি হয় রেটও হয় তত বেশি হয়। বিস্ময়াভূত হবেন না - জিগোলোদের মুখে শোনা যায়, ১৭ থেকে ৭০ সব বয়সের মহিলারা খরিদ্দার হয় জিগোলোদের। জনৈক জিগোলো তাঁর এক জবানবন্দিতে বলছেন - "একবার কিছুদিনের জন্য এক মহিলার স্বামীর ভূমিকায় থাকতে হয়েছিল। আবার আলিপুরের এক মহিলার স্বামী আমাকে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর জন্য। ভদ্রলোক অসম্ভব পয়াসাওয়ালা, কিন্তু অক্ষম। তাই স্বামী-স্ত্রী মিলে আপসে এই ব্যবস্থায় এসেছিলেন। ভদ্রলোকের একটাই শর্ত ছিল। তাঁর সামনে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে হবে। আর একবার খুব বড়োলোক বাঙালি বাড়ির ২৪-২৫ বছরের ছেলে তাঁর মধ্য-চল্লিশের মায়ের জন্য আমাকে ভাড়া করেছিলেন। অবশ্যই মায়ের সম্মতিতেই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন সেই মহিলা। আমাদেরই অন্য জনের কাছে শুনেছি, এক বয়স্ক মহিলা তাঁর ক্লায়েন্ট ছিলেন, তিনি তাঁর বিধবা মেয়ের জন্যও তাঁকে ভাড়া করতেন"।

কেউ কেউ ইন্ডিভিজুয়াল বা স্বাধীনভাবে কাজ করেন, কেউ-বা মেল এসকর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে কাজ করেন। মেল এসকর্ট সার্ভিসের পুরুষই হোক কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল —কেউই লোকলজ্জার ব্যাপারটা পুরোপুরি এড়িয়ে সামনে আসতে রাজি নন। বলতে চান না নিজেদের পরিচয়। জিগোলোদের বেশিরভাগই আসছেন তথাকথিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, এমনকি উচ্চবিত্ত অংশ থেকে। তাঁদের সংসার, চাকরি, সামাজিক পরিচিতি সবই আছে। এঁরা সম্মান হারানোর ভয় পান।

এক এক রাতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা রোজগার! কখনও হোটেল, কখনও খরিদ্দারের বাড়িতে - যৌনসুখ আর অর্থসুখ, একসঙ্গে! বয়স ২৬ থেকে ৪৫ — কলকাতার পুরুষ যৌনকর্মীদের মধ্যে এঁরা প্রথম সারিতে। শুধু সিঙ্গল বেড পার্টনার নয়, গ্রুপ সেক্স বা কাপল সেক্সের জন্য পুরুষ বেশ্যাদের ডাক পড়ে। গ্রুপ সেক্স মানে, তিন-চারজন বা তার বেশি মহিলা এক সঙ্গে থাকবেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের পরিচিতই হয়ে থাকে। তাঁদের সঙ্গে পালা করে সেক্স করতে হবে পুরুষ বেশ্যাদের। অপরদিকে, কাপল সেক্স হল স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কোনো এক পুরুষ বেশ্যাকে ভাড়া করেন। সেক্ষেত্রে একজন কলগার্লকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয় পুরুষ বেশ্যাকে। হবে পার্টনার সোয়াপিং। পুরুষ বেশ্যার সঙ্গে মহিলার মানে স্ত্রীটির এবং পুরুষটি মানে স্বামীটি যৌন সম্পর্ক করবে কলগার্লের সঙ্গে। হাই-প্রোফাইল মহিলারা চাকরি অথবা ব্যাবসা সূত্রে আসেন নামীদামি হোটেলে। এই মহিলারা কেউ ডমিনেটিং, কেউ বাইরে কঠিন, কেউ ভিতরে ভেঙে চুরচুর, কেউ প্রচণ্ড কামার্তা, কেউ

বিকৃতিমনা।

সম্প্রতি বেশ্যাবৃত্তির দায়ে শ্বেতা বসু প্রসাদের গ্রেফতার হওয়ার পরপরই প্রশ্ন উঠল — বেশ্যাবৃত্তির দায়ে শ্বেতা বসু প্রসাদের গ্রেফতার করা হলে গ্রেফতার করতে হবে সেইসব পুরুষদের যাঁরা শ্বেতাদের কাছে যৌনসুখ নিতে আসে। এ দাবি করলেন ধৃত শ্বেতা থেকে বলিউডের হার্টথ্রব অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকন। খরিদ্দার পুরুষদেরও বেশ্যা বলে ফেললেন। ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্পর্ক ভুলে গেলে চলবে না। যে বেচে সে বিক্রেতা, যে কেনে সে ক্রেতা। এক্ষেত্রে শ্বেতারা বিক্রেতা, পুরুষরা ক্রেতা। একপক্ষ পরিসেবা দেন, অপরপক্ষ পরিসেবা নেন পর্যাপ্ত অর্থের বিনিময়ে। পরিসেবাগ্রগহণকারী কখনও বিক্রেতা নন, পরিসেবাপ্রদানকারী কখনও ক্রেতা নন। একপক্ষ অর্থ গ্রহণ করে যৌনমিলনে ব্রতী হন, অপরপক্ষ অর্থ দেয়পূর্বক যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হন। একদলের ব্যাংক-ব্যালান্স বাড়ান, একদল ফতুর হন। দুই পক্ষের ভূমিকা ভিন্ন। এক্ষেত্রে খরিদ্দারকে 'বেশ্যা' বলা যায় না।

বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russel) অবশ্য তাঁর "ম্যারেজ অ্যান্ড মরালস" (Marriage and Morals) গ্রন্থে বলেছেন - "Marriage is for woman the commonest mode of livelihood, and the total amount of undesired sex endured by women is probably greater in marriage than in prostitution.

Yahoo-র সাইটেও কী বলছে দেখব -"It's an oversimplification to suggest marriage is JUST legalised prostitution ... for many, of course, this is not the case at all. For many, a love relationship exists and the sexual-economic exchange which defines prostitution is irrelevant, particularly for women who are wage-earners in their own right and not financially dependant upon any man. However, as much as it offends the sensibilities of the delicate, the fact is that yes, sometimes there is effectively 'prostitution', even within marriage. This has long been recognised by early feminist theorists studying sexual economics, who believed that all women in society were prostitutes somewhere along the continuum, it was merely a question of degree whether a woman sold herself to one man (ie got married!!), or to many men. The only distinguishing factor separating those we are willing to deem "prostitutes" from all other women was the degree of overtness. In fact some feminists argued that marriage was really just a form of prostitution in which women received poor recompense for their work,were more vulnerable to violence (from their husbands), and had less control over their daily lives than professional sex workers.

The lady you refer to in your question is, to my mind, effectively a prostitute. Her comment refers to her own willingness to trade sexual favours for money, albeit with her husband. There is no suggestion of love, passion, bonding, or emotional intimacy. I do realise her comment is taken out of context, so within the parameters of this question we are, of course,

working with that limitation. But that scenario you presented is indeed prostitution undercover of the respectability of marriage. I do feel that regarding the relationship between sex, power, and economics, it is moreso women who are willing to have a marriage that mimics prostitution practices. I think most men would consider that it would in fact be cheaper and a lot less drama to hire an actual prostitute now and then, especially when one considers the long-term risks of potentially being liable for child support and hefty divorce settlements. And of course, the accompanying emotional turmoil." (সুত্র ক্ষ্মhttps://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081231234310AAoP7nz)

Wikipedia বলছে - "Marriage is considered to be legalized prostitution by some feminist scholars, such as Dale Spender and women's rights activist Victoria Woodhull. Despite this claim, many men and women are happily married in loving relationships. There are some who view doing anything that you don't want to do, but are willing to do for money, as a form of prostitution. This would make most of the global work force, and almost all politicians, filthy stinking whores."

বেশ্যাবৃত্তি বা Prostitution নিয়ে অন্যেরাও কে কী বলছেন একটু ধারণা নেব —

VICTOR HUGO (*Les Miserables*): We say that slavery has vanished from European civilization, but this is not true. Slavery still exists, but now it applies only to women and its name is prostitution.

EMMA G01DMAN(AnarcA/sm *and Other Essays*): To the moralist prostitution does not consist so much in the fact that the woman sells her body, but rather that she sells it out of wedlock.

ANGELA CARTER (*Nights at the Circus*): What is marriage but prostitution to one man instead of many?

ARTHUR SCHOPENHAUER, ("On Women," *Studies in Pessimism*): There are 80,000 prostitutes in London alone and what are they, if not bloody sacrifices on the altar of monogamy?

RUTH MAZO KARRAS (*Common Women*): Prostitution exists today because women are objectified sexually, and because it is considered more permissible for men than for women to have purely sexual experiences.

NILS JOHAN RINGDAL (*Love For Sale*): If nobody wants to sell sex, it is a crime to force anyone to do so. But when men or women do want to sell their bodies, they should have that full right without encountering, punishment or discrimination. If the client behaves decently, the relationship between the sex buyer and the sexj seller must be considered a purely private transaction.

RAY ROMANO (*Professional Therapist*): I'd rather be in Las Vegas 104 degrees than New York 90 degrees, you know why? Legalized prostitution. In any weather that takes the edge off.

JESSE VENTURA, (*Playboy* interview, Nov. 1999): Prostitution is criminal, and bad things happen because it's run illegally by dirt-bags who are criminals. If it's legal, then the girls could have health checks, unions, benefits, anything any other worker gets, and it would be far better.

CAMILLE PAGLIA (*Vamps and Tramps*): *Butterfield 8,* with its call-girl heroine working her way down the alphabet of men from Amherst to Yale, appeared at a very formative moment in my adolescence and impressed me forever with the persona of the prostitute, whom I continue to revere. The prostitute is not, as feminists claim, the victim of men, but rather their conqueror, an outlaw, who controls the sexual channels between nature and culture.

BARBARA MEIL HOBSON (*Uneasy Virtue*): Prostitution will always lead into a moral quagmire in democratic societies with capitalist economies; it invades the terrain of intimate sexual relations yet beckons for regulation. A society's response to prostitution goes to the core of how it chooses between the rights of some persons and the protection of others.

EMMA GOLDMAN (*Feminism*): Nowhere is woman treated according to the merit of her work, but rather as a sex. It is therefore almost inevitable that she should pay for her right to exist, to keep a position in whatever line, with sex favors. Thus it is merely a question of degree whether she sells herself to one man, in or out of marriage, or to many men!... The economic and social inferiority of woman is responsible for prostitution.

CAMILLE PAGLIA (*Sexual Personae*): Prostitution is not just a service industry, mopping up the overflow of male demand, which always exceeds female supply. Prostitution testifies to the amoral power struggle of sex.... Prostitutes, pornographers, and their patrons are marauders in the forest of archaic night.

JULIE BURCHILL ("Born Again Cows," *Damaged Gods*): Prostitution reinforces all the old dumb cliches about women's sexuality; that they are not built to enjoy sex and are little more than walking masturbation aids, things to be DONE TO, things so sensually null and void that they have to be paid to indulge in fornication, that women can be had, bought, as often as not sold from one man to another. When the sex war is won prostitutes should be shot as collaborators for their terrible betrayal of all women.

JEANNETTE ANGELL (*Callgirl*): The only way to stop this trafficking in and profiting from the use of women's bodies is for prostitution to be legalized. Legalization will open it up to regulation; and regulation means

safety.

KATE MILLETT (*Sexual Politics*): Prostitution, when unmotivated by economic need, might well be defined as a species of psychological addiction, built on self-hatred through repetitions of the act of sale by which a whore is defined.

ANNA GARLIN SPENCER (*Woman's Share in Social Culture*): Prostitution requires for its diminution not only laws, well enforced, to abolish the traffic in womanhood; not only better social protection against harpies who seduce young girls seeking an honest livelihood; not only better chaperonage of young girls in exposed occupations; not only better opportunities for natural enjoyment of youthful pleasure under morally safe conditions; not only these–but most of all, greater power on the part of the average young girl to earn her own support under right conditions and for a living wage.

নিষিদ্ধ পাড়ায় কেন যায় পুরুষরা? চারিদিকে যখন সেক্স র‍্যাকেট নিয়ে এত গুঞ্জন। তখন জানিয়ে রাখা ভালো দেহব্যাবসা চলছে, কিন্তু একমাত্র পুরুষের দয়াতেই। অনেকে বলতেই পারেন জিগোলো প্রথা এখনও বাড়ছে। কিন্তু তবুও যৌনপল্লিতে পুরুষ খদ্দেরদেরই রমরমা। সকলে বলবেন পারিবারিক জীবনে সুখশান্তির অভাবেই একজন পুরুষ যৌনপল্লির রঙিন আলোয় রাঙিয়ে তুলতে চান তার জীবন। কিন্তু যাঁরাই বেশ্যালয়ে যান সেইসব পুরুষের জীবনের গল্পটা কি একই? যদিও সেটা নিয়ে ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন মতামত। বিবাহত জীবনে সমস্যা বা জীবনের নিরাশা দূর করার পাশাপাশি অতিরিক্ত যৌনখিদে মেটাতেও বেশিরভাগ পুরুষই একজন বেশ্যার বিছানায় আশ্রয় নেন। এমনও কিছু পুরুষ রয়েছে যারা দীর্ঘদিন ধরে একজন বেশ্যার কাছেই যান। যেসব পুরুষরা যৌনকর্মীদের আশ্রয় নেন তাদের ছবি মোটামুটি একই ধরনেরস, কিন্তু তারা এই কাজের জন্য কি যুক্তি দেন? ফ্রেড ও লারা প্রায় ছয় বছর ধরে একে অপরকে চেনে। কিন্তু তফাৎ একটাই যে লারার সঙ্গে সময় কাটাতে ও সহবাস করার জন্য টাকা দেয় ফ্রেড। সহবাসের জন্য টাকা দেওয়া ঠিক কি না তা নিয়ে দুজনে মাঝেমধ্যে ঝগড়াও করে। চাকরি ছাড়ার পর ইন্টারনেটের মাধ্যমেই লারার সঙ্গে আলাপ হয় ফ্রেডের। তাদের দুজনের মধ্যে খুব ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। লারা বলেন, "আমি দেখা করতে আসার আগেই ফ্রেড আমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয়"। অন্যদিকে রবার্টের জীবন আবার বেশ খানিকটা অন্য। বেশ কয়েকবছর হল তার বিয়ে হয়েছে। রবার্ট বলেন, "আমি সেক্স খুব পছন্দ করি, কিন্তু আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সে সেক্স তো দূরের কথা জড়িয়ে ধরা বা চুমু খাওয়াও পছন্দ করে না। যদিও জীবনসঙ্গিনী হিসেবেও খুব ভালো"। তিনি আরও বলেন, "আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাইতাম। এই কারণেই আমাকে বাধ্য হয়ে টাকার বিনিময়ে যৌনতা কিনতে হয়েছে।" রবার্টের মতো অনেকেই মনে করেন সম্পর্কের জটিলতা কাটাতে এটি একটি ভালো উপায়। যদিও গ্রাহাম জানিয়েছেন, "এটাও

সত্যিই খুব রোমান্টিক, আর এতে মনে হয় যেন এক মিনিটে একটা গোটা সম্পর্ক তৈরি হওয়া"। গ্রাহামের মতোই অপর একজন হলেন সাইমন। লাজুক হওয়ার কারণেই মহিলাদের সঙ্গে সহজে মেশাটা তার কাছে চিরকালই ছিল দুঃসাধ্য। সাইমন বলেন, "সহবাসের জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু শুধু সাময়িক আনন্দের জন্য আমি এটা করি না। আসলে ওই মুহূর্তে কিছু সময় যদি আমি একজন মহিলার সঙ্গে কাটাতে না পারি, তাহলে আমি নিজেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ বলে মনে করতে থাকি।" পুরুষদের বেশ্যাগমন কিন্তু শুধুই বীর্যস্খলনের জন্য - এটা ভাবলে বেশ ভুল হয়ে যাবে। কেউ যায় নেশা করতে, কেউ যায় নানা কারণে আত্মগোপন করতে, কেউ যায় বডি করাতে, কেউ-বা অত্যাচার করতে, কেউ যায় শুধুই ঘসাঘসি করতে, কেউ-বা আসে নির্ভেজাল গল্প করতে। কে, কী করতে বেশ্যার ঘরে রাত বা দিন কাটাচ্ছে তা এক প্রয়োজনের সঙ্গে আর-এক প্রয়োজন এমনভাবে মিশে আছে যে কোনো একটা উদ্দেশ্য আলাদা করে বাছা যায় না।

বেশ্যাপাড়ার বেশ্যারা কেমন মস্তি-স্ফূর্তি করে জানতে ইচ্ছা করে খুব। সেটা যৌনতা নিয়ে তামাম মানুষের কত ফ্যান্টাসি কত প্যাশন, সেই যৌনতা বেশ্যাপাড়ার বেশ্যাদের যৌনসঙ্গী যখন মোটেই দুর্লভ নয়, সেই যৌনতা কতটা উপভোগ্য! একটিবার যৌনমিলনে জন্য নারীপুরুষনির্বিশেষে যে মানুষ হা-হুতাশ, তখন বেশ্যাপাড়ার বেশ্যারা 'হর রাত নই খিলাড়ি'-দের পেয়ে জীবন কেমন সুখের সাগরে ভাসছে? ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কথা বলতে হবে তাঁদেরই সঙ্গে, যাঁরা প্রতি রাত নতুন নতুন যৌনসঙ্গীদের যৌনমিলনে মেতে ওঠেন। রাতভর যাঁরা স্ফূর্তি করে তাঁরা কী বলছে? পৌঁছে গেলাম বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ের একটি প্রসিদ্ধ বেশ্যাপাড়ায়। প্রথম দিন অনেকটা জড়তা-আড়ষ্ঠতা চেপে বসলেও, পরে সহজেই সহজ হয়ে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন স্তরের মোট ১০ জন যৌনকর্মীর সঙ্গে কথা বলার সমর্থ হয়েছিলাম। 'বাবু' হিসাবেই কথা বলেছিলাম। সাংবাদিক, লেখকের পরিচয়ে নয় - সোজাসুজি 'বাবু' হিসাবে সময় চেয়েছি, পয়সা দিয়েছি, গল্প শুনেছি। কী গল্প? যা শুনেছি তা যতটা সম্ভব মার্জিত ভাষায় শীলিত ঢঙে প্রকাশ করার চেষ্টা করব স্মৃতির কাছে ঋণী থেকে —"এ পাড়ার মেয়েরা কেউ মানুষ নয়, যোনি-সংবলিত যন্ত্রবিশেষ। ভালোবাসাহীন, প্রেমহীন, আদরহীন, আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন, রুচিহীন এক যান্ত্রিক সম্পর্কহীন সম্পর্ক। পয়সার বিনিময়ে আমাদের প্রতি রাতে ক্লান্তিহীন যোনি বিলাতে হয় একাধিক পুরুষকে, যে পয়সার অনেকটা অংশ খেয়ে নেয় অনেক নেপো। প্রতি রাতের এক-একটি খরিদ্দার যেন এক-একটি বিভীষিকা, আতঙ্ক, অত্যাচারী, নির্যাতক। পুরুষ নয়, লিঙ্গনামক একটি মৃত্যুদন্ড! কেমন যৌনসুখ? যৌনসুখ কী সেটা কোনোদিনই বুঝতে পারলাম না। কাকে বলে সোহাগ-আদর? কাকে বলে শৃঙ্গার? যৌনসঙ্গী বেছে নেওয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। কোনোদিন তা জেনেবুঝে উপভোগ করতে পারলাম কই! জেনেবুঝে নেওয়া তো দূরের কথা - খরিদ্দারের সঙ্গে যখন প্রথম যৌনকর্মের অভিজ্ঞতা হয় তখন তো অজ্ঞান অবস্থা। যখন, মানে যে বয়সে সেক্স করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার নয়, সেই বয়সে সঙ্গম ঘাড়ে চেপে বসে। বলাৎকার

দিয়ে শুরু হয় আমাদের যৌনজীবন। তারপর একদিন সময়ের দাবি মিটিয়ে শরীরের এ ক্ষত ক্রমশ শুকিয়ে যায়। শরীর-মনের ভালো লাগা মন্দ লাগার কোনো দাম নেই। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। 'বাবু' এলেই 'বসতে' হবে। এটাই দস্তুর। কখনো-কখনো খরিদ্দারের কাছে আমাদের শরীরটার জেল্লা বাড়াতে গর্ভধারণও করতে হয়। গর্ভধারণ করলে বুক-দুটো বেশ ভারি-ভারি হয়ে ওঠে, শরীরটা গোল-গোলপানা হয়। পোয়াতি মেয়ের বুক ভরা শরীর অনেক খরিদ্দারকে বেশ তাতিয়ে দেয়। কিন্তু সন্তান যতক্ষণ ধারণ করে রাখা যায় ধারণ করি, তারপর একসময় গর্ভপাত। পেটের ভিতর ছয়-সাত মাসের বাচ্চা তখন বেশ বড়ো। বাচ্চা এমন বড়ো হয়ে গেল গর্ভপাত মানেই মৃত্যুকে নেমতন্ন করা। তবুও করতে হয়। পেট খসাতে হাতুড়ে ডাকতে হয়, বাধ্য হয়েই। সেপটিক হয়ে কেউ কেউ মারাও যায়। কেউ সে খবর রাখে না। প্রতি মুহূর্তে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক যৌনমিলনের আতঙ্কে দিন এবং রাত গুজরান। সারা পৃথিবীর যৌনপল্লির যৌনকর্মীরা যে-কোনোদিন যে-কোনো মুহূর্তে পেশার মুখে লাথি মারতে তৈরি। সুযোগ পেলে আমরা যৌনপল্লিগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। কিন্তু চাইলেও কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হবে না। কারণ আমরা ছাড়া কেউই আমাদের পেশাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় না। বরং উল্টোটাই হয়। সব ভণ্ড। কি সমাজ, কি রাষ্ট্র, কি সমাজসেবী সংগঠক সবাই আমাদের মঙ্গলের নামে নিজেরা গুছিয়ে নিয়ে আমাদের টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র রচনা করে যাচ্ছে। মস্তানদের মাস্তানি, পুলিশের বাড়াবাড়ি, দালালের রমরমা, আড়কাঠির সক্রিয়তা, শরীরের অন্য অংশ সহ যোনিদেশে সিগারেটের ছ্যাঁকা, কামড়ে রক্তাক্ত করা, যোনিমুখে মদের বোতল বসিয়ে সজোরে লাথি মেরে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়ার আতঙ্ক, যোনির ভেতর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেওয়ার আতঙ্ক, পাড়ায় মেয়ে কেনাবেচা, নতুন নতুন মেয়েদের এ লাইনে নিয়ে আসা, সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস-সব আগের মতোই আছে, যেমন ছিল। যেটা হয়েছে, সেটা হল এলাকায় প্রচুর কন্ডোম বিক্রি বেড়েছে। আর ফি-বছর একটি মেলার আয়োজন হচ্ছে, যা যৌনকর্মী মেলা''।

পরিণতি? শেষপর্যন্ত এই দুর্দশাগ্রস্ত বেশ্যাদের পরিণতি কী? দুটি পরিণতি — (১) গেরস্ত হওয়া এবং (২) হাফ-গেরস্ত হওয়া। গেরস্ত হওয়া মানে যদি কোনো বাঁধা 'বাবু', সে মজুর-দালাল-পাতি চাকুরে-ব্যাবসায়ী যাই হোক - ধরে তাকে দিয়ে কপালে সিঁদুর পরিয়ে কোথাও সত্যিকারের ঘর বসানো যায়। অপরদিকে হাফ-গেরস্ত মানে অন্তত কোনো বাঁধা 'বাবু' পাওয়া, যে তাকে বিপদে-আপদে দেখবে, হয়তো দু-পয়সা মূলধন দিয়ে সাহায্য করবে যাতে কিনা সে কালে কালে বাড়িউলি হয়ে উঠতে পারে এই তাঁর পেশায় একমাত্র উত্তরণ। এই দুয়ের মধ্যে কিছুই না হলে ক্রমে ওই পল্লিতেই ঝি-গিরি করতে হয়, নয়তো পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়। যদি দেশ-গাঁ ঘর আত্মীয় বলে কিছু থাকে তো সেখানে বেঁচে থাকার অন্তিম ঠাঁই খুঁজে নিতে হয়।

যে সমস্ত পুরুষরা ওই পাড়ায় থাকে তাঁরা অধিকাংশই নেশাগ্রস্ত, বেকার, বেশ্যাদের উপার্জনের নির্লজ্জ পরজীবী। ওইসব মিথ্যা নিকম্মা গুলিখোর পুরুষরাই ওদের মানে বেশ্যাদের

প্রহার করে, অত্যাচার করে। সংগঠনের পদ দখল করে, মতামত দেয়। এইসব পুরুষপুঙ্গবদের হাত থেকে, দালালদের হাত থেকে, মাসিদের হাত থেকে অত্যাচারিত মেয়েদের রক্ষা করতে পারবে কারা? সংগঠন? সংগঠনের কর্মসূচিতে মিশে গেছে অত্যাচারী যাঁরা? দুর্ভাগা বেশ্যাদের কথা কে বলবে কারা? সংগঠন? ওদের কণ্ঠ কারা? সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবীরা, যাঁরা মৌচাকে রানি-মৌমাছি হয়ে বসে চূড়ায়? সংগঠনের অফিস আছে, অফিসে মোটা বেতনের চাকুরে আছে, সংগঠনের প্রেস আছে, সভা-সমিতি আছে। সংগঠনের রাজনীতী আছে। পাড়া কোন্ রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত থাকবে তা নিয়ে নিত্য লড়াই-সংঘর্ষ আছে।

গড়পড়তা একটা মেয়েকে প্রতিদিন কমবেশি চারবার সম্পর্ক করতে হয়। দিনের বা রাতের শেষতম খরিদ্দারটির জন্য যখন কোনো মেয়ে 'বসছে' তখন তথাকথিত সেই 'যৌনসেবা' দিতে শরীর কতটা প্রস্তুত। সপ্তাহে সাতদিন, মাসে তিরিশ দিন, বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন মেয়েটির জীবন এভাবে চলতে থাকে। কখনো-বা পেটের জন্য অস্থায়ী আস্তানা গড়তে হয়ে শহরের কোনো এক উপকণ্ঠে। বিচ্ছিন্ন প্রবাসী শ্রমিকদের বস্তির মধ্যে বেশ্যাপল্লি এখনও জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। কলকাতার মেয়েরা যেখানে ওভারটাইম খাটে। দিনে ৫০-১০০ শরীরে সঙ্গে মিলিত হতে হয়। বেশ্যাদের কাজ হল যথাযথ অর্থের বিনিময়ে পুরুষদের যৌনসুখ দিয়ে তৃপ্ত করা। শুধু কি যৌনসুখ দেওয়া? একজন পুরুষ যখন মূল্য দিয়ে একতাল মাংস ভাড়ায় নেয়, তখন সেই মাংস কেমনভাবে খাবে সেটা পুরুষটির উপরই নির্ভর করে। সে সঙ্গম করতে পারে, যৌন বিকৃতি চরিতার্থ করতে পারে, যৌনকর্মীকে প্রহার করতে পারে, ধর্ষকাম মেটাতে পারে, যোনিদেশে জ্বলন্ত সিগারেট দলে দিতে পারে। প্রতিটি বিক্রি হওয়াই তো মোটামুটি একইরকম যন্ত্রণাক্লিষ্ট — দেহে ও মনে দুই-ই। বেশ্যাপল্লির বেশ্যাদের যৌনকর্মী বা বেশ্যা যাই-ই বলা হোক-না-কেন "যৌন-ক্রীতদাস" বললেই এঁদের অবস্থানে অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। সিটি কলেজের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "যাঁদের দেহ বেঁচে খেতে হয়, তাঁদের 'যৌনকর্মী' বলে এই কুপ্রথাটিকে এক ধরনের অনুমোদন (স্যাংশান) দেওয়ায় আমার প্রবল আপত্তি আছে। পদ্মলোচন বললে কানার চোখ ফোটে না। দেহব্যাবসা শ্রেণিসমাজের বহু কলঙ্কের একটি; শ্রেণিপূর্ব সমাজে এমন কোনো কুৎসিত পেশা ছিল না। জীবনধারণের কোনো উপায় না থাকলে তবেই মেয়েদের এই পথ বেছে নিতে হয় — তার কারণ বেছে নেওয়ার মতো আর কোনো বিকল্প তাঁদের থাকে না। এই পেশা বন্ধ করাই হবে শ্রেণিহীন সমাজের দিকে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কাজ। যৌনকর্মী নাম দিয়ে, ট্রেড লাইসেন্স চালু করে যাঁরা এই পেশাটিকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তাঁরা আসলে শ্রেণিসমাজেরই পক্ষে ঃ আরও বহুরকম শোষণের মতো এই শোষণেও তাঁদের কোনো আপত্তি নেই"। (টপ কোয়ার্ক, ডিসেম্বর ২০০৪, ৬৯ পৃষ্ঠা)

যৌনকর্ম কি কোনো কর্ম? তাহলে যৌনকর্মী কেন? তার মানে তো যৌনকর্মের স্বীকৃতি! বৈধতা দান! তসলিমা বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধতা দেওয়ার বিরুদ্ধে। বলেছেন — "পতিতাপ্রথাকে বৈধ করা মানে নারী নির্যাতনকে বৈধ করা। যে রাষ্ট্র পতিতা প্রথা বৈধ সেই রাষ্ট্র সত্যিকার

কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। গণতন্ত্র মানবাধিকার নিশ্চিত করে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করে। কোনও সভ্যতা বা কোনও গণতন্ত্র মানুষের উপর নির্যাতনকে ছল-ছুতোয় মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে না। করতে পারে না। যদি করে, সেই গণতন্ত্রের নাম নিতান্তই পুরুষতন্ত্র, আর সেই সভ্যতার নাম বর্বরতা ছাড়া অন্য কিছু নয়"।

যৌনকর্মী শব্দটি নতুন। এঁরা নিজেদেরে কর্মী বলে মনে করে। বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে একটা সামাজিক ঘৃণা যুক্ত আছে বলে সমাজের অনেক পতিরা মনে করেন। যৌনকর্মী শব্দটির মধ্যে সামাজিক মর্যাদা বা পেশাকে সম্মান দেওয়ার অভিব্যক্তি আছে বলে ধারণা। কিন্তু আমার তেমন মনে হয় না। আর-একটি নতুন বিশ্লেষণ বা নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। বেশ্যা আর যৌনকর্মী শব্দটির মধ্যে মর্যাদাগতভাবে কোনো ফারাক নেই। দুটো শব্দই সমান ঘৃণার। তসলিমার সুরে সুর মিলিয়ে বললে, "নিজেদের যতই শ্রমিক বলে দাবি করুক, সমাজ জানে এঁরা বেশ্যার কাজই করছে। তকমা বদলালেই কি পরিবর্তন ঘটে যাবে? মেথরের কাজকে জাতিভেদাশ্রিত সমাজ শ্রদ্ধার চোখে না দেখলেও সেটা শ্রমিকের কাজ। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির কখনও এরকম ব্যাখ্যা হতে পারে না"। একটা শ্রেণির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই 'যৌনকর্মী' শব্দটির উদ্ভব। সেটি হল আইনি স্বীকৃতি। পেশার বৈধতা। বিপন্ন যৌনকর্মীদের সুরক্ষিত রাখতেই বৈধতা প্রয়োজন বইকি। আইনি স্বীকৃতি দিলেই যে সব মহিলারা দলে দলে এই বৃত্তিতে অংশগ্রহণ করবেন, এটা যেমন ঠিক ভাবনা নয় — ঠিক তেমনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলারা বুক চিতিয়ে "গতর খাটিয়ে খাই, শ্রমিকের অধিকার চাই" বলবেন এটাও সহ্য করা যায় না, যে পথেই হোক, যৌনবৃত্তিকে নিয়ে কখনোই আহ্লাদিত হওয়ার নয়। কারণ কোনো অপরাধেই অজুহাত আইনগ্রাহ্য হতে পারে না। 'খাইতে পারিলে কে চুরি করে' বললে কারোর চুরির করার অধিকার জন্মায় না, চৌর্যবৃত্তিও বৈধতা পায় না। পেটের জ্বালায় বেশ্যাবৃত্তি করাকে যদি সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হয়, তাহলে তো কোনো অপরাধকেই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে শাসিত দেওয়া যায় না! মানুষ তো পেটের জ্বালা মেটাতেই চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করেন, তাই না? যৌনব্যাবসাকে আইনি বৈধতা দিতে হলে তো চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির মতো ঘটনাগুলিকেও বৈধতা দিতে হয়। যৌনব্যাবসাকে আইনি বৈধতা নয়, বরং তাঁদের নাগরিক অধিকার বা দৃষ্টান্তমূলক বা যাবজ্জীবনের সাজা দেওয়ার দাবি জানাতে হবে। কারণ যাঁরা মেয়েদের ধরে এনে বেশ্যাবৃত্তিতে ঠেলে দেয়, তাঁরা আসলে একটি মানবাধিকারকে হত্যা করে। এইসব হত্যাকারীদের চরম শাস্তি নির্দিষ্ট করা উচিত। তসলিমা নাসরিন অন্য এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "এটা আর পাঁচটা পেশার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা। আপনার প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বাজার থেকে চাল কিনে খেতে যদি আপত্তি না-থাকে, তবে অর্থের বিনিময়ে যৌনতার কেনাবেচায় আপত্তি থাকবে কেন? পৃথিবী থেকে বাজারের ধারণা যদি উঠে যায়, তাহলে এ পেশা আপনা থ্যেকেই বন্ধ হয়ে যাবে" তাঁদের আপনি কী বলবেন?

বেশ্যাবৃত্তিকে কি আইনি স্বীকৃতি দেওয়া উচিত? কেন আইনি স্বীকৃতি সঙ্গত নয়?

আইনি স্বীকৃতি নয়, এর সপক্ষে দশটি যুক্তিও পাওয়া যায়। যেমন — (১) বেশ্যাবৃত্তির আইনি স্বীকৃতি আসলে আড়কাঠি, দালাল ও যৌন-ব্যাবসার কাছে এক উপহারস্বরূপ। এই ছাড়পত্রের সুবাদে পতিতালয়, সেক্স ক্লাব, ম্যাসেজ পার্লার, মধুচক্র, যৌনঠেক — সবই বৈধতা পেয়ে যাবে। (২) বেশ্যাবৃত্তির বৈধতাদান বা নিরপরাধীকরণের অর্থ নারী-পাচারকে উৎসাহিত করা। (৩) যৌনপেশার আইনি বৈধতা বা নিরপরাধীকরণ বেশ্যাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে না, বরং তাকে বাড়িয়ে দেয়। (৪) বেশ্যাবৃত্তি আইনি বৈধতা গোপন, বে-আইনি, খোলা রাস্তায় বেশ্যাবৃত্তি বাড়িয়ে দেয়। (৫) বেশ্যাবৃত্তির স্বীকৃতি দান ও নিরপরাধীকরণ যৌনশিল্পে নাবালিকাদের অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে দেবে। (৬) বেশ্যাবৃত্তির আইনি স্বীকৃতি যৌনপেশার নারীদের নিরাপত্তা দেয় না। (৭) বেশ্যাবৃত্তির স্বীকৃতি ও নিরপরাধীকরণের ছাড়পত্র যৌন-ব্যাবসার চাহিদা বাড়িয়ে দেবে, এই আইনি প্রশ্রয় পুরুষকে আরও নারীদেহ ক্রয়ে আকৃষ্ট করবে। (৮) আইনি মেয়েদের যৌনপেশার স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষা দেয় না। (৯) আইনি স্বীকৃতি বা নিরপরাধীকরণ বলবৎ হলেও যৌনপেশার নারীদের চাহিদা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য বাড়ে না। (১০) বেশ্যাবৃত্তি-ব্যবস্থার ভিতরকার মেয়েরা চায় না এই পেশা আইনি স্বীকৃতি পাক। কারণ বেশ্যাপল্লির এমন একটা মহিলাকে পাওয়া যায়নি, যে চায় তাঁর সন্তান-আত্মীয়-বন্ধুদের কেউ এই পেশায় অর্থোপার্জন করুক।

দেহব্যাবসায়ীদের কি 'যৌনকর্মী' বলা যায়? দেহোপজীবিনীরা কি শ্রমিক? কী বলছেন উচ্চ আদালতের আইনজীবী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়? — "চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত মেয়েগুলোকে ধরে এনে দেহব্যাবসা করানো হচ্ছে, তাঁদের পুনর্বাসনের না করে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে আরও জাঁকিয়ে ব্যাবসা করার দাবি জানানো হচ্ছে। এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে? যৌনকর্মীরা চাইছে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, ভাবা যায়! আরে বাবা, ব্যাবসা হল সাধারণত দু-রকম। এক, সুস্থ ও আইনি ব্যবসা। দুই, অসুস্থ ও বে-আইনি ব্যাবসা। এখন যে ব্যাবসাটা আপাদমস্তক অসুস্থ ও বে-আইনি, তার আবার ট্রেড ইউনিয়ন কীসের, আমার মাথায় তো কিস্যু ঢুকছে না। আর এই দাবির পিছনে যুক্তিটা কি, না আইনের অধিকার পেলে যৌনকর্মীদের ব্যাবসা করতে আরও সুবিধে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই ব্যাবসার আবার পরবর্তী সুযোগসুবিধা নিয়ে ভেবে কী লাভ? আজ যৌনকর্মীরা তাদের শ্রমিক বলে দাবি করছে। তাঁদের গতর খাটানোর সঙ্গে শ্রমিকের গতর খাটানোর তুলনা করছে। খুব নিষ্ঠুর অর্থে তাঁদের এবং শ্রমিকের গতর খাটানোর এই তুলনাটা মেনে নিলেও, জানতে ইচ্ছে করে একজন যৌনকর্মীর পক্ষে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একজন শ্রমিকের মতো উৎপাদন করা সম্ভব? সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, সমাজের প্রতি একজন শ্রমিকের যে দায়বদ্ধতা, একজন যৌনকর্মীরও কি সেই সমান দায়বদ্ধতা আছে! নিশ্চয় নয়। যদিও তাঁদের বক্তব্য, যৌনকর্মী না-থাকলে আজ ঘরে ঘরে এই দেহব্যাবসা হত, যে ব্যাবসা বন্ধ করেই নাকি সোনাগাছি, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কালীঘাটের মতো যৌনপল্লির প্রয়োজন। এটা একেবারেই অযৌক্তিক কথা। যেমন অযৌক্তিক তাদের এই দাবি। আরে বাবা, আইনের স্বীকৃতি পেলেই

কি মানুষের মানসিকতা, সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ পালটে যাবে? এটা কখনো হয় নাকি? শের শাহের আমলেও তো নিয়ম ছিল চুরি করলে হাত কাটা যাবে, তা বলে কি চুরি থেমে থেকেছে? সুতরাং আইনি স্বীকৃতি পেলেই যৌনকর্মীরা শ্রমিকের সঃবীকৃতি পেয়ে যাবে, সমাজের স্বীকৃতি পেয়ে যাবে, এমন চিন্তাভাবনার কোনো কারণ নেই"। (টপ কোয়ার্ক, ডিসেম্বর ২০০৪, ৭০ পৃষ্ঠা)

অশোকবাবুকে অনেকে রক্ষণশীল বলতেই পারেন। তাঁর সঙ্গে একমতও হতেও পারেন, আবার না-ও হতে পারেন। তবে আমি বলি কী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সারা পৃথিবীতে যে বিপুল পরিমাণ নারী এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বা হতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা যেভাবেই হোক তাঁদের শ্রমই বিক্রি করছেন। এক দিনের বা এক মাসের নোটিসে এদের এ পেশা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। একটি বড়ো শহরের সবকটি বড়ো বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে শহরে যেরকম দুর্যোগ নামবে, এটিকেও সেভাবেই দেখা দরকার। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এক পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার তৎকালীন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট গোটা কলকাতা শহরে ৪০৪৯ বেশ্যাঘর আছে বলে স্বীকার করেন, যাতে বাস করছিলেন মোট ১২,৪১৯ জন যৌনকর্মী। অর্থাৎ গৃহপ্রতি যৌনকর্মীর সংখ্যা ছিল ৩ জনেরও বেশি। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হেলথ অফিসার ফেভার-টোনার যৌনকর্মীর সংখ্যা ৩০,০০০ জন নির্ধারণ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪২৭১ জনে। ১৯২১ এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে উল্লিখিত সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১০, ৮১৪ এবং ৭,৯৭০ জনে। কিন্তু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়নের সভানেত্রী দাবি করেন যে পুলিশের হিসেবে কলকাতার যৌনকর্মীর সংখ্যা ২০,০০০ জন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের পরে অনেক দিন বয়ে গেছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। বিশ্বায়নের থাবায় দিকে দিকে দারিদ্র্য আরো বেড়েছে, বেড়েছে পাচার, বেড়েছে উন্মত্ততা। ফলে বর্তমানে কলকাতা শহরে যৌনকর্মীর সংখ্যা বেড়েছে বৈ তো নয়। দেবাশিস বসুর দেয়া তথ্য মতে, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ বিভাগের মহামারীতত্ত্ব বিভাগ যে জরিপ চালায় তাতে যৌনকর্মীদের মধ্যে কন্ডোম ব্যবহার বেশ দ্রুত হারে বাড়তে থাকল এবং তাঁদের যৌনরোগের সংক্রমণ কমতে থাকল। এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যাও ভারতের অন্যান্য জায়গায় যৌনকর্মীদের মধ্যে যতটা বাড়তে থাকল, সোনাগাছিতে ততটা বাড়ল না। ২০০৬ সালে সোনাগাছির যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্তের অনুপাত শতকরা ৬-এর মত, কিন্তু মুম্বাইয়ের কামাতিপুর এলাকায় শতকরা ৫০-এর বেশি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জায়গায় শতকরা ৩০-এর বেশি। সোনাগাছির যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্তের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণ হল তাঁদের খদ্দেরদের কন্ডোম ব্যবহার করতে রাজি বা বাধ্য করার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে বলে। দুর্বারের নানাবিধ কার্যক্রম মাধ্যমে তাঁর জীবনের অন্যান্য আরও কয়েকটি ক্ষেত্রেও ক্ষমতায়নের দিকে এগিয়েছেন। এর একটা প্রধান

উদাহরণ হল উষা কো-অপারেটিভ নামে নিজেদের একটি সমবায় সংস্থার সৃষ্টি করে স্থানীয় সুদখোর কুসিদজীবীদের শোষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া। যৌনকর্মীদের অনেকেই দৈনিক রোজগার থেকে কিছু টাকা এই সংস্থায় জমা রাখেন এবং অসুখ-বিসুখ বা অন্য কারণে বাড়তি টাকার দরকার হলে এই সংস্থা থেকে অল্প সুদে টাকা ধার করতে পারেন। উষা কো-অপারেটিভের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০০০ এবং সারা বছর এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকার বেশি লেনদেল হয়।

যৌনকর্মীদের এবং যৌনপেশাকে নির্মূল করা-না-করার প্রশ্নে, পুনর্বাসন প্রশ্নে, নৈতিকতা প্রশ্নে, ধর্মীয় প্রশ্নে, অধিকারের প্রশ্নে নানারকম তর্ক-বিতর্ক আমরা শুনে থাকি। অর্থশাস্ত্র মতে, বাজারে যদি কোনো পণ্যের চাহিদা থাকে তাহলে সে পণ্যের উৎপাদন রহিত করা যায় না। প্রকাশ্যে না-হলেও গোপনে তার উৎপাদন চলতেই থাকে। যৌনপণ্যের বাজারচাহিদা কমানো না-গেলে চিহ্নিত "রেড লাইট এরিয়া"-গুলিকে তছনছ করে দিলেও অন্য কোনো ছদ্ম-আবরণে এ ব্যাবসা চলতেই থাকবে। তাতে মাত্র একদল যাবে, একদল আসবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

কিন্তু লক্ষণীয় যে বেশ্যাবৃত্তি টিকিয়ে রাখার পক্ষে দেওয়া সর্বকালের সকল মতই হল পুরুষদের। কারণ এ প্রথার ভোক্তা পুরুষরাই। প্রত্যক্ষভাবে নারীনেত্রীদের বেশ্যাবৃত্তির পক্ষে সাধারণত মত দিতে দেখা যায় না। নারীরা এ ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত — এক ভাগের নেত্রীরা বেশ্যাবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে যৌন-নির্যাতন বা ধর্ষণ হিসাবে দেখেন। তাঁরাই চান এ ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হোক। এ সকল নারীনেত্রীদের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালে সুইডেনে একটি আইনও তৈরি হয়ে গেল। সেখানে বলা হল — যৌনতা বিক্রি কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু যৌনতা ক্রয় অবশ্যই অপরাধ। এই আইন যৌনসেবা ক্রয়ে ভোক্তাদের নিরুৎসাহিত করবে। আর ক্রেতা যখন থাকবে না তখন এটি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য পক্ষের নারীগণ মনে করেন — পতিতাদের অধিকার, নিজস্ব ইচ্ছা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে দেখেন। তাঁরা পতিতাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন, যথার্থে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না-করে পতিতালয় উচ্ছেদের বিরোধিতা করেন এবং এই পেশাকে কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বলেন। দেহব্যাবসায়ে নিয়োজিতদের পতিতা, বেশ্যা, গণিকা, খারাপ মেয়েছেলে ইত্যাদি না-বলে যৌনকর্মী এবং তাদের কর্মকে যৌনকর্ম বলার পক্ষে পৃথিবীব্যাপী তাদের আন্দোলনও জারি করা আছে। এরা জার্মানিতে আইন সংস্কারের জন্য চেষ্টা করার ফলে গত ২০০২ সালে সে দেশে যৌনকর্ম একটি নিয়মিত পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও ওই আইনে যৌনকর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করেছে। সারা পৃথিবীতেই এই দাবিতে আন্দোলন সচল আছে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি এবং বাংলাদেশের দুর্জয় নারী সংঘও এরকম দাবিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সারা পৃথিবীতে যে বিপুল পরিমাণ নারী এই পেশার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছেন বা পাকেচক্রে শরীরের ব্যাবসায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা যেভাবেই হোক

তাঁদের শ্রমই বিক্রি করছেন বা কিনছেন। এক দিনের বা এক মাসের নোটিসে এ পেশা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পৌর-কর্তৃপক্ষ ১৯৯২ সালে শহরের যৌন-বিনোদন কেন্দ্রগুলি ভেঙে দেওয়ার পর সেখানকার যৌনকর্মীরা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর থেকে ওদেশে বিভিন্ন ধরনের যৌনরোগ ও এইচআইভির সংক্রমণ অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

সত্যিকারেই বেশ্যাবৃত্তি নিশ্চয় সমাজ থেকে নির্মূল করা যাবে না। কেন-না সমলিঙ্গ কিংবা ভিন্ন লিঙ্গের সঙ্গে সহবাস করে বহু প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় প্রচুর অর্থ ও সম্পদ অর্জন করে থাকে। এ ধরনের নারী-পুরুষের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে নেহাত কম নেই। আসলে প্রতিটি নারীপুরুষনির্বিশেষে মানুষের ভিতর বহুগামিতা কমবেশি থাকে। নানা সামাজিক অবস্থানের কারণে কারোর এই জীবনযাপন প্রকটিত হয়, কারোর-বা প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। আমার মনে করি না যেসব প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী একাধিক নরনারীর যৌনমিলন করে রোজগার করে তারা নিষিদ্ধ হোক। তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। কঠোর আইন করেও সম্ভব নয়। কিন্তু যেসব মেয়েরা নানা ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে বেশ্যাপল্লির অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, তাঁদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কীভাবে? প্রথমত, দেশের সমস্ত অনিচ্ছাকৃত প্রতিটি বেশ্যাদের বেশ্যাপল্লি থেকে বাইরে বের করে কলকাতা ও হাওড়া শহরে মোট ১৯টি যৌনপল্লি চিহ্নিত হয়। প্রতিটি পল্লিতে যদি গড়ে ২০০ করে গৃহও ধরা হয়, তাহলে মোট গৃহ দাঁড়ায় ৩৮০০টি, এবং গৃহপ্রতি ৩ জন করে ধরলে যৌনকর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৪০০ জন। ভাসমান যৌনকর্মীর সংখ্যা যদি ৮,৬০০ ধরা হয় তবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০০ জনে। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির হিসেবটা ঠিক এরকমই। তাদের মতে, কলকাতার মোট যৌনকর্মীর মধ্যে বেশ্যাপাড়ানির্ভর ১২,০০০ জন এবং ফ্লটিং ৮,০০০ জন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই অঙ্কে আবাসিক হোটেল এবং ফ্লাটবাড়িভিত্তিক যৌনকর্মীদের চিত্রটি নেই। এই ভাগে আরো ২০, ০০০ জন থাকা বিচিত্র কিছু নয়। এটি ধরা হলে কলকাতা শহরে মোট যৌনকর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,০০০ জনে। এই ভাগে আরো ২০,০০০ জন থাকা বিচিত্র কিছু নয়। এটি ধরা হলে কলকাতা শহরে মোট যৌনকর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,০০০ জনে। আমরা অন্য দেশের একটি শহরের হিসেবটি এত নিখুঁতভাবে দেখতে চেষ্টা করছি এ কারণে যে এখানকার যৌনকর্মীদের একটি বড়ো অংশই বাংলাদেশের নারী ও শিশু। রয়টারের একটি সংবাদ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩০ হাজার মেয়েশিশু আছে কলকাতার বিভিন্ন পতিতালয়ে এবং ১০ হাজার আছে মুম্বাই এবং গোয়ার পতিতালয়ে। এসব নারী ও মেয়েশিশুর সবাই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছেন। এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট ২০০,০০০ নারী পাচার হয়েছেন। এছাড়া এসময়ে মোট ৬০০০ মেয়েশিশু পাচার বা অপহৃত হয়েছে কিংবা হারিয়ে গেছে। ইন্টার প্রেস সার্ভিস (৮ই এপ্রিল ১৯৯৮) সূত্রে জানা যায়, পাচারকৃত এই দু-লক্ষ নারীর সবাই ভারত, পাকিস্তান এ মধ্যপ্রাচ্যে যৌনকাজে ব্যবহৃত হচ্ছেন। একটি বেদিশী সংস্থার বাংলাদেশ সম্পর্কিত কান্ট্রি নেরেটিভ

পেপারের ভাষ্য অনুযায়ী, বৈধভাবে যেসব নারী গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করবার জন্য কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে যান, প্রায়শ তাঁদেরও অনিচ্ছাকৃত যৌনদাসত্বকে মেনে নিতে হয়। ওই পেপারের মতে, বার্মিজ মেয়েদের পাচারের রুট হিসেবেও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খ্যাতি পেয়েছে। বাংলাদেশে যৌনদাসত্বকে মেনে নিতে হয়। ওই পেপারের মতে, বার্মিজ মেয়েদের পাচারের রুটি হিসেবেও সৌদি আরবে যান, প্রায়শ তাঁদেরও অনিচ্ছাকৃত যৌনদাসত্বকে মেনে নিতে হয়। ওই পেপারের মতে, বার্মিজ মেয়েদের পাচারের রুট হিসেবেও বাংলাদেশ খ্যাতি পেয়েছে। বাংলাদেশে যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করছে দুর্জয় মহিলা সমন্বয় কমিটি।

যৌনকর্মীদের জাতীয় আন্দোলন ঃ দুর্বারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের অন্যান্য কিছু এলাকার যৌনকর্মীরাও তাঁদের নিজস্ব সংস্থা গড়ে তুলছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — পঞ্চম (বিহার), সাভেরা (দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার), সেক্স ওয়ার্কস ফোরাম (কেরল), বেশ্যা এইডস মোকাবিলা পরিষদ (মহারাষ্ট্র) এবং উইমেন্স ইনিশিয়েটিভ (তিরুপতি)।

ভারতে যৌনপেশা সম্পর্কীত এখন যে আইন চালু আছে (ইম্‌মরাল ট্র্যাভিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬), তার সংশোধনের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে প্রস্তাবের খসরা তৈরি করেছে, তার প্রতিবাদের দুর্বার এবং উপরোক্ত সংস্থার প্রায় ৪০০০ যৌনকর্মী প্রতিনিধি দিল্লিতে গত ৩ থেকে ৮ মার্চ সমবেত হন এবং সভা-সমিতি, র‍্যালি, পথনাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হিসেবে শাস্তি দেওয়া হবে। ৮ মার্চ তাঁরা একটি শোভাযাত্রা করে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে একটি মেমোরান্ডাম পেশ করেন। সেটাতে তাঁরা এই সংশোধনী প্রস্তাবটি বিলোপ করা ও পিটা আইনের কিছু ধারার সংশোধন করার জন্য আবেদন করেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ যৌনকর্মীদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের নানাবিধ অধিকারের দাবি করা এবং ইতিমধ্যে অতি অল্প হলেও তার কিছুটা আদায় করা তাঁদের নিজেদের কাছে বা অন্যদের কাছেও ১৫ বছর আগে প্রায় স্বপ্নেরও অতীত ছিল। অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের কিছু দেশে যৌনকর্মীরা বেশ কয়েক বছর হল তাঁদের নিজেদের কিছু দাবি-দাওয়া আদায় করতে পেরেছেন। কিন্তু এইসব যৌনকর্মীরা ভারতের ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের যৌনকর্মীদের মতো এত দরিদ্র, এত নির্যাতিত ও এত অসহায় কখনোই ছিলেন না। ভারতের যৌনকর্মীদের ক্ষমতায়নের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তা আরও জোরালো হবে এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশের যৌনকর্মীদের পক্ষে পথ-প্রদর্শক হিসেবে গণ্য হবে।

দুর্বার মহিলা কমিটি ঃ এই সমস্যার মোকবিলা করার জন্যে সোনাগাছির পিয়ার এডুকেটররা, প্রকল্পের ডাক্তার, সমাজসেবিকা ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন যে, ওখানকার যৌনকর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং তাঁদের খরিদ্দারদের কাছে দলবদ্ধভাবে কন্ডোম ব্যবহারের দাবি করতে হবে। পিয়ার এডুকেটরদের উদ্যোগে দুর্বার মহিলা সমন্বয়

কমিটি নামে যৌনকর্মীদের একটি সংস্থা তৈরি হল। এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করা হল যে, যৌনকর্মকে একটি ন্যায্য পেশার স্বীকৃতির দাবি করা, সাধারণ নাগরিকদের যেসব ন্যূনতম অধিকার আছে যৌনকর্মীদের পক্ষ থেকে সেসব অধিকার দাবি করা এবং এইসব অধিকার আদায় করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যাওয়া। প্রথম লড়াই শুরু হল খরিদ্দারদের সঙ্গে যাতে তাঁরা যৌন সংসর্গে কন্ডোম ব্যবহার করেন। খরিদ্দারদের সঙ্গে যাতে তাঁরা যৌন সংসর্গে কন্ডোম ব্যবহার করেন। খরিদ্দাররা যখন দেখলেন যে কন্ডোম ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক বলে কোনও যৌনকর্মীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হলে আশেপাশের সব যৌনকর্মীর কাছ থেকেই তিনি একই কারণে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন — বেশি টাকা দিতে চাইলেও, তখন তাঁরা কন্ডোম ব্যবহার করতে রাজি হতে থাকলেন। এর ফলে সোনাগাছি এলাকায় এনে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করে পুনর্বাসন দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রস কোয়ার্টারের বা বেশ্যাবাড়ির বাড়িওয়ালিদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করতে হবে এবং পাড়াগুলি বুলডোজার চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তৃতীয়ত, মেয়ে-পাচারকারীদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। চতুর্থত, ভবিষ্যতে যদি কেউ কোনো মেয়েকে প্ররোচনা দিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করলে লাইফার অথবা মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির বিধান রাখতে হবে। বেশ্যামুক্ত একটা দেশ হয়তো উপহার দেওয়া যাবে না, কিন্তু যৌন-ক্রীতদাস নির্মূল সম্ভব। পেশা নির্বাচনের অধিকার সকলকেই রাষ্ট্র দিয়েছে। জবরদস্তি কোনো পেশায় কারোকে ঠেলা দেওয়া মানে মানবাধিকারেরই লঙ্ঘন। যেসব মেয়েদের নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয় কেউ, তখন সেই সংশ্লিষ্ট মেয়েটির মৃত্যুরই সামিল হয়।

যাঁরা বেশ্যাদের নিয়ে বেশ্যাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন বলে দাবি করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাইছেন বেশ্যিবৃত্তিকে ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করতে। সামনে ফেস্টুন টাঙিয়ে যৌনকর্মীর অশ্রুপাত করছেন, পিছনে পিছনে এই বৃত্তিকে পাকাপোক্ত করে তোলার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছে। এনজিও চালানোর নামে বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার আসছে, আর হরির লুটের বাতাসা হচ্ছে। পতিতাবৃত্তি বা বেশ্যবৃত্তিকে রোধ করতে হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি সরকারকেও এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আসলে বেশ্যারা মানুষ। আর মানুষ বলেই তাঁরা তাঁদের মেয়েদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। মানুষ বলেই আশা আছে তাঁরা 'যৌনকর্মী' সংগঠনের নেতা-উপদেষ্টাদের ভেন্ট্রিলোকুইজমের পুতুল হয়ে অনন্তকাল থাকবে না। সেদিন এই মেয়েদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে থাকা পুলিশ-মস্তান-বাড়িওয়ালিদের মতোই এইসব 'যৌনকর্মী' সংগঠনের নেতৃত্বকে তাঁরা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলবে। সামাজিকভাবে সকলে মিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে আশা করা যায় বেশ্যাবৃত্তি বা বেশ্যালয়কে সমাজ থেকে ধ্বংস করা যাবে। লাস ভেগাস, ম্যাকাউয়ের বিখ্যাত বেশ্যালয়গুলি অতীত হয়ে যাক বললেই কী অতীত হয়ে যাবে? স্বপ্ন দেখার অধিকার থাকলেও, আশা করার মতো এমন কোনো উপাদানই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তথ্যসূত্র ঃ (১) উৎস মানুষ, আগস্ট ২০০৫ (২) টপ কোয়ার্ক, ডিসেম্বর '০৪ — আগস্ট '০৫ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ এপ্রিল ২০০৬ (৩) বিকেলের প্রতিদিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ (৪) সংবাদ এখন, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ নভেম্বর ২০১৪ (৬) সানন্দা, দেবদাসী সংখ্যা (৭) পুরুষ যখন যৌনকর্মী — অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু (৮) যৌনতা ও সংস্কৃতি — সুধীর চক্রবর্তী (৯) বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত — দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (১০) খারাপ মেয়ের কথা — দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (১১) বারবনিতাদের গল্প — বারিদবরণ ঘোষ (১২) বাবু কোলকাতার বিবি বিলাস — পৃথ্বীরাজ সেন (১৩) সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা — দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (১৪) বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ গ্রন্থ —